অনীক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩
বর্ষ ৫০ ❑ সংখ্যা ৩-৪
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

অর্ধেক আকাশ

নারী সমস্যা, নারীদের সমস্যা কোনো প্রান্তিক গোষ্ঠীর সমস্যা নয়, মানবজাতির অর্ধেক তার অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, মানবজাতির এই অর্ধাংশ আবার বাকি অর্ধাংশের সঙ্গে যুক্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে। নারী সমস্যা তাই সমাজবাদ-সাম্যবাদের আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে মার্কস-এঙ্গেল্‌স ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক চিন্তকরাই প্রথম মানবমুক্তির পথের দিশারী হয়ে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমতার আসনে বসালেন তাই নয়, প্রশ্ন করলেন পরিবারের ভূমিকাকে, তুলে ধরলেন পুরুষতন্ত্রের স্বরূপ। তার আগে নিশ্চয় বলতে হবে মেরী উলস্টোনক্রাফ্‌ট ও তাঁর সহযাত্রীদের কথা, নারী হিসাবে যারা এই অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন।

জার্মান ইডিওলজি-তে মার্কস-এঙ্গেলস লিখলেন, জীবন উৎপাদনের দুটি দিক, এক, শ্রমের মাধ্যমে বেঁচে থাকার উপকরণ উৎপাদন, এবং দুই, জন্মদানের মাধ্যমে নতুন মানুষ সৃষ্টি। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা সন্তানজন্মদানে নারীর ভূমিকাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসালেন। মার্কস-এঙ্গেল্‌স বললেন যে পরিবারে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক শ্রমবিভাজনই প্রথম শ্রমবিভাজন, আর এই শ্রমবিভাজনই পরবর্তীকালের অসম বণ্টনের ভিত্তি। এঙ্গেলস তাঁর *পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*-তে প্রতিষ্ঠা করলেন, সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে উৎপাদনী শ্রমে নারীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আর পরিবার বা গোষ্ঠী ছিল মাতৃতান্ত্রিক— কারণ সন্তানের পিতা কে জানা না থাকলেও মাতা কে তা স্বতঃসিদ্ধ। এইসব চিন্তা আজকের দিনেও আধুনিক ও বিপ্লবী।

কিন্তু আজকের দিনে কাজ তো শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করা নয়, তাকে পরিবর্তন করা। বলশেভিক বিপ্লবের বিজয় অর্জনের পরই তাই নারীর আইনি অবস্থান পুরুষের সমান করা হলো, বিবাহের বাইরের সন্তানকে জারজ অভিধা থেকে মুক্তি দিয়ে অন্য সব সন্তানের সমান আসনে বসানো হলো, বিবাহবিচ্ছেদ সহজ করা হলো, নারীকে তার উপার্জন ও সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো। (মনে রাখতে হবে, উন্নত বিশ্বে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোট দেবার অধিকার অনেক সংগ্রামের পর অর্জিত হয়েছে ১৯২০ সালে আর ব্রিটেনে ১৯১৯ সালে শুধুমাত্র সম্পত্তির মালিক ও গ্রাজুয়েট নারীরা ভোটদানের অধিকার পান।) সফল প্রচেষ্টা করা হলো নারীকে গৃহাভ্যন্তরের কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসে সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমতা ও মুক্তির পথে একধাপ এগোনোর। অন্যদিকে গৃহ-শ্রম থেকে নারীকে মুক্তি দিতে ক্রেশ, সাধারণ রান্নাঘর গড়ে উঠলো। অন্যান্য গৃহ-শ্রমের সামাজিকীকরণ নিয়েও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলো।

একথা মানতেই হবে যে পরবর্তীকালে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়টিকে তেমন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি, কিছু কিছু পশ্চাদপসরণও ঘটেছিল গৃহ-শ্রমের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে। তবু সমাজের সব ক্ষেত্রে সোভিয়েত নারীর দৃপ্ত পদচারণা নারীর অগ্রগতির একটা উদাহরণ তৈরি করেছিল।

এই উজ্জ্বল অতীতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পরবর্তীকালে মার্কসবাদীরা কি পিছিয়ে পড়েছেন? নারীবাদীদের, অনেক মার্কসবাদী-নারীবাদীরও অভিযোগ সেকরকমই। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে নারী নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও সংগ্রামের প্রয়োজনেই অনীক-এর এই সংখ্যাটির পরিকল্পনা। এই সংকলনের মাধ্যমে আমরা একদিকে নারী সমস্যার নানা দিক তুলে ধরেছি— শ্রমজীবী নারী, দলিত নারী, আদিবাসী নারী। অন্যদিকে তুলে ধরেছি বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান, হিন্দু পারিবারিক আইনের ইতিহাস, পরিবার ও গণিকাবৃত্তির উদ্ভবের ইতিহাস। আলোকায়নের যুগের বিভিন্ন চিন্তকের চোখে নারী, নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার পরিচয়-এগুলি এসেছে নারী নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা জানা-বোঝার প্রয়োজনে। শুরুতেই মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নারী সমস্যা ও মাদাম বোভোয়া-র দ্য সেকেন্ড সেক্স সম্পর্কিত আলোচনা একভাবে নারী নিয়ে আলোচনার পটভূমি রচনা করেছে। বিভিন্ন মার্কসবাদী কর্মীরা নারী সমস্যা নিয়ে, নারী মুক্তি নিয়ে তাঁদের মতামত দিয়েছেন। শেষে ধর্ষণ নিয়ে একটি বিশেষ রচনা লিখেছেন তসলিমা নাসরিন।

নকশাল আন্দোলনে নারী নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করলেও, সাধারণভাবে আন্দোলনে নারী ও নারী আন্দোলন নিয়ে আলাদা কোনো রচনা আমরা এই সংখ্যায় রাখতে পারলাম না মূলত স্থানাভাবে। পরবর্তীকালে এ নিয়ে লেখার দায়িত্ব থেকে গেল।

এই সংখ্যার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হবে লেখকদের। লেখক-লেখিকা হিসেবে আমরা জোর দিয়েছিলাম যারা নারী সমস্যা নিয়ে নানারকম কাজে লিপ্ত আছেন তাঁদের ওপর। তাঁদের ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্যে ঠিক সময়ে লেখা দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞ প্রেসের কর্মীদের কাছে। আর কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয় সেই পাঠক-পাঠিকাদের, যাঁরা ক্রমাগত এ বিষয়ক একটি সংখ্যা করার দাবি জানিয়ে এসেছেন।

সবশেষে সব ভুলভ্রান্তির দায় স্বীকার করে পাঠকদের কাছে এই সংখ্যা তুলে ধরছি, আলোচনা-বিতর্কের আশায়।

অনীক

প্রকাশনা/পরিবেশনা

বাংলার রেনেসাঁস
বহু-বিতর্কিত বাংলার রেনেসাঁসের মূল্যায়ন।
সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বরুণ দে, অরবিন্দ পোদ্দার, পল্লব সেনগুপ্ত, সুচরিতা সেন, রঞ্জন কুমার মিত্র এবং দীপংকর চক্রবর্তী
ভূমিকা : পার্থ চট্টোপাধ্যায় । দাম : ৬০ টাকা

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে
ভূমিকা : বদরুদ্দিন উমর। দাম : ১০০ টাকা

প্রসঙ্গ সেজ দাম : ৭৫ টাকা

আজকের পশ্চিমবঙ্গ
পার্থ সারথি বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকা : অমিত ভাদুড়ী। দাম : ৮০ টাকা

অনীক ২৫ বছর : কবিতা সংকলন। ৩০ টাকা

রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে
মণীশ ঘটকের কবিতার সংকলন। ২৫ টাকা

একটি অবধারিত মৃত্যুর ধারা বিবরণী
উপন্যাস। মোহিত রায়। ২৫ টাকা

মুর্শিদাবাদ জেলার দুই দশক (১৯৮৪-২০০৩)
মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ পত্রিকার কুড়ি বছরের নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও সংবাদের সংকলন।
সম্পাদনা: দীপংকর চক্রবর্তী। ১০০ টাকা

ভুবনবাবু, স্বপন ও উদয়ন ঘোষ
উদয়ন ঘোষ স্মরণে। আলোচনা ও গল্প। ১৫ টাকা

মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৯২৫ -৭৫
অনন্ত ভট্টাচার্য স্মারকগ্রন্থ। ৫০ টাকা

অনীক : পুরোনো যে সব সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে

- ভারতে 'মাওবাদ' - ৫০
- বিশ্ব বামপন্থী আন্দোলন/পরিবেশ : অর্থনীতি রাজনীতি বিজ্ঞান/উন্নয়নের বামপন্থা/জাতপাত, মৌলবাদ ও ভারত — প্রতিটি ৪৫
- ভারত : বিশ্বায়নের দুই দশক (ক্রোড়পত্র : হেমাঙ্গ বিশ্বাস)/উন্নয়নের বামপন্থী ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ — প্রতিটি ৪০
- বিশ্বায়ন ও প্রতিরোধের বিশ্বময়তা/নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন/জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ — প্রতিটি ৩৬
- পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কোন্ পথে?—প্রতিটি ৩০
- জন্মশতবর্ষে (জীবনানন্দ, নজরুল, তারাশংকর, আইজেনস্টাইন, ব্রেশ্‌ট, আব্বাসউদ্দিন)/গৈরিক ফ্যাসিবাদ/সিপিআইএম কোন্ পথে?/নন্দীগ্রাম গণহত্যা/নাগরিক সমাজ ও পশ্চিমবঙ্গ/বিশ্বায়ন/ইরাক যুদ্ধ/ভারত, ভালো আছো? (*ক্রোড়পত্র:পল সুইজি*)—২৫
- সিঙ্গুর:লড়াই চলছে/পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (১+২)/আজকের নেপাল (১+২)— প্রতিটি ২০
- সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ/ ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম/ জল সমস্যা/আজকের চীন — প্রতিটি ১৫
- ভারতের অধিকার আন্দোলনের দিশা/ভারতের চীন-যুদ্ধ / অরণ্যের লড়াই/ আরব দুনিয়ায় ঝড় /পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও বামপন্থা/ উচ্চশিক্ষার বানিজ্যিকরণ/সন্ত্রাস এখন/কেন সমাজতন্ত্র ?/ভাসানি প্রসঙ্গে/নয়াচর/ লালগড়ে সামরিক অভিযান/আদিবাসী অঞ্চলে পুঁজি/গোর্খাল্যান্ড /কেন আমরা পরমাণু চুক্তি-বিরোধী/খাদ্যসংকট/লালগড় আন্দোলন/শতবর্ষে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে/অ্যামনেস্টির চোখে পশ্চিমবঙ্গে মানবিক অধিকার/পারমাণবিক বিপর্যয়/পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা/ সাঁওতাল বিদ্রোহ ১৫০/ ভারতে আর্থিক উদারীকরণ/সিপিআই(এম)-এর মাও চর্চা— প্রতিটি ১০

① ডাকযোগে নিতে হলে পত্রিকার মোট দাম ও রেজিসট্রেশনের খরচ বাবদ ২০ টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে।
① হাতে নিতে হলে পিপল্‌স বুক সোসাইটিতে মোট দাম জমা দিয়ে এক সপ্তাহ পরে সেখান থেকেই পত্রিকা নিতে হবে

অবরোধ
শঙ্খ ঘোষ

ঠিকই, এইটেই সেই বাড়ি,
কিন্তু ভিতরে ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে আসছে।
এখানে ছিলাম একদিন, কিন্তু ঠিক এখানেই নয়।
জানলাগুলোকে এখন করে দেওয়া হয়েছে দেওয়াল
কাজ শেষ হয়নি
শুধু অনেকটা ওপরের ঘুলঘুলি এখনও কিছু আলো বয়ে আনছে

চেনা ঘরগুলির ভিতরে ঘুরপাক খেতে খেতে ভাবি
এত অবরোধ কেন? এ সময়ে আরো আরো বেশি দ্রুত
খুলে যাওয়ার কথা ছিল না কি?
খুলে দেওয়ার? সহজে চলার?

নীচেই পথে বসে বসে বুড়োটি এখনও একমনে
সারাই করে চলেছে ছেঁড়া জুতো।

ঝড়ের পর
সব্যসাচী দেব

আমাদের দৈনন্দিনে হঠাৎ কখনো
ঝোড়ো হাওয়া, দিন আনি দিন খাই ছক
যদিও বা পালটায় না তবু স্তব্ধতার
দেয়াল ভাঙতে থাকে, তবু প্রতারক
সময়কে ঝুঁটি ধরে খুব নাড়া দিয়ে
ইচ্ছা করে একবার প্রবল চিৎকারে
নিজেকে চুরমার করি, তারপর দ্রুত
ফিরে যাই নিজেরই সে গোপন আঁধারে।

বিস্মৃতির নিশ্চিন্ততা কোনো সান্ত্বনার
মায়াস্বর্গ তৈরি করে! ঝড়ের হাওয়ায়
উড়ে যায় যত্নে-রচা তাসের প্রাসাদ।
ফের সেই টুকরোগুলো আগের জায়গায়
বসিয়ে ভাবতে থাকি সব ঠিক আছে;
আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্বপ্ন ঝরে যায়।

আমার ঈশ্বরীকে
সব্যসাচী গোস্বামী

মন ভাল নেই আমার, তোমার শরীর
একলা হৃদয়ে রাত জাগো ঈশ্বরী।

বুকে জমা কথা, সময় যখন ফেরারি
যন্ত্রণা নিয়ে রাত জাগো ঈশ্বরী।

রাত-অভিমান, এই ভাব এই আড়ি
জলে ভেজা চোখে রাত জাগো ঈশ্বরী।

শ্বেত সন্ত্রাসে গুমোট বাতাস ভারী
ত্রস্ত হৃদয়ে রাত জাগো ঈশ্বরী।

অনেক হৃদয়ে সংগ্রাম রেখে জারি
দশপ্রহরণে জ্বলে ওঠো ঈশ্বরী।

আগুন পোষা যাক
বিশ্বনাথ গরাই

পায়ের নীচে চোরাবালি শীর্ষে রোদের ভল্ল
একটি রজঃস্বলা নদী উধাও গতকল্য

আঙুল যদি তোলো তবে বাধ্য শিরদাঁড়া
বলবো না আর, এই গ্রহে ফের আমরা স্বজনহারা

বাকি যেসব গোপন ক্ষত, উহ্য সবই থাক্
উস্‌কে দিলে জ্বলতে পারি, আগুন পোষা যাক।

তোর জন্য

অশোক চট্টোপাধ্যায়

১.
মাঝ নিশীথে কড়া নাড়ার শব্দে কাঁপে ঘর

ঘুম ভেঙে যায়। এক লহমায় ভয়ের ভয়ঙ্কর
কী এক ময়াল শীতের আঁধার রক্ত-আঁকা চোখে
শরীর ও মন জরিপ করে নিভৃত আলোকে

দরজা খুলে বাইরে আসি। নিদ্-চাদরে ঢাকা
বহির্ঘরের মাঠ পথঘাট। দূর নীলিমায় আঁকা
রুগ্ন আলোর একফালি চাঁদ মলিন বড়ো। একা

শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে যায়, যায় না চোখে দেখা

কে যেন যায় বন-বাউলের একতারাটি হাতে

রাত পোহাতেই শিশিরভেজা শীতকাতুরে প্রাতে
অরণ্যে এক বৃদ্ধ অতি বটবৃক্ষের তলে
'মনে রেখো' সাদা ফুলের আলোয় দেখি জ্বলে

২.
তুই তো সারা মনন জুড়ে হৃদয়পুরে, সাথী
তোকে নিয়েই তিন তরজায় বন্ধুরা সব মাতি
তোর স্বপ্ন বুকের ভেতর আগুন পাহারায়

তোকে ছুঁয়েই সূর্য ওঠে, অরণ্য গান গায়...

অপ্রতিরোধ্য রাজ্যপাট

সুকমল ঘোষ

আস্তানা বলতে আমার তেমন কিছুই ছিলোনা।
বাতিল বাসস্ট্যান্ড
ছেঁড়া কাপড়-জামায় ঠাসা তোরঙ্গ
একটা মগ
টিনের থালা
চিনেমাটির কাপ
বিপিএল কার্ড।

আমার আপনজন বলতে তেমন কিছুই ছিলোনা
হুঁদো খয়েরী বেড়াল
দুটো শালিক
হাতপাখা
টুকরো খবরের কাগজ
ফেলে দেওয়া ব্রিটানিয়ার প্যাকেট।

এরাই ছিলো আমার তিরিশ বছরের সাথী
আর
একটা হাড় জিরজিরে নেড়ি কুকুর।

যাদের অনেক কিছু ছিলো
তাদের
বেড়াল ছিলো না
শালিকও না
হাতপাখা বা
চিনেমাটির কাপ এবং
বিপিএিল কার্ডও না।

যাদের অনেক কিছু ছিলো
অথচ
আমার কাছে কোনোদিন 'ভোট চাই'
বলতে আসেনি।
ঠিক কাকে এবং কোন চিহ্নে
বোতাম টিপতে হবে
এ কথা আজও
শিরদাঁড়া সোজা রেখে বলতে পারেনি।

দাঁড়িয়ে দেখছে মানুষ
অমিত রায়

বাঁক ফিরলেই বৃত্তের কাছাকাছি
ঘনমেঘ চিরে বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়
সামনে পিছনে প্রবল ঘূর্ণিস্রোতে
ঝড়ো বাতাসেই আপনি উঠল মেতে
এই অবেলায় প্রান্তিক সন্ধ্যায়,

সরস মাটিতে যতদূর হাঁটাপথ
যারা গিয়েছিল মেলেনি ভবিষ্যৎ
যারা বলেছিল ফিরিয়ে আনার দিন
প্রাক্‌-প্রত্যূষে পায়ে পায়ে দ্বৈরথ
ভেঙে পড়া স্রোতে জমে রক্তের ঋণ,

জমতে জমতে পাথর চূর্ণ শিলা
বেরিয়ে আসবে ক্ষীণ রক্তিম মেঘ
জীবন এখানে অস্থির উদ্বেগ
জল কল্লোলে শব্দ শুনছে কানে
একি বন্ধন! নিবিড় অমোঘ টানে,

বাঁক ফিরলেই সকলেই কাছাকাছি
একান্ত হয় প্রিয় সে পরম্পরা
সামনে দাঁড়ালে একবার যদি বাঁচি
দেখি সমুদ্র বিস্মিত এক চড়া
দাঁড়িয়ে দেখছে মানুষ, সব্যসাচী!

দুটি ছড়া
সৃজন সেন

১
'আইনের পথে আইন চলিবে'
শাসক বিরোধী সবাই বলিবে
কে কোন পথে ফয়দা তুলিবে
আমরা জানিনা শুধু

দাদা দিদি আর মামারা সকলে
পেট পুরে খায় সেই আইনবলে
আমরা মরিব আইনি ধকলে
ভাগ্যে মিলিবে কদু

আইন ভাঙ্গে পিঠে সর্বদা লাঠি
খবরে সেটাই- 'মৃদু'!

২
সব মানুষেরই কম বেশি থাকে
ক্ষমতার প্রতি মমতা,
ক্ষমতার প্রতি মমতা যাহার
চায়না কখনও সমতা
'গণতন্ত্রের বন্ধু'রা সব
বোঝেনা কোথায় ভ্রমটা!

মানে নেই
বিশ্বজিত সেন

শিশুকন্যাটির জন্য প্রেসক্রিপশন লিখতে গিয়ে ডাক্তার জানতে চাইলেন— "নাম"? শিশুকন্যাটি বললো— "টুন্নী"। ডাক্তার গড়গড় করে প্রেসক্রিপশন লিখে গেলেন।
শিশুকন্যার প্রেসক্রিপশনটি একপাশে সরিয়ে রেখে ডাক্তার ঠাকুমাকে বললেন— "এবারে আপনি আসুন"। স্টেথো দিয়ে বুক পিঠ, মুখ হাঁ করিয়ে জিভ এইসব দেখে নিয়ে, এবার প্রেসক্রিপশন লিখবেন, জানতে চাইলেন— "নাম"?
ঠাকুমা বললেন, "ওই টুন্নীই লিখে নিন"। "সে কি আপনার নিজের নামটা বলুন।" "আমাদের আবার নিজের নাম কী? টুন্নী লিখলেই হবে।" ডাক্তার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি, বিহারে প্র্যাকটিস করেন, একটু ভেবড়ে গেলেন।
একটু খতিয়ে দেখলে বুঝবেন, অত ভেবড়ে যাবার কিছু হয়নি। নারীর নাম থাকাটা জরুরি নয়, তার কর্মক্ষমতা থাকাটা আবশ্যক। খাটবে, পিটবে, রাঁধবে, বাড়বে, জন্ম দেবে, মৃত্যু নেবে, আর প্রয়োজন হলে এইপ্রকার আয়াগিরি, তার জন্য একটা না-আ-আ-আ-ম্‌ যে থাকতেই হবে, তার কোন মানে নেই।

ঘটনাপ্রবাহ

বদলে গেল রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা

তড়িৎ চৌধুরী

অবশেষে পরিবর্তনের সরকার রাজ্যের রাজনৈতিক বন্দিদের সংজ্ঞারও পরিবর্তন করল। 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতেই বিধানসভায় একটি সংশোধনী বিল, 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৩' পেশ করল সরকার এবং নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কেড়ে নিল রাজনৈতিক বন্দিদের মানবাধিকার। ১৯৯২ সালে যে আইনটি বাম সরকার তৈরি করেছিল অনেক মতামত ও বহু মানুষের প্রচেষ্টায়, সেটির সেকশন ২৪-এ বদল এনে কার্যত মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক বন্দিদের সাধারণ অপরাধী বা দাগি দুষ্কৃতিদের সাথে একই ভাবে দেখার পথ তৈরি করলেন।

কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? এখনকার শাসকদল মাত্র দু বছর আগেই বিরোধীদল হিসাবে ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যার মাঝে 'রাজনৈতিক বন্দিদের' নিঃশর্ত মুক্তির কথাও বলেছিলেন। কেনই বা ৩৪ বছরের অচলায়তনকে ভাঙার কথা বলে এ রাজ্যের পরিবর্তনকামী জনগণের আশার হাওয়ায় পাল তুলে যে দল শাসকের চেয়ার দখল করলো, তারা বিরোধী শক্তিদের রাজ্যের মানচিত্র থেকে মুছে দেবার জন্য একের পর এক 'প্রতিশ্রুতি' ভঙ্গ করতে শুরু করল— এ প্রশ্ন তোলাটা তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষত, জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি— এই দুটি দাবি গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষদের কাছে ছিল প্রধান বিষয়, যেমন একই সাথে ছিল সিঙ্গুরের অধিগৃহীত জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের হাতে ফেরানোর কর্মসূচি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল, প্রতিশ্রুতি দিতে অভ্যস্থ মুখ্যমন্ত্রী খুব সহজেই যেমন সিঙ্গুরের জমি ফেরানোর ব্যাপারটি কোর্টের মাঠে ঠেলে দিলেন, তেমনই অত্যন্ত নিপুণভাবে রাজনৈতিক বন্দি সম্পর্কিত একটি কমিটি তৈরি করা হল এবং প্রতিটি রাজনৈতিক বন্দিকে 'কেস বাই কেস' বিবেচনার পদ্ধতি নেওয়া হলো— যাতে ১৯৭৭ সালের মতো রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, যা সারা দেশের সাথে এ রাজ্যেও হয়েছিল, সেরকম কোন সরকারি সদিচ্ছা আর দিশা পেল না।

ফলে এ রাজ্যের রাজনৈতিক বন্দিরা, যারা মূলত বামফ্রন্টের আমলে জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর হাতে নির্বিচারে গ্রেপ্তার হয়েছিল, সেই মাওবাদী বা তাদের সমর্থকদের আর 'পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'র বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের মুক্তি চলে গেল বিশ বাঁও জলে। এই অবস্থায় মনে করা যেতে পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সেই সাবধানবাণী— ''মাওবাদীরা এদেশের সবচেয়ে বড় বিপদ''। এরই ফলে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বা বেকার সমস্যা ও চরম দুর্নীতি বা টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়নের মতো দেশব্যাপী সাধারণ মানুষদের মারাত্মক সমস্যাগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যতটা না চিন্তিত, তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তিত সারা দেশে আন্দোলনমুখর জনগণের মোকাবিলায়— সে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী যুবজনতা হোক বা উড়িষ্যার পস্কোর জন্য জমি দখল বিরোধী আন্দোলনকারী কৃষকরাই হোক কিংবা জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী মাওবাদীরা হোক।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সরকার বা তৃণমূলের নেত্রীর একটি অন্যতম কাজ ছিল দার্জিলিঙের গোর্খা জনজাতির স্বাধিকার আন্দোলনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঠান্ডা ঘরে ঢোকানোর কর্মসূচি এবং জঙ্গলমহলের মাওবাদীদের হয় 'এনকাউন্টারে' মারা, না হলে 'ইউএপিএ'-তে জেলবন্দি করে ফেলা! ফলে জঙ্গলমহল 'শান্ত' হয় এবং পাহাড় 'হাসতে' থাকে। কিন্তু এর পরেও থেকে যায় বাম-জমানায় দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে ১৯৯২ সালে পাশ হওয়া 'পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনাগার পরিষেবা আইন ১৯৯২'। এই আইনে স্বীকার করা হয় যে ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা কোন ব্যক্তির ফৌজদারি অপরাধও 'রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড' হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ঐ ব্যক্তি রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা পাবেন। এই আইনের সুযোগেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলবন্দি প্রায় ৭০০ জন 'মাওবাদী' ও তাদের সমর্থক বন্দি (যাদের ২০০ জন নতুন সরকারের শাসনে ধরা পড়েছেন) রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

বলা ভালো, ১৯৯২ সালে গৃহীত ঐ আইনটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১৯৯৭ সালে, এবং ২০০০ সালে তা লাগু হয়। আর এই আইনটির প্রয়োজনীয়তার শেকড় ছিল সত্তরের দশকের কংগ্রেসি অপশাসন বা স্বৈরাচারী জমানায়। একই অবস্থা কি তৈরি হতে চলেছে এই পরিবর্তনের সরকারের আমলে? প্রতিটি আন্দোলনকারীর মুখ স্তব্ধ করার জন্য তাদের 'মাওবাদী' তকমা দেওয়াটা এখন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর অনুচরদের রোজকার কাজ। এই অবস্থায় গত বছর ৮ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কনওয়ালাজি সিং আলুওয়ালিয়া মাওবাদী বা মাওবাদী ঘনিষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত ৮ জনের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদার দাবি মঞ্জুর করতে গিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন বা সহিংস আন্দোলনের সাথে তাঁদের যোগাযোগ নিয়ে রাজ্য সরকারের আপত্তি খারিজ করে দেন। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাজনৈতিক-সামাজিক যুক্তির উল্লেখ করে বিচারপতি রায়ে লেখেন যে কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বা সহিংস মতাদর্শে বিশ্বাসী— এই যুক্তিতে কোন বন্দির রাজনৈতিক পরিচয় নাকচ করা যায় না। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করে রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চায়। গত ৪ মার্চ সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি আলম ও দেশাইয়ের বেঞ্চ সরকারের সে আবেদন কিন্তু মঞ্জুর করেনি।

মামলাটি এখনও বিচারাধীন। তবু এই অবস্থাতেই নতুন

বিল এনে ১৯৯২ সালের আইনটিকে আমূল বদলে ফেলার চেষ্টা। এই অবস্থায় বিল আনার অর্থ বিচারব্যবস্থাকে পাশ কাটানো। অনেকগুলি আইনি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই সরকারের মুখে চুনকালি পড়লেও নিজের মত, তা যত অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী হোক, তাকে বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী পিছপা নন। ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করেই নজিরবিহীন তৎপরতার সাথে সরকার যে কোনও বিরোধিতাকে দমন করতে এই নতুন বিল এনেছেন। এই বিল অনুসারে, কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা ব্যক্তি যদি সরকারের বিরুদ্ধতা করে বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাসের পথ নেয় তবে তারা রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা পাবেন না। সংশোধনী বিল অনুযায়ী, শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা গণবিক্ষোভে যোগ দিতে গিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনও আইনের আওতায় গ্রেপ্তার হলে বা দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে ধরা হবে। তবে কোন সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিকতা, ভাষা বা জাতের ভিত্তিতে কোনও গোষ্ঠী আন্দোলন করলে বা অন্য কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে তাকে গণবিক্ষোভ হিসেবে ধরা হবে না। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, কোনও নিষিদ্ধ বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য বা তার সঙ্গে যুক্ত কাউকে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা কখনই দেওয়া যাবে না।

এই নতুন বিল কার্যকর হলে গণ আন্দোলনকারীর মর্যাদা পাবেন শুধুমাত্র সংসদীয় পথের পথিক দলগুলির সদস্য, সমর্থকেরা। তাদের মধ্যে হয়ত থাকবেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে খুন-জখম-সন্ত্রাস করা শাসকদলের নেতা-কর্মীরা, থাকবে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের হামলাকারীরা, কলেজে কলেজে অধ্যাপক-অধ্যক্ষদের ওপর হামলাকারী শাসকদলের জন-প্রতিনিধি ও ছাত্র-রাজনীতির কর্মীরা।

পরিশেষে বলা যায়, এই সংশোধনী বিলটি রাজনৈতিক অনুমোদন পাবেই, কেননা বিভিন্ন রাজ্য ও খনিজ সম্পদে ভরা স্থানগুলিতে— সে ছত্তিশগড়ে হোক বা হোক উড়িষ্যার নিয়মগিরিতে— যেখানেই ভূমিপুত্ররা আন্দোলন করছে জমি-জঙ্গল-নদীকে বাঁচাতে সেখানেই মাওবাদী তকমা দিয়ে প্রথমে আন্দোলনকারীদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং তারপরই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাথে শুরু হচ্ছে নির্বিচারে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার। এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের নয়া শাসকরা স্বীয় উদ্যোগেই এককদম বেশি এগিয়ে গেছেন। কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর সাথে নানা বিষয়ে দ্বিমত এবং অনৈক্য থাকলেও এই বিলের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই মনমোহনের বাহবা পাবেন। কেননা জঙ্গলমহলে জিন্দল প্রকল্পে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা জরুরি তেমনই এদেশের বড় পুঁজি ও বিদেশি পুঁজির দরকার আন্দোলন-বিরোধী মুক্ত পরিবেশ, জল-জমি ও অনুগত শ্রমশক্তি, যার যোগান দেবে এদেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যের উদ্যোগী সরকার। শিল্পের প্রয়োজনেই তাই মুখ্যমন্ত্রী সব প্রতিবাদকে জেলের গরাদের ভেতর ঢুকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক বন্দিদের সংজ্ঞার বদল ঘটাতে দেরি করলেন না। তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে তৃণমূল নেত্রীর এটি এক বড় অবদান!

The West Bengal Correctional Services Act, 1992

Sec 24 (3)(vi) Any person arrested or convicted on a charge of having committed or attempting to commit aiding or abetting the commissions of any political offence, whether or not the act constituting such offence comes within the preview of any offence punishable under the Indian Penal code or any other law for the time being in force, or any person believed to have been prosecuted out of political animosity or grudge, shall be classified as political prisoner.
Explanation.- For the purposes of this clause,- (a) any offence committed or alleged to have been committed in furtherance of any political or democratic movement or any offence arising out of an act done by an Individual with an exclusive political objective free from personal greed or motive shall be a political offence.
Explanation.-(1) an offence coming within the preview of chapter VI of an Indian Penal Code shall always be deemed to be a political offence.
(2) The privation of a law under which an offender is charged shall not be material.
(a) A person charged under section 302 or section 379 or section 395 or section 411 of Indian Penal Code may be classified as a political prisoner if his case satisfies the requirement of this clause;
(b) any movement or public agitation sponsored or carried on by any political party or any other group or association of persons for furtherance of any political ideology or for securing or safeguarding any political right, objective or relief with a view to obtaining common good for the people in general or any section thereof or for the remedy of any injustice of political nature done to any individual shall be interpreted as a political movement.
(c) any movement or public agitation sponsored or carried on by any political party or any group or association of persons for securing common good for the people in general or any section thereof or for securing and safeguarding any well -recognized human right, or for undertaking activities in the field of social reform or for ameliorating the living condition of the afflicted or poorer section of the community or for securing reforms or for safeguarding public interest in social, economic, educational and cultural matters, or for securing remedy of any injustice done to any individual or body of individuals in those matters, shall be interpreted as a democratic movement:
(d) for the removal of doubts it is hereby declared that trade union activities and collectives activities sponsored or carried on for securing justice and well being of the working class and collective activities for safeguarding the interest of tillers of land or for betterment of conditions of their labour and living shall be deemed to be a democratic movement:
Provided that a movement or public agitation by any communal, regional, linguistic, religious, racial, sectional or caste group sponsored or cared on against any other like group shall not be deemed to be a political or democratic movement:
Provided further that any movement based on religious, regional, communal, racial or caste consideration or any movement for promoting any interest, other then social or economic interest, by any religious, regional, communal or racial or caste people or any movement for placing impediments or obstruction in the matter of advancement of any section or sections of the people, shall not be treated as a political or democratic movement.

খাদ্য সুরক্ষার জন্য আইন করতে হবে কেন?

প্রণব দে

ভারতবর্ষ নামক দেশের অধিকাংশ মানুষ যে দুবেলা ভরপেট খেতে পারেনা, এটা বুঝতে স্বাধীনতার পর ছেষট্টিটা বছর কেটে গেল। দেশে যে খাবার নেই তা নয়, সাধারণ মানুষের খাবার যোগাড় করার ক্ষমতা নেই। অবশ্য এটা যে শুধু ভারতবর্ষের চিত্র, তা নয়। আমাদের এই পৃথিবীতে প্রায় ৮৭ কোটি মানুষ (১২.৫ শতাংশ) অর্ধাহার বা অনাহারে দিন কাটায়। এমনকি খোদ আমেরিকাতেও প্রায় ৫ কোটি মানুষের (১৬ শতাংশ) সারা বছর ঠিকঠাক খাবার জোটেনা।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, যোজনা পর্যদ এক সময়ে স্থির করেছিল, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের খাদ্যদ্রব্য থেকে দৈনিক ন্যূনতম ২৪০০ কিলো ক্যালরি শক্তি গ্রহণ প্রয়োজন। এবং এই শক্তি পূরণের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ক্ষমতা যাঁদের নেই, তাঁদের অবস্থান দারিদ্রসীমারেখার নীচে চিহ্নিত করা হতো। এই মাপকাঠিতে ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ খাদ্যাভাবে ভুগছে, কারণ জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (২০০৯-১০) হিসাবে উচ্চ আয়ক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ ঐ পরিমাণ শক্তি বা খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু জাতীয় নমুনা সমীক্ষার অন্য এক সমীক্ষায় (২০০৯-১০) বলা হচ্ছে, সারা ভারতে মাত্র ১.৪ শতাংশ পরিবার দুবেলা পর্যাপ্ত আহার থেকে বঞ্চিত। রাজ্যে রাজ্যে অবশ্য অভুক্ত মানুষের তফাৎ চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ৪.৪ শতাংশ পরিবার বছরের অধিকাংশ সময় উপোসী থাকেন। তারপরেই উড়িষ্যার স্থান, ৪.১ শতাংশ। আবার তামিলনাড়ু, হরিয়ানা ইত্যাদি রাজ্যে অনাহার-অভুক্ত থাকার কোন নজির নেই। যদিও তামিলনাড়ুতে ৫৩ শতাংশ, হরিয়ানায় ৪৫ শতাংশ গ্রামের মানুষ প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্যালোরি বঞ্চিত। প্রধানমন্ত্রীও কিছুদিন আগে, ৪২ শতাংশ শিশুর অনাহারে থাকার ঘটনাটাকে দেশের লজ্জা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাহলে এটা কী রকম 'পর্যাপ্ত আহার', যেখানে খেয়েও মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে? পিটুলিগোলা খেয়ে থাকলেও কি সরকারি সমীক্ষকরা ধরে নেন, মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে আছে?

গরিব মানুষকে শস্তায় চাল-গম যোগান দেওয়ার বেশ কিছু প্রকল্প ইতিমধ্যেই এদেশে চালু হয়েছে। 'অন্ত্যোদয়' প্রকল্পে দারিদ্রসীমা রেখার নীচে অবস্থিত (বিপিএল) প্রতি পরিবার কেজি পিছু ৩ টাকা মূল্যে চাল কিংবা ২ টাকা মূল্যে গম হিসেবে মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকারী। মিড-ডে মিল প্রকল্পও অনেক শিশুকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এছাড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আছে 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্প ইত্যাদি। 'খাদ্য সুরক্ষা আইন' এই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে একটি অভিন্ন আইনে গ্রথিত করার ফলে, এখন মানুষ আইনত তার অধিকার দাবি করতে পারবে। কিন্তু কারা এই সুবিধার দাবিদার হবে, সেটা ঠিক করে দেবে সরকার, বিশেষত রাজ্য সরকার।

রাজ্য সরকার নির্ধারিত দাবিদারদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৭৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫০ শতাশের বেশি মানুষ এই আইনি সুরক্ষার সুবিধা পাবেন না। রাজ্যভিত্তিক এই সংখ্যাটা কত হবে, সেটা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ আইন চালু হলে, ৮৩ কোটির গ্রামবাসীর মধ্যে সর্বাধিক ৬২ কোটি এবং প্রায় ৩৮ কোটি শহরবাসীর মধ্যে সর্বাধিক ১৯ কোটি, সবমিলিয়ে ৮১ কোটির মতো ভারতবাসী আপাতত খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আসবেন। সুরক্ষা বলতে অল্প মূল্যে মাথাপিছু মাসে ৫ কেজি পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্তি। চালের দাম পড়বে কেজি পিছু ৩ টাকা, গম ২ টাকা/কেজি এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য (জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি) ১ টাকা/কেজি। আপাতত তিন বছর এই দাম বহাল থাকবে। 'অন্ত্যোদয়' প্রকল্পভুক্ত দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত মানুষ চলতি প্রথামতো পরিবার পিছু মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য পাবেন। এছাড়া এই আইনে অন্য যেসব সুবিধা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হলো অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতি মহিলাদের বিনামূল্যে আহারের ব্যবস্থা এবং সর্বাধিক ছয় হাজার টাকা মাতৃত্ব ভাতা। ছয় মাস থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে আহারের এবং ১৪ বছর বয়স অথবা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে একবেলা মধ্যাহ্ন আহার।

রেশন কার্ড দেওয়া হবে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার নামে। যে পরিবারে মহিলা সদস্য নেই অথবা থাকলেও নাবালিকা, সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের নামে রেশন কার্ড প্রস্তুত করা হবে। যেসব সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি সরবরাহ করা না হলে উপযুক্ত আর্থিক মূল্যে ক্ষতিপূরণ করা হবে। ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারকে জেলা ভিত্তিক অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। দায়িত্বে থাকবেন সরকার নির্দিষ্ট একজন আধিকারিক। সমস্ত প্রকল্পটি দেখভাল করবে 'রাজ্য খাদ্য কমিশন'।

এই আইনের উপযোগিতা নিয়ে বেশি প্রশ্ন না উঠলেও, কার্যকারিতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। আধুনিক উন্নয়নবাদীদের উদ্বেগ, বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি অর্থনীতি সামাল দেবে কী করে? গণবণ্টন ব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্নীতি অতিক্রম করে, শেষ পর্যন্ত কতটুকু খাদ্যশস্য গরিব মানুষের হাতে পৌঁছবে, সে ব্যাপারেও অনেকে সন্দিহান।

সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির বক্তব্য, 'চালু প্রকল্পগুলিতে ২০১২-১৩ সালে এখনই সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ ১,০৯,৭৯৬ কোটি টাকা। 'খাদ্য সুরক্ষা আইনে' ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১,১২,২০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাড়তি খরচ ২৪০৯ কোটি টাকা। এবারে অন্য একটি হিসাব

দেখা যাক। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত কর্পোরেট আয়কর, অন্তঃশুল্ক এবং বহিঃশুল্ক এই তিনটি খাতে ভারতের বৃহৎ কোম্পানিগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে ২১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা (পি সাইনাথ, *দি হিন্দু*, ০৭/০৩/১১)। 'সেজ' অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি ছাড় পেয়েছে ২৭ হাজার কোটি টাকার বেশি (*বিজনেস লাইন*, ০১/০৩/১০)। ভারতের আশি কোটি মানুষের পেটের খিদে মেটাতে যে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, এ দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী শ' পাঁচেক কোম্পানিকে মুনাফার খিদে মেটাতে তার বাইশ গুণ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। গরিব মানুষকে ভর্তুকি দেওয়ার যারা বিরোধী, তারা আগে ব্যাখ্যা করুক, মুনাফাখোরদের জন্য এই বিপুল করছাড় আমাদের দেশের নড়বড়ে অর্থনীতি ধারণ করছে কীভাবে?

আইন হলেই যে সেটা ঠিকঠাক প্রয়োগ করা হবে, এমন কোন গ্যারান্টি নেই, বিশেষত যে আইন নিয়ে সরকারের মধ্যেই মতভেদ আছে। 'খাদ্য সুরক্ষা আইন' নিয়ে সরকারের মধ্যেই মতভেদ থাকলেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে জনপ্রিয়তা অর্জনের এমন সুযোগ ইউপিএ সরকারের পক্ষে ছেড়ে দেওয়া কঠিন ছিল। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ইউপিএ সরকারের ফ্ল্যাগসিপ যেমন ছিল 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প'। ১০০ দিনের কাজের 'গ্যারান্টি' থাকলেও এখনও পর্যন্ত গড় কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৪৪ দিন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায়, বিশেষত নির্বাচনী সমীকরণ মেলাতে কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আইন ভারতের শাসকদলগুলি সাধারণ মানুষের সামনে মাঝেমধ্যে ঝুলিয়ে দেয়, কিন্তু আইনের ধারাবাহিক এবং যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা তাদের থেকে আশা করা বৃথা। 'খাদ্য সুরক্ষা আইন' বাস্তবে মানুষকে কতটা সুরক্ষা দেবে, সে বিষয়ে বিশাল এক তাই প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

গরিব মানুষের জন্য খাদ্যশস্যের যা সরকারি বরাদ্দ, তা যদি 'অনুকম্পা' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে প্রশ্ন নাও উঠতে পারে। কিন্তু এটাকেই যদি সরকার 'যথেষ্ট' বা 'প্রয়োজনীয়' মনে করে, তাহলে সরকারকে অবিবেচক বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকাল রিসার্চ'-এর বিশেষজ্ঞরা ২০০৯ সালে, একজন নিরামিষভোজী সাধারণ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জন্য যে খাদ্যতালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে শুধুমাত্র চাল-গম প্রয়োজন দৈনিক অন্তত ৪০০ গ্রাম অর্থাৎ মাসে মাথাপিছু ১২ কেজি। এর সঙ্গে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য এবং তেল-ঘি-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হলেও আমরা আলোচনায় আনছি না, যেহেতু সরকার শুধুমাত্র চাল-গম বরাদ্দ করেছে। সরকারি বরাদ্দ মাথাপিছু ৫ কেজি তো প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্ধেকেরও কম। 'অন্ত্যোদয়' প্রকল্পে পরিবার পিছু যে খাদ্যশস্য দেওয়া হয় (৩৫ কেজি), সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ২০০১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী গড় পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৫.৩। অর্থাৎ অন্ত্যোদয় প্রকল্পে মাথাপিছু প্রাপ্তি ৭ কেজি শস্য। স্বাভাবিক পুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি মাসে ঘাটতি থেকে যায় কমপক্ষে আরও ২০/২৫ কেজি খাদ্যশস্য।

সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির বক্তব্য, ২০১১-১২ সালে দেশে চাল-গমের উৎপাদন ছিল ১৯.৮২ কোটি টন। সরকার সংগ্রহ করেছিল ৭.৩২ কোটি টন (৩৭ শতাংশ)। মাথাপিছু ১১ কেজি খাদ্যশস্য দিতে হলে প্রয়োজন ১০.৭৪ কোটি টন। অন্যান্য দায়বদ্ধতা সহ মোট প্রয়োজন ১১.৫৪ কোটি টন। অর্থাৎ সংগ্রহমাত্রা বাড়াতে হবে আরও ৪.২২ কোটি টন। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে যদি উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, সরকারকে মোটামুটি উৎপাদনের ৬০ শতাংশ সংগ্রহ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ শ্রী সি রঙ্গরাজন পরামর্শ দিয়েছেন, ৩০ শতাংশের বেশি সরকারি সংগ্রহ অর্থনীতির পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ খোলা বাজারে তাহলে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়বে। যেন এখন দাম বাড়ছে না। যেন এখন চাল-ডাল-তেল-নুন-গমের আকাশছোঁয়া দামে মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে না। বরং উল্টোটাই তো স্বাভাবিক। খোলা বাজারে খাদ্যপণ্যের চাহিদা যদি কমে যায়, দাম তো পড়ে যাওয়া উচিত। এসব অর্থনীতির কূট প্রশ্ন। আমাদের মতো আম আদমির নাগালের বাইরে।

পৃথিবীতে প্রতি বছর ১৩০ কোটি টন খাদ্যশস্য স্রেফ অবহেলায় নষ্ট হয়, মানে অপচয় করা হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলি সব থেকে বেশি খাবার নয়ছয় করে। মার্কিনরা যত খাবার কেনে, তার ২৫ শতাংশ অপচয় করে। বৃটিশরা যত কেনে, তার এক-তৃতীয়াংশ ডাস্টবিনে ফেলে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বছরে মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২৮০-৩০০ কেজি (*Avoiding Future Famine-* UNEP Report)। এবং এটাই হচ্ছে সেই বাজার, যে বাজারের জন্যে বাজার-অর্থনীতির প্রবক্তারা ওকালতি করে।

ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়। ২০০২ সালে, ফসল রাখার জায়গা ছিলনা বলে ১.৫ কোটি টন খাদ্যশস্য জলের দরে বিদেশে বিকিয়ে দিতে হয়েছিল (*তেহেলকা*, ০৭/০৮/১০)। কৃষক যে ফসলের দাম পায় না, তার একটা বড়ো কারণ, সে ফসল সংরক্ষণ করতে পারে না। ছোট কৃষকের সেই পুঁজি নেই, যা দিয়ে সে হিমঘর বা সংরক্ষণাগার নির্মাণ করতে পারে। এ দায়িত্ব নিতে পারে সরকার কিংবা পঞ্চায়েত। অথবা কৃষক সমবায় গঠন করে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। ফসলের বাজার যাতে কৃষক নিজের হাতে ধরে রাখতে পারে, তার চেষ্টা না করে, সরকার বাজার ছেড়ে দিচ্ছে বৃহৎ কোম্পানিগুলির জিম্মায়। পশ্চিমবঙ্গে মমতা সরকার রিটেল ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করছে, কিন্তু বৃহৎ পুঁজির প্রবেশ অনুমোদন করছে। বৃহৎ পুঁজি, তা সে দেশি হোক কিংবা বিদেশি, কৃষি বাজারে প্রবেশ করলে, কৃষক তার পদাবনত হবেই। বাজারের দাম সে পাবেনা, কোম্পানির দামই তাকে শিরোধার্য করতে হবে। আখেরে কৃষক ঠকবে।

১৯৯০ পরবর্তী নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে, এক অদ্ভুত বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। '৬০ থেকে '৮০-র দশকের শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির যা হার ছিলো, '৯০ দশকের পর তা কমেছে। একই সাথে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হারও এই পর্যায় কমেছে। মাথাপিছু খাদ্যশস্য প্রাপ্তির হারও বিশ্বায়নের যুগে কমতে শুরু করেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনা

সময়কাল	*জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার (%)*	*খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার (%)*
১৯৬১-৭১	২.২৪	২.৮৩
১৯৭১-৮১	২.২৩	১.৮
১৯৮১-৯১	২.১৬	৩.১৩
১৯৯১-০১	**১.৯৫**	**১.১**
২০০১-১১	**১.৬৫**	**১.০৩**

বিশ্বায়ন অর্থনীতির আগে ও পরে খাদ্যপ্রাপ্তি

সময়কাল	*মাথাপিছু গড় খাদ্যপ্রাপ্তি (গ্রাম)*
১৯৭২-৭৬	৪৩৩.৭
১৯৭৭-৮১	৪৪৭.৯
১৯৮২-৮৬	৪৬০.৮
১৯৮৭-৯১	৪৮০.৩
১৯৯২-৯৬	**৪৭৪.৯**
১৯৯৭-০১	**৪৫৭.৩**
২০০২-০৬	**৪৫২.৪**
২০০৭-১০	**৪৪০.৪**

সূত্র: পি সাইনাথ, *দি হিন্দু*, ২২/০৩/১২

সংখ্যাতত্ত্ব বাড়িয়ে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই। এটা অস্বীকার করা যায়না যে আমরা এক পঙ্গু অর্থনীতির মধ্যে বাস করছি। দেশের গরিষ্ঠাংশ মানুষের কাজ জোটেনা। কাজ জোটে তো, তা দিয়ে ভাত জোটেনা। সমস্ত দেশটাই আসলে সস্তা শ্রমের বাজার। এতই সস্তা যে, তা দিয়ে জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণটুকুও জোটেনা। কিন্তু সরকারের খাতায় এই দারিদ্র্যের হিসাব পাওয়া যায়না। সরকারের হিসেবে গ্রামের মানুষ দিনপ্রতি ২৭ টাকা (মাসে ৮১৬ টাকা) এবং শহরে দিনপ্রতি ৩৩ টাকা (মাসে ১০০০ টাকা) রোজগার করতে পারলেই তাদের দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। এটাই সরকার নির্ধারিত দারিদ্র্য সীমারেখা। সরকারি মাপকাঠিতে গ্রামাঞ্চলে ২৫.৭০ শতাংশ এবং শহরে ১৩.৭০ শতাংশ মানুষের আয় এই সীমারেখার নীচে।

'গরিবি হটানোর' জন্য সরকার আয়ের যে মানদণ্ড ধার্য করেছে, তা এতটাই হাস্যকর যে সেটা বুঝতে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ হতে লাগেনা। এই আয়ে ভারতবাসী যে বেঁচে থাকে না, তা নয়। তবে সেটা মানুষের মতো বাঁচা নয়, মনুষ্যেতর পর্যায়ের। ২০১১ সালের বিশ্বব্যাঙ্কের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রায় ৫৪ শতাংশ ভারতবাসী বহুমুখী দারিদ্র্যে আক্রান্ত। সংখ্যায় ৬১ কোটির বেশি। ১২.৩ শতাংশ মানুষের বিশুদ্ধ পানীয় জলটুকু পর্যন্ত জোটেনা। প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের কম। এর কোন কিছুর সঙ্গেই ভারত সরকারের হিসাব মেলেনা।

সরকার দারিদ্রসীমারেখার যে নয়া মাত্রা উদ্ভাবন করেছে, তাতে পুষ্টিগ্রহণের ন্যূনতম মাত্রা এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগেকার ২৪০০ ক্যালরি (গ্রামাঞ্চলে) ও ২১০০ ক্যালরি (শহরে) মাত্রার বদলে গড়ে ১৮০০ ক্যালরি পৌষ্টিক মাত্রা যথেষ্ট বলে মনে করছে সরকার। ফলত খাতায়-কলমে দরিদ্রের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব নামক বালির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলেই কি আর বাস্তবকে অস্বীকার করা যায়?

বাস্তবকে গোপন করার সরকারের এই প্রয়াস অকারণ নয়। প্রায় দেড় দশক হতে চলল, ভারতে নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি কায়েম হয়েছে এবং ভারত সরকার নয়া উদারনীতির পুরোধা মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে, সামাজিক সুরক্ষাকারী সমস্ত বিধি-নিষেধের অর্গল খুলতে তৎপর। এই অবস্থায় দেশের অর্ধেক মানুষ চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়েছে, এ তথ্য সরকারি স্তরে স্বীকার করে নিলে 'মনমোহিনী' পরিকল্পনা স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। সম্ভবত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশেই ভারত সরকারের দরিদ্রের সংখ্যা কম দেখানোর এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। কায়িক শ্রম করে গরিব মানুষের. বেঁচে থাকার সমস্ত উৎসগুলি কৃষিজমি, চারণভূমি, অরণ্যভূমি, নদী, জলাভূমি সবকিছুই সরকারি মদতে পুঁজিপতিদের করায়ত্ত হচ্ছে। এই লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে হলে গরিব মানুষের গরিবি অস্বীকার করতে হবে। না হয়তো তার দায় নিতে হবে। পুঁজি এই দায় নেবে না। সরকারও দায় নিতে চায়না। সরকারের খাতায় দরিদ্রের সংখ্যা যত কম হবে, সরকারের দায়ও তত কমবে।

সর্বহারা হয়ে যাওয়ার এই অবস্থাটা তো মানুষ মুখ বুঁজে মেনে নেবে না। নিচ্ছেও না। জমিহারা, কর্মহারা হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে মানুষ, বিক্ষিপ্ত হলেও, বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে। বহুজাতিকের পথের কাঁটা হয়ে উঠছে স্থানিক বিদ্রোহ। সরকারের দায় অবস্থাকে সামলে রাখা। সামাল দেওয়ার কর্মসূচি হিসাবে জন্ম নেয় 'জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প', 'খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' ইত্যাদি। শাসক শ্রেণীর ধারণা, এতে মানুষ বশে থাকবে। স্বাধীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে, জীবনধারণের উপকরণগুলি মানুষের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষকে সরকারের মুখাপেক্ষী করে রাখার রাজনীতি বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষ যত বেশি সরকার-নির্ভর হবে, মানুষের উপর রাজনৈতিক খবরদারি করাও তত সহজ হবে।

'খাদ্য সুরক্ষা আইন' মানুষকে কিছুটা রিলিফ হয়তো দেবে। কিন্তু শাসক শ্রেণী যদি ভেবে থাকে, মানুষের অধিকার-বোধকে রিলিফের গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যাবে, তাহলে মস্ত ভুল করবে। প্রশ্ন উঠবেই, খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ম্ভর দেশে খাদ্য সুরক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় কেন?

ঘটনাপ্রবাহ

উত্তরাখন্ড : বিপর্যয়ের একমাস পরে

অরিজিৎ

উত্তরাখন্ডে ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী জলপ্লাবনের পর অনেক কিছু জেনেছি, কেন হয়েছে তার ব্যাখ্যা শুনেছি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে, অভিজ্ঞতা শুনেছি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা বাঙালী পর্যটকদের। ছবি দেখেছি জলোচ্ছ্বাসের, সেনাবাহিনীর তৎপরতার সাথে উদ্ধারকার্যের ভিডিও ফুটেজ দেখেছি টিভিতে।

ঘটনার একমাস পরে আমরা উত্তরাখন্ডে যাত্রা করি মেডিকেল টিম সমেত ওষুধপত্র আর কিছু ত্রাণসামগ্রী নিয়ে। পাশাপাশি উৎসাহ ছিল সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝা— বিপর্যয়ের পরে কেমন আছে সেখানকার মানুষ, কীভাবে তারা বিপর্যয়কে সামলালেন ইত্যাদি। কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম ২০ জন, তার মধ্যে ১২ জন ডাক্তারির সাথে যুক্ত, আর ছিলেন কুমায়ুনের শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত দুই সাথী।

হরিদ্বার থেকে ত্রাণের জিনিসপত্র নিয়ে বাস রিজার্ভ করে অগ্রসর হলাম পর্বত অভিমুখে। হরিদ্বার-হৃষিকেশে শ্রাবণে জল ঢালতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় কাটিয়ে পাহাড়ে উঠতেই ভিড় গেল কেটে— শুনশান রাস্তা। প্রকৃতির দুর্নিবার সৌন্দর্যের আকর্ষণ আর পুণ্যের লোভে মানুষ ফি বছর এসময়ই ভিড় জমায় এখানে। বিপর্যয়ের পর ছবিটা একদম উল্টো। রাস্তা চলেছে স্রোতস্বিনী গঙ্গার পাশ বরাবর। নদীর পাশ বরাবর ৪০-৫০ ফুট ওপর দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি করা সহজ বটে, কিন্তু নদীর ক্ষয়কাজের জন্য নদীর দুপাড়ের পাহাড় ধ্বংসপ্রবণ হয়। স্বাভাবিকভাবেই আমরাও রাস্তার ওপর পাশের পাহাড়ের ধ্বসে যাওয়ার, রাস্তার কিয়দংশের নদীতে তলিয়ে যাওয়ার, নদীতলের কাছাকাছি গ্রামগুলোর বিধ্বস্ত অবস্থার, বালির চরে জেগে থাকা শুধু টিনের চালের কিংবা খাড়াই পাহাড়ের গায়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকা বাড়ির দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম রুদ্রপ্রয়াগের দিকে।

দেবপ্রয়াগে, যেখানে ভাগীরথী আর অলকানন্দা মিশেছে সেখান থেকে অলকানন্দার পাশ ধরে চলতে থাকলাম; দেবপ্রয়াগে কতদূর জল উঠেছিল তার গল্প শোনাচ্ছিল আমাদের ড্রাইভার। হুঁশ ফিরল ব্রিজের ওপর দিয়ে অলকানন্দা পার হয়ে, শ্রীনগরের আগে। রাস্তার পাশের পাকা বাড়িগুলোর একতলার কার্নিশ অবধি পলিতে ঢাকা। যাহোক করে দরজার সামনের মাটির পাহাড়টুকু সরানো হয়েছে। রাস্তার পাশে একটা একতলা বাড়ির ছাদে কাদা মাখানো একটা শাড়ি তখনো ঝুলছে। রাস্তার বাঁদিকে নদী সেই জায়গাটাতেই প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে ভীষণ চওড়া হয়ে একটা বড়সড় জলাশয় তৈরি করেছে বলে মনে হচ্ছিল। জল তখন বয়ে চলছিল রাস্তা থেকে অন্তত ৪০ ফুট নীচ দিয়ে। আর রাস্তার ওপর ১০ ফুট পুরু পলি, মানে জলস্তর বিপর্যয়ের সময় স্বাভাবিকের তুলনায় ৭০-৮০ ফুট ওপরে উঠেছিল। শুনে চমকে উঠলাম— ওটাই তেহরি ড্যাম। বিপর্যয়ের সময় যে নামটা বহুবার শুনেছি, ছবিও দেখিয়েছিল মিডিয়াগুলো। এই সেই ড্যাম যেটা বানানো হয়েছিল দিল্লী ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলের চাহিদা মেটানোর জন্য। যেটা তৈরি করতে বহু ঘরবাড়ি ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জঙ্গল ধ্বংস করা হয়েছিল। যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা সহ অনেকে।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছালাম। তখন ছায়া উল্টোদিকে হেলতে শুরু করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট, যিনি ত্রাণের ব্যাপার সামলাচ্ছেন, একঝাঁক সদ্য-তরুণকে দেখে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। অত্যুৎসাহী হয়ে যেখানে কেউই গিয়ে উঠতে পারছে না এমন জায়গায় যাওয়ার পরামর্শ দিলেন— যেখানে রোজই ৫-৭ কিমি খাড়াই পথে ট্রেক করে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে মেডিকেল ক্যাম্প করতে হবে। "বিপর্যয় নয়—প্রকৃতিকে উপভোগ কর; আনন্দ নিয়ে কাজ কর"— কথাবার্তা, বেশভূষা আর হাবভাব দেখে আমাদের অনেকেরই অ্যাসিস্ট্যান্টকেই ম্যাজিস্ট্রেট বলে ভুল হয়েছিল। তাঁর কথায়, তার নামই নাকি যথেষ্ট যেকোনো জায়গায়— এস এস বিস্ত।

আমাদের যাওয়ার কথা ছিল গুপ্তকাশীর কাছে উখিমঠের আশেপাশে। মন্দাকিনীর রাস্তা ধরে কেদার অভিমুখে অগস্ত্যমুনি ফেলে গুপ্তকাশীর একটু আগেই ডানদিকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, যেটা তুঙ্গনাথ হয়ে গিয়ে উঠেছে চামোলি জেলার গোপেশ্বরে— অলকানন্দার তীরে, বদ্রীনাথের পথে। কিন্তু দুদিন আগে ধ্বসের জন্য অগস্ত্যমুনির কাছে রাস্তা বন্ধ। তাই আমাদের প্রচুর ঘুরে যেতে হলো। মানে যেতে হলো বদ্রীর দিকে, গোপেশ্বর হয়ে আসতে হবে উখিমঠ। রাতে থাকার ব্যবস্থাও করে দিলেন সিএমওএইচ আর বিস্ত মশাই।

বিকেলে যখন রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যাত্রা শুরু করলাম তখন ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। হিমালয়ে বর্ষার এটা একটা সাধারণ চিত্র। বিকেলের দিকে বৃষ্টি শুরু হয়, সারারাত অবিরাম বৃষ্টি হয়ে শেষ রাতে বৃষ্টি থামে। সকালে কুয়াশা কেটে রোদ ওঠে। পিছল রাস্তা, ক্রমশ অন্ধকার নামছে, আর ড্রাইভারও যথেষ্ট স্পিডেই গাড়ি চালাচ্ছে। দু-এক জায়গায় রাস্তার পাশে ধ্বসে নামা গাছের সবুজ পাতাগুলো জানান দিচ্ছিল ধ্বসটা কয়েক ঘণ্টা আগেই হয়েছে। কর্ণপ্রয়াগের আগে ধ্বসের জন্য কয়েক ফুট বসে যাওয়া রাস্তার একটা অংশ থেকে মূল

রাস্তাটায় ওঠার সময় একবার পিছলে পেছনে নেমে দু'বার গোত্তা খেয়ে গাড়ি যখন আবার চলতে শুরু করল তখন মনে হচ্ছিল, থাক না বাবা! আজ এখানেই থেকে যাই, কাল সকাল হলে না হয় যাওয়া যাবে। এমনই একটা মানসিক চাপ নিয়ে গোপেশ্বরে পৌঁছালাম রাত ন'টায়।

গোপেশ্বরে শুধু রাতটা কাটানোর জন্য রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ফোনে যে সরকারি গেস্ট-হাউসটায় ব্যবস্থা করে রাখা ছিল সেটা দেখলাম প্রচুর দর হাঁকছে। ডরমেটরি ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও দিতে চাইল না। পাশের হোটেল-মালিকও রাজি হল না, কারণ সরকারি গেস্টহাউসকে সে চটাতে চায় না। অবশেষে ঠাঁই হল অন্য একটা হোটেলের ডরমেটরিতে।

সারারাত অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়েছে। ভোরের ঘন কুয়াশা একটু বেলা হতেই উধাও হয়ে গেল। আমরা ততক্ষণে অলকানন্দার পাশ ছেড়ে উখিমঠ যাওয়ার রাস্তায়। আশপাশের দৃশ্যপটে হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। অপরূপ এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জগতে প্রবেশ করলাম। মনে হচ্ছিল, কোথাও যেন বিপর্যয়ের আঁচ বিন্দুমাত্র লাগেনি। কিন্তু এই পাহাড়েরই খাঁজে খাঁজে যে এত কান্না জমাট বেঁধে রয়েছে কে জানত!

চোপতা পেরিয়ে আমরা থামলাম সারিগাঁও, যেখান থেকে দেওরিয়া তালে যাওয়া যায়। এই গ্রামটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের কাজ করার কথা। গ্রামটা পাকা রাস্তার ধারে— এটুকুই যা। পঞ্চায়েতের একটা অফিস আর একটা স্কুল ছাড়া কিছুই নেই। বিদ্যুতের লাইন আছে, কিন্তু দিনে ২-৩ ঘণ্টার বেশি থাকে না। বিপর্যয়ের পর থেকে তাও নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই কোনো, রাস্তার মোড়ে একটামাত্র দোকান আর নেগিজীর একটা গেস্ট হাউস— তাতে হাত-পা খেলিয়ে খুব বেশি হলে দশজন থাকার ব্যবস্থা করা যায়। ছাতুমাখা খেয়ে ওষুধ ভর্তি ব্যাগ নিয়ে দুটো টিমে ভাগ হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কাজে। একটা টিমের সাথে থাকলেন স্থানীয় যুবক আশীষ নটিয়াল।

যে গ্রামগুলোতে আমরা কাজ করেছি সেগুলো খাড়াই পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা মানুষের বসতি। যাতায়াতের কোনো ভদ্রস্থ রাস্তা নেই, অনেক ক্ষেত্রেই শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণার রাস্তা দিয়ে ওঠানামা করে স্থানীয় মানুষ। অসুস্থ মানুষকেও এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। অ্যাম্বুলেন্স দূর কি বাত, একটি গ্রামেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। ছোটখাটো কিছুর জন্যেও ন্যূনতম আট কিলোমিটার দূরে উখিমঠ যেতে হয়। অথচ গ্রামে পঞ্চায়েত ভবন আছে। অবশ্য প্রাথমিক স্কুল আছে— সরস্বতী নামাঙ্কিত, তাতে সর্ব শিক্ষা মিশনের অনুদান আসছে। গত জুনের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে এই গ্রামগুলো ধ্বসে যায়নি, ভেসেও যায়নি, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে অন্যভাবে। গ্রামগুলোর অর্থনীতি নির্ভর করে মূলত কেদারনাথ-কেন্দ্রিক পর্যটন ও ধর্মব্যবসার ওপর। ছোট বড় হোটেল-লজের মালিক-কর্মচারী, হাজারো ছোটবড় মন্দিরের পূজারী-কর্মচারী, দোকানদার, হাতে ফুল-বেলপাতা পুজোর সামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হকার, ডোলি বাহক, ঘোড়া/খচ্চর চালক কিংবা রাস্তা-বাড়িঘর বানানো/সারানোর শ্রমিক ইত্যাদি সমস্ত মানুষই আশপাশের সমস্ত গ্রাম থেকে পাড়ি জমায় কেদারে এই ৬-৭ মাস— অক্ষয় তৃতীয়া থেকে ভাইফোঁটা। (পুরুষদের একটা অংশ মিলিটারিতে চাকরি করতেও যায়।) পুরুষরা বছরের বাকি সময় ঘরে বসে কাটায়। গৃহস্থালির সমস্ত কাজ, বাড়ির আশপাশের একখণ্ড জমিতে ধাপ কেটে দেশীয় পদ্ধতিতে দু-চারটে দেশীয় ফসলের চাষ আর গবাদিপশুর প্রতিপালন, সবকিছুই করে মেয়েরা সারা বছর। বিশেষ ধরনের ঝুড়িতে গবাদি পশুর খাওয়ার জন্য ঘাসপাতা কিংবা জ্বালানির কাঠ অথবা দূরের বাজার থেকে চালডাল কিনে মেয়েদের খাড়াই পথে ওঠানামার দৃশ্যটা এখানে অতি পরিচিত। বয়স্কা মহিলাদের এজন্য কোমর ও পায়ে নানান সমস্যা দেখা যায়। এহেন গ্রামগুলোর অর্থনীতি তাই ধাক্কা খেয়ে গেছে কেদার বিপর্যয়ের ফলে। এদের পুঁজি এবং আয়ের উৎসগুলো ভেসে গেছে, আগামী দু-চার বছরে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আর, প্রতিটা গ্রামেরই দশ-বিশ কোথাও বা চল্লিশ জন মানুষ নিখোঁজ অর্থাৎ মারা গেছেন।

প্রথম দিন, ১লা আগস্ট একটা টিম ক্যাম্প করতে যায় কারোকি গ্রামে, ৩ কিমির মত উৎরাই বেয়ে পৌঁছাতে হয় সেখানে। অন্য টিমটা যায় তিনটে ছোট ছোট গ্রামে— পাপড়ি, দিলমী আর মসতুরা। সবকটা গ্রামই যেতে হয়েছে খাড়াই পাহাড়ি পায়ে চলার পথে। প্রথম গ্রামটির দুজন মারা গিয়েছেন কেদারে। মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। কিছুদিন আগে সরকার থেকে এসে গ্রামটিকে অন্যত্র সরে যেতে বলেছে, কারণ গ্রামটির পেছনে উল্লম্ব যে পাহাড়টা, তাতে ফাটল দেখা দিয়েছে। মাথার ওপর পাহাড় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে গ্রামটির মানুষরা। রাতে ঘুমোতে যায় আরো নীচে একটা স্কুলবাড়িতে। কয়েকজন যুবক সারারাত জেগে গ্রাম আগলে বসে থাকে, দিনে ঘুমোয়। ছোটখাটো শব্দ হলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামের সবাই। আরো নীচে দিলমী গ্রামটায় যখন নামতে শুরু করেছি ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। গ্রামে পৌঁছে যখন ক্যাম্পের তোড়জোড় চলছে তখন তুমুল বৃষ্টি নামল। গ্রামটার পাশ দিয়ে খাড়া ওপরে উঠে যাওয়া দেওয়ালের মত পাহাড়টার দিকে ঘাড় উঁচু করে দেখলে কয়েকটা সরু ঝরনা দেখা যাচ্ছিল। শুনলাম ঘণ্টাখানেক জোর বৃষ্টি হলে ওগুলো ফুলে ফেঁপে পরস্পর জুড়ে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই অনতিদূরের একটা মাঝারি মাপের ঝরনা বৃষ্টির জল পেয়ে পাঁচ-ছয় গুণ বেড়ে গেল, রং ঘোলাটে হয়ে গেল, আটকে থাকা মাঝারি মাপের পাথরগুলো জলের ধাক্কায় টুকটাক পড়তে শুরু করল। বৃষ্টি কমতে যখন আমরা পরের গ্রামটার দিকে রওনা দিলাম তখন জানতে পারলাম ঐ

ঝরনাটার ওপরে একটা ছোট সেতু আছে, সেটা দিয়েই যেতে হবে। সেতুটার ওপর দাঁড়িয়ে পাশের লোকের কথা শোনা যায় না— এত গর্জন, মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে লাগা জলে আপাদমস্তক ভিজে গেলাম। মসতুরা গ্রামে ক্যাম্প করে আবার প্রায় দু কিমি খাড়াই পথে যখন উঠছি, পা আর চলতে চাইছে না।

পরদিন সকালে ঐ একই রাস্তা পায়ে হেঁটে নেমে রাস্তার গাড়ি ধরে উখিমঠের দিকে রওনা হলাম। একটা টিম রাস্তা থেকে উপরের দিকে পাহাড়ি পায়ে চলা পথে পেঞ্চ, কেমারা গ্রামে আর একটা টিম পাকারাস্তা থেকে নিচের দিকে পাঠালি আর ডোঙ্গার গ্রামে। প্রথম দুটো গ্রামে মারা গেছে ২৫ জন আর পরের গ্রামদুটোতে ২৪ জন। একই পরিবারে দুজন মারা গেছে এ ঘটনা অনেকগুলো। ডোলিবাহক ছেলে চোখের সামনে বাবাকে ভেসে যেতে দেখেছে, বাঁচাতে পারেনি। কোনো পরিবারে একজনও পুরুষ বেঁচে নেই। ১৫ বছরের কিশোর যেমন আছে তেমনই ৭৪ বছরের বৃদ্ধও আছে মৃতদের তালিকায়। বৃদ্ধ রামেশ্বর ত্রিবেদী মারা গেছেন ডোঙ্গার গ্রামের, শুনলাম তাঁর নাতি এবার উত্তরাখন্ডের ক্লাস টেনের পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছে। গ্রামগুলোর পঞ্চায়েতের ঘরে কিংবা স্কুলবাড়ির বারান্দায় মেডিকেল ক্যাম্প চলাকালীন আমরা যারা ডাক্তার নই তারা নিহতদের বাড়ি গিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি তাদের কথা। ত্রাণের সামগ্রী হয়ত ছিল অল্পই, কিন্তু চেয়েছিলাম দুঃখের সঙ্গী হতে, পাশে দাঁড়াতে, যাতে মনোবল বাড়ে। জানি টিকে থাকার লড়াইটা তাদের নিজেদেরই লড়তে হবে। শোক সামলে ফেললেও প্রায় সকলেই ত্রাণের জিনিসগুলো হাতে নেওয়ার সময় কেঁদে ফেলছিলেন। এই পরিস্থিতি এবং কাজটা যে কী অস্বস্তিকর এবং কঠিন তা টের পাচ্ছিলাম। এরকম একটা পারিবারিক কাঠামোয়, গোটা এলাকার একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা কোলের, একটা হাতের বাচ্চা, নিদেনপক্ষে স্কুলে পড়া বাচ্চা নিয়ে সদ্য স্বামীহারাদের ভবিষ্যৎটা ঠিক কী সেটা কল্পনা করা যাচ্ছিল না।

ক্যাম্প চলাকালীন প্রতিটা গ্রামেই আশপাশের বাড়ির লোকজন চা করে খাইয়ে গেছে, দুপুরে খেয়ে যেতে বলেছে। এমনকি মৃতদের বাড়িগুলির কোনো একটিও দুপুরে খেয়ে যাওয়ার কথা বলতে ভুলে যায়নি। আমাদের আরও জায়গায় যাওয়ার অজুহাতে উত্তরে অন্তত 'চা খেয়ে যান' বলতে ছাড়েননি। অবস্থাপন্ন বাড়ির লোকও ত্রাণের জিনিস সামান্য বলে ফিরিয়ে দিয়েছে এমনটা হয়নি। গাছ থেকে ফল পেড়ে খাইয়েছে। আগে ত্রাণ এলেও রাস্তার পাশ থেকে আনতে হয়েছে, রাস্তার পাশে বড় গ্রাম ছাড়া মেডিকেল ক্যাম্প হয়নি। সরাসরি গ্রামগুলোত পৌঁছোনোয় আর বাড়ি বাড়ি যেতে পারায় হার্দিক অভিনন্দনও পেয়েছি। এই সারিগাঁও যেখানে দু-রাত ছিলাম ওখানেই ক'দিন আগে টাটা কোম্পানি মেডিকেল ক্যাম্প করে। বয়স্ক দুই ডাক্তার, বেলা ১১টায় ঘুম থেকে উঠে, দু-এক ঘণ্টা ঐ গ্রামে বসেই চিকিৎসা করে তারপর স্থানীয় কাউকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে চলে যেত। দ্বিতীয় রাতে ঐ গ্রামেরই দু-তিন জন করে ভাগাভাগি করে নানান লোকের বাড়িতে খেতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেলাম গ্রামবাসীদের কাছে। অথচ গাড়িচালক, হোটেল-লজের মালিকরা, যারা তীর্থক্ষেত্রের ব্যবসার সাথে যুক্ত, একদমই উল্টো মানসিকতার, ত্রাণের কাজে এসেছি শুনেও সহযোগিতা করতে নারাজ।

পরদিন রওনা দিলাম সারিগাঁও থেকে, অন্য দিনগুলোর মতো ছাতুমাখা খেয়ে। ফেরার পথে মক্কুমঠ আর জগপুরা গ্রাম দুটো হয়ে আসব। গ্রামদুটোর ৬ জন মারা গেছেন রামওয়াড়াতে। মক্কু যাওয়ার পথে উপত্যকার উল্টোদিকের পাহাড়ের পেছন থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য লম্বা বরফশৃঙ্গ দেখা গেল। ফিরতি পথে যদিও মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ফেরার পথে নন্দপ্রয়াগের ৩ কিমি ওপরে রাস্তায় গেলাম আটকে। রাস্তায় ফাটল তৈরি হয়ে অন্তত আধকিমি লম্বা এলাকা বসে গেছে কয়েক ফুট। বাস থেকে নেমে হেঁটে তুলনামূলক নিরাপদ জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তার নিচের অংশ ধ্বসে গেছে, ঝুরঝুর করে অবিরাম ধ্বসে চলেছে, খাদের দিকে কখনো কখনো রাস্তার পিচের অংশটুকু টিকে আছে, তলার পাথর খসে গেছে— যেকোনো মুহূর্তে সেটাও যেতে পারে। রাস্তা মেরামত চলছে কোনো প্ল্যান ছাড়াই। দায়িত্বে আছেন একজন মিলিটারি। প্রকাশ্য রাস্তায় হাতে মদের বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে— খাচ্ছে আর নির্দেশ দিচ্ছে রাস্তা মেরামতের। এক স্বামীজীর কাছে শুনেছি ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় আটকে পড়েন এবং রাস্তা মেরামতের সময় ডিনামাইট ভুল জায়গায় লাগানো হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। পরে নাকি সেই জায়গায় তাঁর নির্দেশনা মত রাস্তা তৈরি করা হয়। কোনো ইঞ্জিনীয়ার নেই, কোনো মাস্টার প্ল্যান নেই; যে যার নিজের মনে হওয়ার ওপর যা খুশি তাই চালাচ্ছে প্রকৃতির সাথে। ভঙ্গুর, অস্থির একটা পাহাড়ে শাবল-গাঁইতির সাবধানী আঁচড়ের বদলে দুমদাম ডিনামাইট ফাটানো হচ্ছে; সস্তায় পুণ্যের ব্যবসা ফেঁদে প্রতিদিন একলাখের কাছাকাছি গাড়ি চালানো হচ্ছে গাড়োয়ালে; ৬০০-৭০০ বার আকাশে চক্কর কাটছে হেলিকপ্টার। নদীর প্লাবনভূমি চুরি করে হোটেল, লজ, রিসর্ট, আশ্রম তৈরি হচ্ছে। শতাধিক জলাধার তৈরি হয়েছে।

ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি চলছে। সরকারি ত্রাণ মাঝরাস্তায় লোপাট হয়ে যাচ্ছে। এলেও বড় রাস্তার পাশে যারা থাকে তারাই পাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জন্য চেক এসেছে বেছে বেছে অবস্থাপন্ন গ্রামগুলোতে, যেখানে নিহতদের বেশিরভাগ মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডা অথবা হোটেল-লজের মালিক, সেখানে।

এর পর ২৩ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

নারী সমস্যা, নারীমুক্তি— মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে

অপরাজিতা মুখার্জী

নারী সমস্যা

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে নারী নির্যাতনের যে চরম হিংস্র নারকীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে তা এই সমস্যার উৎস, স্বরূপ ও প্রতিকার সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করার অবকাশ সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলিকে আবার নতুন করে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, পুরুষ-দাম্ভিকতা, সীমাহীন আধিপত্য আজ নারীর স্বাধীন জীবনধারণের ন্যূনতম শর্তগুলিকে অপহরণ করে নিচ্ছে তাতে সমস্যাটির সর্বব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোথাও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। সমস্যাটি যে শুধুমাত্র নারী পুরুষের সমান অধিকার, তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নততর সুযোগসুবিধা অথবা সরকার পরিচালনায় তার ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করার প্রশ্ন নয়, সমস্যাটির মূল প্রোথিত রয়েছে মানবসমাজের কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই, তা ক্রমশ আরো বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পুরুষের যে দাম্ভিকতা ও আধিপত্যবাদ নারীসত্তাকে অবদমিত করেছে, নারীকে পুরুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে, যুগ যুগ ধরে সমাজ বিকাশের নানা পর্যায়ে ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটেছে। ফলে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের উত্থাপিত যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে সামনে এসে পড়েছে তা হলো, পিতৃতান্ত্রিকতা কি সমাজ-নিরপেক্ষ, শ্রেণী-নিরপেক্ষ একটি দমন প্রক্রিয়া যা সমাজের সর্বস্তরের সংস্কৃতিতে তীব্রভাবে বিদ্যমান থেকে নারীর জীবনযাত্রার স্বাধীনতা হরণ করে তার সব দমনকে চূড়ান্ত করতে চায়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা পিতৃতন্ত্রকে এমন একটি দমন প্রক্রিয়া হিসেবেই মনে করেন যা সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর নানা স্তরে, পরিবারে ও রাষ্ট্রে সক্রিয়ভাবে বিরাজ ক'রে সমগ্র সমাজের পরিচালন প্রক্রিয়াকে পুরুষতান্ত্রিক করে তোলে। একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া হিসেবে পরিবারের অভ্যন্তরে পিতৃতান্ত্রিকতা নারীকে পুরুষের অধীন একটি অবদমিত সত্তায় পরিণত করে। গৃহাভ্যন্তরে সংঘটিত পারিশ্রমিকহীন নারী-শ্রম যদিও সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, তবুও নারী-শ্রমের অবমূল্যায়ন বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকাকে স্বীকৃতিহীন অকিঞ্চিৎকর করে রাখে, ফলে বৃহত্তর সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার অংশগ্রহণ সত্ত্বেও নারীর হীন অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বটিকে সমাজের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব হিসেবে ধরে এঁরা নারীমুক্তির যে উপায় দেখান তা হলো ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে বিরাজমান পুরুষ প্রাধান্যের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা; রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক চরিত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। এঁরা সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রের রীতিনীতিকে পুরুষ প্রাধান্যের বৈশিষ্ট্য সমেত নারীপুরুষ দ্বন্দ্বটির দ্বারাই চালিত বলে মেনে নিয়ে নারী পুরুষের দ্বন্দ্বটিকে সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব বলে ধরে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও শ্রেণী সম্পর্ক নির্বিশেষে পুরুষকে নারীর সঙ্গে আদ্যন্ত বৈরিতা-মূলক সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এই মতবাদ সমগ্র পুরুষজাতিকে সমগ্র নারীজাতির বিরুদ্ধে এমন এক বৈরিতামূলক সম্পর্কে দাঁড় করিয়ে দেয় হিংসাত্মক উপায় ছাড়া যে দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব নয়।

অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদী নারীবাদীরা মনে করেন, পিতৃতন্ত্রের অর্থ হল নারীর যৌনতার উপর পুরুষের কর্তৃত্ব। এঁরা নতুন প্রজন্মের জন্মদাত্রী হিসেবে নারীর বিশেষ পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকেই তার চিরাচরিত অবদমনের জন্য দায়ী করেন। নারীর প্রকৃতিদত্ত এই ক্ষমতাই তাকে একদিন ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী করে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে; তার যৌনতার উপর পুরুষ কর্তৃত্ব স্থাপন ও রক্ষার তাগিদ থেকেই সৃষ্টি হয় পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির রীতিনীতি ও আচরণবিধি যা নারীর অবদমনকে সার্বিক করে তোলে।

নারীর যৌনতার উপর পুরুষের কর্তৃত্বই নারীর সমস্ত রকমের হীনতা ও নিষ্পেষণের জন্য দায়ী— এই যুক্তিটি আরো একটু বর্ধিত করে এই নারীবাদীদের একটি অংশ মনে করেন নারীমুক্তির মূল উপায় হল পুরুষ-নারীর বিষম যৌন সম্পর্ককে পরিত্যাগ করে নারীদের মধ্যে সম-যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে জীবনযাত্রা ও পরিবার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই ব্যাখ্যা থেকে যে প্রশ্ন সরাসরি উঠে আসে তা হলো, প্রথমত— নারীর যৌনতার উপর পুরুষের কর্তৃত্বের উৎস কী, এই কর্তৃত্ব কি নারী পুরুষের চিরাচরিত প্রকৃতিপ্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত, না, এই কর্তৃত্ব মানুষের সৃষ্ট, এর মূল মানবসমাজের বাস্তব উপাদানের মধ্যেই নিহিত। দ্বিতীয়ত : এদের কট্টর অংশটি নারীমুক্তির যে উপায় নির্ধারণ করেছেন তা পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে মানবপ্রজাতির টিকে থাকার উপায়টিকে নস্যাৎ করে দেয়। অন্য একদল নারীবাদী মনে করেন, জিনগত প্রাকৃতিক কারণে নারীদের সহজাত নরম প্রকৃতি, স্নেহমমতা ইত্যাদি সুকুমার বোধগুলি এবং নারীদের সহ্যক্ষমতা, ধারণক্ষমতা ইত্যাদির কারণে তারা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। পুরুষের হিংস্রতা

ও লোভ প্রকৃতি ও নারী উভয়কে নিপীড়ন ক'রে তাদের বস্তুগত সুখসমৃদ্ধি ও ভোগকে চূড়ান্ত করতে চায়। এই চূড়ান্ত ভোগের লক্ষ্যে যখন সে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তখন এই আঘাত সবচেয়ে বেশি বিঘ্নিত করে নারীর জীবনযাত্রাকে; তেমনই প্রকৃতির অঙ্গস্বরূপ নারীসত্তাও এদের লোভের শিকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ এঁরা নারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে তার সমস্তরকম দুর্ভোগের জন্য দায়ী করেন। সুতরাং নারীমুক্তি অর্জন করতে হলে তথা পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর অত্যাচার রোধ করতে হলে, একদিকে যেমন মানুষকে উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে ব্যক্তিগত ছোট ছোট ন্যূনতম ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, অন্যদিকে নারীদের গড়ে তুলতে হবে সম্পূর্ণত নারীসভ্যদের নিয়ে গঠিত পুরুষবর্জিত প্রতিষ্ঠান ও জীবনযাত্রার প্রক্রিয়া। কোনো কোনো ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ অবশ্য মনে করেন, নারী-পুরুষের স্বভাবগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজ দ্বারা সৃষ্ট, নারী-পুরুষে দৈহিক তফাৎ থাকলেও নারী 'নারী' হিসেবে ও পুরুষ 'পুরুষ' হিসেবে প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট নয়, সমাজ দ্বারা নির্মিত ধারণামাত্র, নারীকে ক্রমাগত তার স্বভাবের উপর আরোপিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতিক্রম করে পুরুষের সঙ্গে সমান হয়ে উঠতে হবে। এভাবেই তার মুক্তি হবে।

উদারনৈতিক সংস্কারবাদী, নৈরাজ্যবাদী, পরিবেশবাদী ইত্যাদি নানা ঘরানার নারীবাদীদের নারীমুক্তির প্রশ্নে অনুশীলন ও চর্চা এই প্রশ্নে নতুন নতুন ধারণা ও প্রত্যয় সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে; এই সব নারীদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলি নারী সমস্যা সম্পর্কে নানা বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে। নারী আন্দোলনে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এ সত্ত্বেও নারীমুক্তি প্রশ্নে আমাদের বাস্তব অগ্রগতি যে বিস্ময়করভাবে অকিঞ্চিৎকর রয়ে গেছে বাস্তব ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, নারীবাদীদের এই সমস্ত বিশ্লেষণ থেকে যে সব ধারণা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। যেমন নারীপুরুষ দ্বন্দ্ব সমাজের একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব যা সমাজের ক্ষমতার বিন্যাসে মূল ভূমিকা পালন করে— র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের এই প্রত্যয়টি গ্রহণ করলে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ও মালিকানাহীনতা অথবা সমাজের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় শোষিত ও শোষকের মধ্যেকার বিভাজনটির গুরুত্বকে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসে এই বিভাজনের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করতে হয়। আবার পুনরুৎপাদন ক্ষমতাই নারী সমস্যার মূলে এই ধারণাটিও বিভ্রান্তিমূলক। কারণ, প্রথমত এটি নারী সমস্যার মূল হিসেবে নারীর জৈবিক বৈশিষ্ট্যকেই চিহ্নিত করে। ফলে এ হিসেবে নারী-পুরুষ বৈষম্যের একটি আপাত যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পরোক্ষভাবে হাজির হয়ে যায়। পরিবেশবাদী সমেত এই ধরনের অন্যান্য সমস্ত নারীবাদীরা যাঁরা নারীর জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে নারী-পুরুষ লিঙ্গভেদের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন তাঁদের বিশ্লেষণগুলি এই রকমভাবে পরোক্ষে নারীর দুর্বল অবস্থানের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাকেই জোরদার করে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মানবসমাজের আর একটি অংশ পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা ছাড়া নারীমুক্তির অন্য কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তগুলি অবাস্তব।

এই সমস্ত বিভ্রান্তিমূলক ধারণাগুলি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে রয়েছে নারী সমস্যাকে সামগ্রিকতায় দেখার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীর বাস্তব ও কার্যকর বিশ্লেষণ রাখা সত্ত্বেও অনেক সময়ই নারীবাদীরা সমস্যাটিকে আংশিক ভাবে দেখেছেন। যেমন, পিতৃতান্ত্রিকতাই যে নারী সমস্যার মূল ভিত্তি এটা অস্বীকার করার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, অথবা নারীর যৌনতার উপর পুরুষের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ যে নারী সমস্যার সূচনা করেছে এটিও একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ, তেমনই নারীর সৌন্দর্য্য, তার মাতৃত্ব ও সতীত্বের উপর মহত্ত্ব আরোপ করে, তার স্নেহময়ী রূপের ও ভূমিকার জয়গান করে ও গৃহাভ্যন্তরে তার ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, নারীর ত্যাগ ও আত্মস্বার্থের নিষ্পেষণকে একটি ব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য যেসব ধর্মীয় অনুশাসন ও আচরণবিধি গড়ে উঠেছে— এ সমস্ত কিছুকে সর্বতোভাবে নারীমুক্তির অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারাও চিন্তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অগ্রগতির পরিচয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্ত দিককে নারী সমস্যার মূল হিসেবে চিহ্নিত করলে অন্ধের হস্তীদর্শনের মত সমস্যাটির বিশালতা ও এর মূলগত প্রকৃতি দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। তাছাড়া এই বিশ্লেষণগুলি থেকে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে সামনে এসে পড়ে যেগুলির উত্তর এই বিশ্লেষণগুলি থেকে পাওয়া যায় না। প্রথম প্রশ্নটি হলো, পিতৃতান্ত্রিকতার উৎস কী? পিতৃতান্ত্রিকতা কি সমাজের উপরিকাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না সমাজের বস্তুগত অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত হয়ে এবং এর সঙ্গে সংপৃক্ত থেকে এটি সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে? পিতৃতান্ত্রিকতা ও নারীর উপর পুরুষের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক কী?

সংস্কারবাদী-উদারনৈতিক নারীবাদী র‍্যাডিক্যাল বা নৈরাজ্যবাদী অথবা পরিবেশবাদীরা এই সমস্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। বরং এঁরা পুরুষ কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের তফাতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাকে সন্তানধারণের যে বিশেষ

ক্ষমতা দিয়েছে, তার ফলেই নারী ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ও শিশুপালন ও ঘরকন্নার কাজগুলি নারীর কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই শ্রমবিভাজন নারীকে সামাজিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ঘরকন্নার কাজের বিরাট বোঝা তার শ্রমের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে এবং এর ফলে বাইরের জগতেও সে গুরুত্ব হারিয়েছে। গৃহাভ্যন্তরে সে যখন পুরুষ কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়েছে, গৃহের বাইরে বৃহত্তর সমাজেও তার এই অধীন অবস্থার কোন তফাৎ ঘটেনি; বরং পুরুষ-প্রাধান্যের মতাদর্শ সমাজের ক্ষমতাবিন্যাসকেও সামাজিক আচার আচরণ বিধিকে প্রভাবিত করেছে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে এই ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা খুবই স্পষ্ট। মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে মানুষ যে বিভিন্ন সামাজিক পর্যায় অতিক্রম করেছে। আজ সে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে ও তার ভবিষ্যত গতিমুখ যেভাবে নির্ধারিত হচ্ছে— সমাজবিকাশের এই প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও যোগ না বুঝতে পারলে এই দ্বন্দ্বের বাস্তব সমাধান বিষয়ে কোন দিশা পাওয়া যাবে না।

নারী সমস্যা সম্পর্কে সমস্ত ধরনের বুর্জোয়া মতবাদের বিপরীতে মার্কসবাদী ধারণা মানব সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে দ্বান্দিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতা ও নারীর সার্বিক অধীনতার ইতিহাসটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

সমাজ বিকাশের আদিপর্বে শোষণভিত্তিক শ্রেণীভিত্তিক সমাজ গঠনের আগে সমাজ ছিল শ্রেণীহীন সাম্যবাদী। মানুষের তৈরি সম্পদের ওপর গোটা গোষ্ঠীর সামাজিক অধিকার, সামাজিকভাবে প্রয়োজনভিত্তিক শ্রমবিভাগ ও গোষ্ঠীর যৌথ ঘরকন্না ও ভোগ বণ্টনের প্রক্রিয়া ছিল এই সমাজের বৈশিষ্ট্য। সেই অবস্থায় নারীর সন্তানধারণের বিশেষ ক্ষমতা পুরুষ কর্তৃত্বের জন্ম দেয় নি। বরং নতুন প্রজন্মের জন্মদাত্রী ও পালিকা হিসেবে গোষ্ঠী পরিবারে মায়ের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। তেমনই গোষ্ঠী গৃহস্থালিতে খাদ্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ, পশু শিকার ও খাদ্য তৈরি, চাষবাস, পাত্র ও পোষাক তৈরি, নতুন প্রজন্মের জন্মদান ও লালনপালন— সব কাজে প্রয়োজনভিত্তিক শ্রমবিভাগ থাকলেও— সব কাজই ছিল সামাজিক কাজ। এর মধ্যে নতুন প্রজন্মের জন্মদান ও লালনপালন বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো, কারণ এর সঙ্গে গোষ্ঠীর পুনরুৎপাদন ও মানব সম্পদে শক্তিশালী হয়ে ওঠার বিষয়টি নির্ভর করতো। এক কথায়, সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও ভোগে ও সম্পদের ওপর সামাজিক অধিকারের বিপরীতে ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম, ভোগ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা উদ্ভব না হওয়ার ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রমবিভাজন অথবা নারীর সন্তান ধারণের বিশেষ ক্ষমতা কোনভাবে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য সৃষ্টি করে নি। বরং একটা বিশেষ পর্যায়ে এই শ্রমবিভাজন ও নারীর শারীরবৃত্তীয় বিশেষ ক্ষমতা তার সামাজিক গুরুত্বকে পুরুষের তুলনায় অনেক এগিয়ে রেখেছে।

এর কারণ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত ভোগ ও ব্যক্তিগত পরিবারভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেনি; অর্থাৎ সমাজে শুধুমাত্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের অনুপস্থিতিই শুধু নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিকের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটিও ছিল অনুপস্থিত। পরবর্তীতে সামাজিক সম্পদের বিপুল বৃদ্ধি, উৎপাদনের নানা প্রকরণের উদ্ভব ও এই সব প্রকরণে পুরুষের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উদ্ভব ঘটে। মানুষের শ্রমক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সীমাহীন বৃদ্ধি তার সম্পদকে বিপুল করে তোলে ও সম্পদ সৃষ্টিতে সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে এই সম্পদে পুরুষের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে থাকলো। ফলে পূর্বতন গোষ্ঠী সমাজের সম্পদে ও কাজকর্মে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়ে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলো। সমাজের মানব সম্পদে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে সমাজের বস্তুগত নানা সম্পদে পুরুষের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে এত বিশাল হয়ে উঠলো যে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তিগত সম্পদে পুরুষের নিজের সন্তানের উত্তরাধিকার কায়েম করার প্রশ্নটি প্রাধান্য পেল। ফলে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণকামী পুরুষ নারীর যৌনতা ও তার প্রজনন ক্ষমতাকে ব্যক্তিপুরুষের নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা পেল।

সামাজিক সম্পদে পুরুষের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের ধারণার জন্ম দিল এবং এসবের ফলেই নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর পরিবার ব্যবস্থা যে ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতির জন্ম দিল তার ফলে সন্তানের জন্মদান লালনপালন সমেত সমস্ত গৃহস্থালি কাজই ব্যক্তিগত কাজে পরিণত হল। মানুষের সমস্ত কাজকর্ম ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুটি ভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করলো।

নারী-শ্রম গোটা গোষ্ঠীসমাজের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে পরিণত হয়ে তার পূর্বতন মহিমা হারিয়ে ফেলল। অন্যদিকে উৎপাদনে, উপকরণে ও সম্পদের ওপর ব্যক্তি-পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার মৃত্যুর পর তার আত্মজের হাতেই বর্তাবার প্রয়োজন থেকে একগামী বিবাহ ও একগামী পরিবারব্যবস্থার সূচনা হলো, যা নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণকে সার্বিক ও চূড়ান্ত করে তুললো। নারীর একগামিতা সুনিশ্চিত করার জন্য তার ওপর কঠোর

বাধানিষেধ জারি হল, বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হল। একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে সমাজের সম্পদের আয় ও বৃদ্ধি এবং সেই সম্পদের ওপর ব্যক্তিপুরুষের নিয়ন্ত্রণ তার ক্ষমতাকে সীমাহীন করে তুলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর পরিবার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুললো, অন্যদিকে পিতৃধারায় বংশ পরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ক্রমশ একগামী পরিবার ব্যবস্থাকে অনড় ও স্থিতিশীল করে তুললো। এইভাবে সমাজ বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে সমাজে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুই-এর মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্বটি পুরুষ কর্তৃত্বের ভিত্তি তৈরি করে সমাজে নারী পুরুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটিকে কর্তৃত্ব ও অধীনতার দ্বন্দ্বে পরিণত করলো।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব থেকেই শ্রেণীশোষণ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানা পর্যায় জুড়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিকের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি সামাজিক শ্রেণীগুলির চরিত্র ও এদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নতুন নতুন রূপ নেয়। এই গোটা পর্যায় জুড়ে মানুষের ওপর মানুষের লিঙ্গভিত্তিক পীড়ন ও নারীর একগামিতার ওপর গড়ে ওঠা পরিবার ব্যবস্থা শ্রেণীভিত্তিক পীড়নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও এই সম্পত্তিতে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতি শ্রেণীশোষণভিত্তিক অর্থনীতির প্রক্রিয়ায় অত্যাবশ্যক প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে। তা শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শোষিত শ্রেণীর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা ও শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা, বিচার ও শাসন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সশস্ত্র সৈনিক— এসব কিছুকেই কাজে লাগায় শ্রেণীশোষণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সেই সম্পত্তিতে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারকে সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে।

শোষণভিত্তিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভিত্তিক নারীর একগামিতার ওপর গড়ে ওঠা পরিবার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে দেখা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পুরুষ ধারায় বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অবিরত পুনরুৎপাদন সম্ভব হয় নারীর একগামিতার ওপর গড়ে ওঠা পরিবার ব্যবস্থার মধ্যেই। তাই পরিবার হল শ্রেণীশোষণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর সমাজে এক ন্যূনতম সামাজিক অর্থনৈতিক একক, যা রাষ্ট্রকে তার অত্যাবশ্যক কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে তার অপরিহার্য সহকারীর ভূমিকা নেয়। শোষণভিত্তিক সমাজে পরিবারের এই অত্যাবশ্যক ভূমিকার জন্যই নারীর সার্বিক অধীনতা ও পুরুষ কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত পরিবারব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসা হয়। নারীর বিশ্বস্ততা, তার একগামিতা, পুরুষের কর্তৃত্ব ও পুরুষের কাছে নারীর সার্বিক বশ্যতা ও আত্মনিবেদন ইত্যাদি যেসব ধারণা ও মূল্যবোধ একগামী পরিবার ব্যবস্থার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে সেই সমস্ত ধারণা ও মূল্যবোধ সমেত একগামী পরিবারগুলি শোষণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুরক্ষিত হতে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা যেমন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজটি— ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ভোগের অর্থনীতি ও দর্শনকে সুরক্ষার কাজটি— করে, একই সঙ্গে রাষ্ট্র পিতৃতান্ত্রিকতাকে রক্ষা করে।

এইভাবে মানব সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর শ্রেণীশোষণভিত্তিক সমাজের ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতির নিরবিচ্ছিন্ন পুনরুৎপাদনের প্রয়োজন থেকেই নারী-পুরুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি কর্তৃত্ব ও অধীনতার রূপ নেয়। সম্পদের ওপর ব্যক্তি পুরুষের মালিকানা সমাজের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুই বিরোধী বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। মানুষের ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে তার সামাজিক সত্তার বিরোধ এবং ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতির সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের বিচ্ছিন্নতা নারী পুরুষ দ্বন্দ্বের উৎস। নারী কোন বিশেষ শ্রেণী নয়। নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়।

পিতৃতান্ত্রিকতা সমাজ নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয়, বরং সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্ন পুনরুৎপাদনের প্রয়োজন থেকেই পিতৃতান্ত্রিকতা ও নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে।

মার্কসীয় বিচার পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নারী সমস্যা সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা কয়েকটি ধারণায় উপনীত হতে পারি :

১। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতির সূচনা ও সামাজিক জীবনযাত্রায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুই বৈপরীত্যের সূচনা পিতৃতান্ত্রিকতার ভিত্তিভূমি তৈরি করে।

২। নারীর মানব প্রজন্ম সৃষ্টি করার ও মানব প্রজাতিকে রক্ষা করার বিশেষ জৈবিক ক্ষমতা যৌথ সামাজিক ব্যবস্থায় বস্তুগত উৎপাদনী ক্রিয়াকর্ম ও মানব প্রজাতির পুরুৎপাদন ক্রিয়ার মধ্যে কোন বৈপরীত্যের সম্পর্ক তৈরি করে না।

৩। এই শ্রম বিভাজন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতিতে পুরুষ ধারায় বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নারীর সার্বিক অবদমনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবার ব্যবস্থার সূচনা করে।

৪। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতির উপর গড়ে ওঠা শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার

প্রয়োজনে রাষ্ট্র নারীর অবদমনের ওপর গড়ে ওঠা একগামী পরিবার ব্যবস্থাকে রক্ষা করে।

৫। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ যুগযুগ ধরে নারীপুরুষ লিঙ্গভেদের ধারণাটি সাংস্কৃতিক স্তরে পুনরুৎপাদন করে চলেছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচরণ বিধির মধ্যে দিয়ে সমাজ পিতৃতান্ত্রিকতার সংস্কৃতিকে পুরুৎপাদন করে চলে। নারীর সতীত্ব, তার মাতৃত্ব, পুরুষের কাছে তার সার্বিক অধীনতা ও আত্মনিবেদন ইত্যাদি ধারণার ওপর কৃত্রিম মহত্ত্ব আরোপ করে সমাজ এই ধারণাগুলিকে রক্ষা করে চলে। এইভাবে পিতৃতান্ত্রিকতা একাধারে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে সক্রিয় থাকে।

এই বিশ্লেষণ প্রাক্-ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার জন্য পিতৃতন্ত্র ও নারী সমস্যার প্রশ্নে একটি সার্বিক ধারণা দিলেও ধনতন্ত্রে পিতৃতন্ত্রের রূপে আরো নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ঘটে যা বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে —

১। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজনে তৈরি হয় স্বাধীন শ্রমের বাজার। এই ব্যবস্থার সূচনায় শ্রমের অসীম চাহিদা সৃষ্টি হতে থাকার ফলে ভূমিদাসকে তার পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল মুক্ত করে স্বাধীন শ্রমের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভূমিদাসের সঙ্গে যেমন এক দিকে তার পরিবারের নারীকেও শ্রমের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তেমনই উৎপাদনে ব্যাপক ভাবে নারীশ্রমের ব্যবহার ঘটতে থাকে যা সাধারণভাবে নারীর অবস্থানে অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি আসে তাহল নারী-পুরুষের মধ্যেকার সুদৃঢ় শ্রমবিভাজনের আংশিক অবসান ঘটার পরিস্থিতি সৃষ্টি। নারীশ্রম ও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভোগ অর্থনীতির পুনরুৎপাদন ও মানব সম্পদের পুনরুৎপাদনের কাজে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আবার সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

২। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ ও সর্বোচ্চ লাভের জন্য এই উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগের প্রক্রিয়া দ্বারা চালিত একটি উৎপাদন সম্পর্ক। মুনাফার পর ভোগ ও ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে সীমাহীন করার আকাঙ্খাই বুর্জোয়া ব্যবস্থার চালিকা শক্তি। বুর্জোয়া ব্যবস্থা এই লক্ষ্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় চালিত করে। এই লক্ষ্যের উপযোগী দর্শন হল উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভোগবাদ, এবং মতাদর্শ হল সীমাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মতাদর্শ। বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এই দর্শন ও মতাদর্শকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুনরুৎপাদন করে চলার প্রয়োজনে একে সমাজের ন্যূনতম একক হিসেবে পরিবারে সঞ্চারিত করার প্রয়োজন হয়। এর জন্য নারীকেও তার সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতা ও তার মূল্যবোধ থেকে মুক্ত করে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনেই বুর্জোয়া সমাজ নারীর ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিল। নারীর সামনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচিত হল।

৩। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী সমস্যার সমাধান হওয়া দূরে থাকুক এই সমস্যা আরো জটিল রূপ নেয়। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের উপকরণে ও সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার পরিবর্তন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ঘটায় না, বরং এই ব্যবস্থা শ্রেণী শোষণ ব্যবস্থার একটি অতি-উচ্চ রূপ হিসেবে ব্যক্তিগত ও সামাজিকের দ্বন্দ্বকে আরো বেশি তীব্র করে তোলে। পূর্বতন সমস্ত সমাজব্যবস্থার মতই বুর্জোয়া ব্যবস্থাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত ভোগ ও এসবের কেন্দ্র হিসেবে একগামী পরিবার ব্যবস্থার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষ ধারায় বংশ পরিচয় ও উত্তরাধিকার এই সমাজেরও বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ও পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে সংঘটিত ভোগ অর্থনীতির শব্দে যুক্ত কাজকর্মের বোঝা নারীর অবস্থানে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে দেয় না। তাই বুর্জোয়া সমাজে নারীর স্বাধীনতা হল সমাজ ও পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য, পিতৃধারায় সন্তানের বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি নারীর অবদমনের ওপর গড়ে ওঠা একগামী পরিবার ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার স্বাধীনতা।

৪। পুঁজিবাদ তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে নারীর ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট হীন অবস্থানকে কাজে লাগায়। নারীকে স্বাধীন শ্রমের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করে কিন্তু পারিবারিক শ্রম ও সামাজিক উৎপাদনের শ্রমের দ্বৈত বোঝার কারণে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা অপ্রধানই থেকে যায়। পুঁজিবাদ যত উন্নত হয়, যতই তা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, ততই নারী শ্রম পুঁজিবাদী শোষণের এক বিশেষ হাতিয়ারে পরিণত হয়। পুঁজিবাদ নারীকে সস্তা শ্রমের মজুত ভাণ্ডারে পরিণত করে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সস্তা নারীশ্রম ব্যবহার করে সস্তা শ্রমের যোগান হিসেবে মুনাফার হারকে সর্বোচ্চ স্তরে বেঁধে রাখার স্বার্থে।

৫। বুর্জোয়া পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় বাজার একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান। বুর্জোয়া ব্যবস্থা সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বাজার ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসে। বুর্জোয়া উগ্র-ভোগবাদ ক্রমশ ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গায় ব্যাণিজ্যিক লেনদেন ও হিসাবনিকাশকে পারস্পরিক সম্পর্কের মূল উপাদানে পরিণত করে। এই ব্যবস্থা অন্যান্য বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে নারীকেও একটি বিক্রয়যোগ্য বিলাস পণ্যে পরিণত করে। নারীর যৌনতাকে পুরুষের মনোরঞ্জনের একটি সাধারণ পণ্য

হিসেবে দেখা হয়। সাধারণভাবে নারী সম্বন্ধে পূর্বতন সমস্ত পিতৃতান্ত্রিকতার সংস্কৃতির সঙ্গে একটি নতুন অসম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সংযোজন ঘটে। সামন্ততন্ত্রের সাধারণ মূল্যবোধ নারীর মাতৃত্ব, সতীত্ব, নারীত্বের জয়গান করে নারীর অসম্মানজনক অবস্থাকে আড়াল করতে চায়। বুর্জোয়া সমাজের উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতা নারীর উপর আরোপিত মহিমার সমস্ত আবরণ ছিন্ন করে নারীকে সাধারণভাবে ভোগের একটি উপকরণে পরিণত করে। দাস যুগে ও সামন্তযুগে পুরুষের দিক থেকে একগামিতা কখনই বজায় ছিল না অথচ নারীর দিক থেকে কঠিনতম একগামিতা দাবি করা হতো। বুর্জোয়া যুগে একগামিতার মূল্যবোধের সাধারণ অবক্ষয় ঘটে যায়। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে বিকৃত ধারণার জন্ম দেয়। ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে নারীর শ্রমকে স্বাধীন শ্রমের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার স্বাধীনতা নারীর একটি অর্জিত স্বাধীনতা। কিন্তু নারীর দেহকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করে ভোগ্যপণ্যের বাজারে নারীর দেহসৌষ্ঠবকে বিক্রি করার স্বাধীনতা নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিচয় বলে মনে করাটা হলো নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি বিকৃত ধারণা। এটি বুর্জোয়া পুরুষতান্ত্রিকতারই সৃষ্টি এবং পুরুষতান্ত্রিকতার মূল্যবোধকেই পরিপুষ্ট করে। বুর্জোয়া নারীবাদের একটি অংশের মধ্যে এই চেতনাটি অনুপস্থিত। ফলে নারীর দেহোপজীবিকার মধ্যে যে পুরুষ-দাম্ভিকতা লুকিয়ে আছে তার মর্মবস্তু সম্বন্ধে তারা শুধু উদাসীন তাই নয়, তারা স্বাধীন দেহোপজীবিকার পথে বাধাগুলিকে অপসারণকে নারী-মুক্তির পথে একটি অগ্রগমন বলে মনে করে। এই উপজীবিকার সম্পূর্ণ অবসানের জন্য এই হীন অবস্থানে পড়ে থাকা নারীদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের আন্দোলন ও চেতনার স্তরে পরিবর্তন আনার জন্য এদের সংগঠিত করার কাজটি এই সব নারীবাদীদের কর্মসূচির বাইরে থেকে যায়।

৬। নতুন বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কে নারীর গৃহস্থালি শ্রমের ভূমিকা আর একটি বিভ্রান্তিকর ধারণার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নারীর গৃহস্থালী শ্রমের মজুরির দাবিটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। নারীবাদীদের একটি অংশ এই দাবিটির স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বকে পুরুষতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছেন। এঁরা মনে করেন বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পেলেও গৃহাভ্যন্তরে সংঘটিত শ্রমিক গৃহিণীর শ্রম কোন মূল্য পায় না, যদিও এই শ্রম এবং শ্রমিকের সামাজিক শ্রম উভয়ই সামাজিক মূল্য সৃষ্টি করে কারণ শ্রমিক গৃহিণীর শ্রম গৃহস্থালির ভোগকে পুনরুৎপাদনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকের শ্রমক্ষমতাকে পুনরুৎপাদন করে। মার্কস তাঁর মূল্যতত্ত্বে সমাজের মানুষের ভোগের যাবতীয় পণ্যকেই শ্রমের মূল্যে পরিমাপ করেছেন। কোন সমাজে কোন সময়ে যা কিছু উৎপন্ন হয় এই সমস্ত কিছুকেই শ্রমের মূল্যে পরিমাপ করলে দেখা যায় সব ধরনের পণ্যের সমমূল্যের বিশাল শ্রম। এর একটি অংশ উদ্বৃত্ত শ্রম যা মালিক সরাসরি শ্রমিকের কাছ থেকে আত্মসাৎ করে। অপর অংশটি আবশ্যিক শ্রম যা শ্রমিকশ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখে। তার পরিবার সমেত সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকেই ভরণপোষণ ও পুনরুৎপাদন করে। এই আবশ্যিক শ্রমের শ্রমমূল্যের একটি অংশ দিয়েই শ্রমিক-গৃহিণী ও তার পরিবারের সকলেরই ভরণপোষণ হয়। শ্রমিকের এই আবশ্যিক শ্রমের একটি অংশের সঙ্গে গৃহস্থালি শ্রমের বিনিময় ঘটে গৃহাভ্যন্তরেই। মার্কস তাত্ত্বিক বিমূর্তকরণের ক্ষেত্রে শ্রমের আবশ্যিক শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যে এইভাবে তফাত করলেও আবশ্যিক শ্রমের উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী পরোক্ষ ভূমিকাকে কখনো অস্বীকার করেন নি। গৃহস্থালি শ্রমের জন্য মজুরির দাবিটি বিভ্রান্তিকর এই কারণে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমের বিনিময় মজুরি দেওয়া হয় তখনই যখন তা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ শ্রমিক-গৃহিণীর ভোগের জন্য শ্রমের উপর নতুন উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি করার প্রয়োজন পড়বে। শ্রমিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেই আবশ্যিক শ্রমের অধিকারী হয়। একইভাবে গৃহস্থালি শ্রমকে শ্রমের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করতে হলে আবশ্যিক শ্রমের এই অংশটিকেও পুঁজির আওতায়, পুজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার বিনিময়েই শ্রমিক তার যে আবশ্যিক শ্রমের অধিকারী হয়েছে সেই আবশ্যিক শ্রমের একটি অংশ শ্রমিক গৃহিণীর জীবনযাত্রার পুনরুৎপাদনে কাজে লেগেছে, এই পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমে পরিণত হয়েছে, যা শ্রমিক গৃহিণীর শ্রমের সঙ্গে বিনিময় হয়েছে গৃহাভ্যন্তরে। উপরন্তু এই দাবিগুলি পারিবারিক ভোগ অর্থনীতিতে পুঁজির নিয়ম ও শাসনকে বিস্তৃত করার পক্ষে, যার পরিণতি হল গৃহিণীর গৃহাভ্যন্তরে শ্রমের ওপর পুঁজির সরাসরি নিয়ন্ত্রণ। এর বিপরীতে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গৃহাভ্যন্তরে শ্রমিক গৃহিণীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতা, পরিবারের আয়ের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ও পারিবারিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি করে। গৃহ-শ্রমে পুরুষের অংশগ্রহণ ও সামাজিক শ্রমে ও অন্যান্য কাজকর্মে নারীর অংশ নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। একই সঙ্গে নারীর আবশ্যিক শ্রমের সামাজিক গুরুত্ব, নতুন প্রজন্মের জন্মদান ও লালন পালনের কাজটির অসীম গুরুত্ব— যে কাজটি বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদন সম্ভব করে চলেছে তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দাবি করে। এই মর্যাদাপূর্ণ অসীম গুরুত্বের কাজটি যাতে তার বহির্জগতের দায়িত্ব ও সামাজিক কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার কারণ না হয়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে যাবতীয়

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রের কাছে দাবি করে।

নারীমুক্তি

নারী সমস্যা শুধুমাত্র নারীর গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতার সমস্যা নয়। নারী সমস্যা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক উপরিকাঠামো থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যা। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ভর রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন ছাড়া নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি নারী মুক্তি প্রশ্নে বুর্জোয়া উদারনৈতিক ও সংস্কারবাদী মতামত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই নারীমুক্তির উপায় খোঁজে। পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে মুক্তি দিতে পারে না, কারণ এ সমাজ ব্যক্তি সম্পত্তি নির্ভর পরিবার ব্যবস্থার উপর টিকে থাকে, এখানেও সন্তানের ওপর পিতার অভিভাবকত্বই স্বাভাবিক অভিভাবক হিসেবে গণ্য হয়। পিতৃধারায় বংশ পরিচয়, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চালু থাকে, অথচ সন্তানের লালনপালনের মূল দায়িত্ব থাকে মায়ের। বুর্জোয়া সমাজে নারী বিবাহবিচ্ছেদের ও পুনর্বিবাহের অধিকার পেলেও পুরুষ কর্তৃত্ব অস্বীকার করার অধিকার পায় না, কারণ পিতৃতান্ত্রিকতার সঙ্গে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পুরুষের প্রধান ভূমিকা পুরুষ কর্তৃত্বকে অনস্বীকার্য্য করে তোলে।

এ বিশ্লেষণ খুব স্বাভাবিকভাবেই পিতৃতান্ত্রিকতার অবসানের উপায় হিসেবে যে স্পষ্ট দিকনির্দেশটি দেয় তা হলো : ব্যক্তিগত ও সামাজিকের যে দ্বন্দ্ব পিতৃতান্ত্রিকতার উৎস সেই দ্বন্দ্বের সমাধানেই এর অবসান ঘটতে পারে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে শুধুমাত্র উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেই নয়। উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা একটি প্রাথমিক শর্ত মাত্র। ব্যক্তিগত ও সামাজিকের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও ঘর-গৃহস্থালির কাজের সামাজিকীকরণ দরকার। সন্তানের লালনপালন, নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও বিকাশকে একটি সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করা দরকার। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে উৎপাদিকা শক্তির বাধাবন্ধহীন বিকাশকে সুনিশ্চিত করেই। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত উৎপাদকের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে এটি সম্ভব নয়। তাই একটি পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক উৎক্রমণ প্রক্রিয়াই একমাত্র নারীর পূর্ণ মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

মার্কসীয় ধারণায় সমাজতন্ত্র এমন একটি উৎক্রমণকালীন ব্যবস্থা যেখানে ক্রমাগত বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বটির অবসান ঘটে। একমাত্র এমন একটি প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পুরুষ ধারায় বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে পুরুষ প্রাধান্যের ভিত্তি ধ্বংস হতে পারে। গৃহস্থালি কাজের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, উৎপাদন উপকরণে নারী-পুরুষের সমান যৌথ কর্তৃত্ব নারী পুরুষকে সমান মর্যাদা ও সমগুরুত্বের জায়গায় নিয়ে আসবে। সন্তানের সামাজিক লালনপালন নারীর পূর্ণ স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে ও পুরুষ প্রাধান্যের সমস্ত ভিত্তিকে ধ্বংস করবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জায়গায় সামাজিক উন্নতিকে চূড়ান্ত করার লক্ষ্য ব্যক্তি মানুষের কর্মপ্রেরণার একমাত্র চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আর্থিক লেনদেনের হিসেব নিকাশের বদলে পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও মানবিক অনুভূতি প্রাধান্য পাবে। ফলে বিবাহ, নারী পুরুষের মধ্যে সুবিধার বিবাহ না হয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ ও অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি স্বাধীন সম্পর্কে পরিণত হবে। পুরুষ প্রাধান্য ও সামাজিক বাধানিষেধের বোঝা না থাকায় পরিবারগুলি হয়ে উঠবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রকৃত একগামী পরিবার। ব্যক্তিগত ভোগে অর্থনীতির ক্রমাগত সামাজিকীকরণ হতে থাকলে পরিবারগুলি ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা ও স্বার্থ চরিতার্থ করার কেন্দ্রে পরিণত না হয়ে সামাজিক কাজে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে। একমাত্র এমন একটা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই নারীর পূর্ণ মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। নারীর মুক্তির লড়াই তাই শেষ বিচারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সমস্ত রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমেত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্ছেদের লড়াই এবং একটি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই। তাই পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতিটি প্রকাশের বিরুদ্ধে নারীর আন্দোলন শেষ বিচারে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন, কিন্তু বাস্তবে পিতৃতান্ত্রিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণার অভাবে নারী আন্দোলনের গতিমুখ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও পিতৃতান্ত্রিকতা বিরোধী দাবিগুলির রাষ্ট্র-বিরোধী চরিত্র উদঘাটিত হওয়ার বদলে আন্দোলনগুলি সংস্কারবাদী অথবা নৈরাজ্যবাদের কানাগলিতে বন্ধ্যা হয়ে পড়ে।

নারীমুক্তি মার্কসীয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে একথা মনে করলে ভুল হবে যে একমাত্র সমাজতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক লড়াইয়ে সামিল হওয়া ছাড়া নারী আন্দোলনের ও নারী সংগঠনের অন্য কোন কাজ নেই। পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে উদ্ভূত অসংখ্য নারী বিরোধী ও পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, অনুশাসনের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন গড়ে তোলা ও এই উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কর্মসূচি ও দিশা-সমৃদ্ধ নারী সংগঠন গড়ে তোলা নারী মুক্তির আশু কাজ। আমরা দেখেছি অতীতে বিভিন্ন মতাদর্শের নারীবাদীরা এই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে নারীর অবদমন বিরোধী ও তার অধিকারের স্বপক্ষে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। শিক্ষায়-দীক্ষায় সামাজিক

কাজকর্মে নারীর অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। বিভিন্ন নারীবাদীরা প্রতিনিয়ত নারী অধিকার দমনকারী রীতিনীতির বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলন গড়ে তুলছেন ও নতুন নতুন চিন্তার আলোকে নারী সমস্যার নানা দিককে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু এই নারী আন্দোলনগুলিকে একত্রিত করে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ প্রক্রিয়া গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। একদিকে যেমন নারী আন্দোলনগুলি তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের স্তরে বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, অন্যদিকে একটি সুনির্দিষ্ট দিশার অভাবে দুর্বল ও গতিহীন হয়ে পড়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত স্তরে নারী যখন তার ওপর আরোপিত সমস্ত রকম পিতৃতান্ত্রিক ধারণা ও বাস্তব বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বারবার পুরুষের আক্রমণের শিকার হচ্ছে তখন তার বিরুদ্ধে নারীবাদীদের তেমন কোন কার্যকর সংগঠিত সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে না। নারী আন্দোলনগুলিকে সঠিক দিশায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রকাশগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে যে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও মতাদর্শ পিতৃতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে কার্যকর, তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে ঘটনাগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইগুলিকে সামগ্রিকভাবে পিতৃতন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ের অংশ হিসেবে সংগঠিত করতে হবে। রাষ্ট্রের নারী-বিরোধী সামগ্রিক চরিত্রের সঙ্গে সমাজে সংঘটিত নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক আক্রমণগুলির যোগসূত্রকে প্রকাশ করে পিতৃতান্ত্রিকতার খণ্ড প্রকাশ বিরোধী আন্দোলনকে রাষ্ট্রের নারীবিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নারী আন্দোলনগুলিকে এইভাবে সামগ্রিক দিশার ওপর দাঁড় করাতে পারলে সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির রাষ্ট্র বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে নারী আন্দোলনের যোগ প্রতিষ্ঠা করার পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হবে। বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নারী আন্দোলনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হলে আন্দোলনগুলিকে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড় করাতে হবে, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলিকে একত্রিত করে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি আপাত-বিচ্ছিন্ন দাবি ও আন্দোলনের পিতৃতান্ত্রিকতা-বিরোধী ও রাষ্ট্র-বিরোধী সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরতে হবে। এই কাজটি যথাযথ করার মধ্য দিয়ে অন্যান্য নিপীড়িত গোষ্ঠীর নিপীড়ন বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে নারী আন্দোলনের যোগের দিকগুলি ধারণায় আনা সম্ভব হবে ও বাস্তবে প্রয়োজন হলে পুরুষতান্ত্রিকতার আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপক দৃঢ় আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আজকের বাস্তব অবস্থা এমন একটি সুসংবদ্ধ দৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উত্তাল নারী আন্দোলনের উপস্থিতি দাবি করে।

উত্তরাখণ্ড : বিপর্যয়ের একমাস পরে

১৫ পৃষ্ঠার পর

মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে ভীষণ মিথ্যাচার চলছে। এই গ্রামগুলোর সকলেই মারা গেছে রামওয়াড়ার কাছে। ঘটনার দুদিন আগে অবধি বনধ্ চলেছে কেদারনাথে। ফলে গৌরীকুণ্ড হয়ে বেশীরভাগ লোক বিপর্যয়ের সময় রামওয়াড়াতেই ছিল। স্থানীয়দের মতে, রামওয়াড়াতেই মারা গেছে চল্লিশ হাজার মানুষ। সমগ্র সংখ্যাটা লক্ষাধিক। গুপ্তকাশী থেকে যাত্রাপথে কেদারনাথ, বাসুকেদার এবং কালীমঠের রাস্তায় অবস্থিত ফাটা, লঙ্গরী আর কোটমায় হোস্টেলে থাকা ছাত্র ভেসে গেছে যথাক্রমে ৮০, ৩৬ এবং ৬০ জন।

উদ্ধারকার্যেও সেনাবাহিনীর যে তৎপরতার ছবি দেখেছি সেখানেও ছিল বৈষম্য। সেনাবাহিনী আগে উদ্ধার করেছে বিদেশি পর্যটকদের, তারপর ভারতীয় পর্যটকদের। স্থানীয় গাড়োয়ালিদের উদ্ধারের ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়নি; এমনকি যে জায়গাগুলোতে তুলনায় গরিব তীর্থযাত্রীরা আটক থাকতে পারে সেখানে পৌঁছতে পারার অসুবিধা না থাকলেও সেগুলোকে এড়িয়ে গেছে। আরো একটা ভয়ানক গল্প শুনলাম স্থানীয় মানুষদের মুখে— প্রতি বছর এই তীর্থের মরশুমে প্রচুর গরিব মানুষ কাশ্মীর আর নেপাল থেকে এখানে আসে, বেশীরভাগেরই নাম নথিভুক্ত থাকে না। খোলা আকাশের নীচে, মন্দিরের চাতালে রাত কাটায় আর কম পারিশ্রমিকের সবচেয়ে বেশি দৈহিক পরিশ্রমের কাজ তারা করে। পর্যটকদের জিনিস চুরি হওয়া কিংবা মেরে ধরে কেড়ে নেওয়ার যে খবর আমরা বিপর্যয়ের সময় পাচ্ছিলাম তার পুরো দায় গাড়োয়ালিদের একাংশ চাপিয়ে দিয়েছে কাশ্মীর আর নেপাল থেকে আসা লোকেদের ঘাড়ে। এবং এ কথাও একাধিক লোকের মুখে শুনেছি যে মিলিটারি এহেন কাশ্মীর বা নেপালি দেখলে তাদের ঘাড় ধরে মন্দাকিনীর উত্তাল স্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

ঐ কয়টি গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প সব মিলিয়ে ৪৫০-এর বেশি মানুষের চিকিৎসা আর ওষুধ দেওয়ার কাজ করা গেছে। কম্বল এবং আলোর সরঞ্জাম (টর্চ, মোমবাতি, গ্যাস লাইটার, দেশলাই ইত্যাদি) ২০০ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে, বিবেচনামত কাউকে কাউকে সামান্য হলেও আর্থিক সাহায্যও করা গেছে। আমাদের মত অনেক গ্রুপই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ত্রাণের কাজ করেছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তা সবসময়ই অপ্রতুল। কিন্তু যা তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে, তা নিয়ে কী ভয়ানক দুর্নীতি চলছে তা আর নতুন করে বলার নয়। শুধু আর্থিক অনুদান নয়, তাদের প্রয়োজন টিকে থাকার, ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রামে পাশে থাকার জন্য সদর্থক বন্ধুর। সরকার কোনোদিনই সে ভূমিকা পালন করে না, করবেও না। সেটা নিয়ে দাবি জানাতে হবে। আর সরাসরি চ্যালেঞ্জ করতে হবে যে জন্যে এত প্রাণ গেল, উন্নয়নের সেই ভ্রান্ত নীতিগুলোকে।

প্রবন্ধ

নারীর আত্ম-আবিষ্কারের পথ : *দ্য সেকেন্ড সেক্স*

এষা বসু

মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়নকারী যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে নারীর অবদান স্বাভাবিকভাবেই কম— আর এই কমের মধ্যেই নারীর অন্যতম সেরা অবদান 'দ্য সেকেন্ড সেক্স', রচয়িতা সিমোন দ্য বোভোয়া। এই পুস্তক পাঠের ফলে গভীর বেদনার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে একই সত্য দুবার আবিষ্কার করা যায়— প্রথমবার জীবনের দীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ হাঁটতে হাঁটতে, দ্বিতীয়বার যথেষ্ট পরিণত বয়সে, এই বইয়ের মুখোমুখি হয়ে। আমাদের দেশের প্রতিটি মেয়েরই যে অভিজ্ঞতা আছে, পৃথিবীব্যাপী সমস্ত মেয়েরই সেই একই অভিজ্ঞতা, এবং সেই বিষয়ের মূলত ফরাসি দেশের বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে সমাজের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘটনাবলী নিয়ে, মানব সভ্যতার আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করে মাদাম নির্ভুলভাবে এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন যে মেয়েরা 'সেকেন্ড সেক্স' অর্থাৎ অধোলিঙ্গ। আমাদের চেতনায় বিচ্ছিন্নভাবে ভাসমান যে অভিজ্ঞতাগুলি ছিল সেগুলি স্পষ্ট হয়ে রূপ পায় বোভোয়া-র এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত জানার পর। তিনি মেয়েদের নিজেদের সম্পর্কে এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করেছেন এই গ্রন্থে। এই বইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর আচ্ছন্নতা কাটতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল আমার।

যে গ্রন্থটি বাস্তবতই কোন পুরুষের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না এবং যার জন্য সভ্যতাকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল তার নিশ্চয়ই একটি প্রস্তুতিপর্ব ছিল। এই প্রস্তুতির একটা হল বাইরের দিক— শিল্পবিপ্লব, ফলত উৎপাদন শ্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং তাত্ত্বিক দিক হল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', এঙ্গেলসের 'পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রর উৎপত্তি' এবং বেবেলের 'নারী : অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত'। তার সাথে আছে সিমোনের নিজের ও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের ভূমিকা। আর একটি দিক হলো সিমোনের অন্তরের দিক যা একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিংশ শতাব্দীর প্যারিসে অভিজাত পরিবারে জন্ম তাঁর, 'নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয়ে' উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং পিতামাতার ইচ্ছানুসারেই মেধাজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে মনোযোগী হন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণী যে স্বাধীনতা ভোগ করে সিমোন তা পুরোপুরি পেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ''আমি প্রায় অনায়াসে পুরুষের জগতে প্রবেশ করতে পেরেছি, এবং এও দেখাতে পেরেছি যে শিল্প সাহিত্য বা দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আমিও 'পুরুষের সমস্তরে' আলোচনা করতে পারি, ...আমিও যে কোন মেধাজীবী পুরুষের সমান উপার্জন করতে পারি এবং তাদের মতোই গুরুত্ব পেতে পারি।''

তিনি কিন্তু এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে সমাজের বেশিরভাগ মেয়ে তাঁর মতো সুবিধা পায় না। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা তাঁকে এই লেখায় সাহায্য করেছিল। 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' লেখার সময় তিনি লিঙ্গ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর অসাধারণ মেধার জন্য এবং অসামান্য প্রস্তুতির কারণে এই মহান গ্রন্থটি লিখতে বোভোয়া-র সময় লেগেছিল মাত্র দুবছর।

১৯৪৯ সালে প্যারিসে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটি প্রথম সপ্তাহেই ২২ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রচুর বিক্রি হয়। এর ফলে তাঁকে তুমুল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়, ব্যক্তিগত আক্রমণও বাদ যায় না। মূলত পুরুষমুখী সমাজ বোভোয়া-র সত্য সিদ্ধান্তকে সহজভাবে নিতে পারেনি। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি ওঠে তার মধ্যে প্রধানতম হল অশ্লীলতা। তাঁকে কাফেতে বা পথে দেখে লোক জন হাসত, আঙুল তুলে দেখাত। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকরা প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে মাদাম বোভোয়াকে হীন, মিথ্যাচারী প্রমাণ করতে। তাঁর সম্পর্কে বলা হলো, ''একটা দুর্ভাগা পাগলী মেয়ে, অবদমিত, হতাশ, প্রবঞ্চিত, পুরুষালি এমন এক মেয়ে যার ঠিকঠাক প্রেম জোটেনি, হিংসুটে তিক্ত, পুরুষের সঙ্গে তুলনায় শুধুই হীনম্মন্যতায় ভুগছে, আর মেয়েদের প্রতি হাড়ে বিদ্বিষ্ট।'' বইটি নিয়ে প্রতিক্রিয়ার যেমন নেতিবাচক এই দিকটি রয়েছে, তেমনি রয়েছে উজ্জ্বল ইতিবাচক দিকও। এই ''বই নিয়ে গণ বিতর্ক শুরু হয়, বক্তৃতার ঢল নামে।'' এই বইটি মেয়েদের কাজে লাগে 'আত্ম আবিষ্কারে' এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। এরপর মেয়েরা বহুবছর ধরে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লিখেছে, বলেছে এই বই পড়ে তারা উপকৃত। ফরাসী দেশের মনোরোগ চিকিৎসকরা তাঁদের মহিলা রোগীদের এই বই পড়তে দিয়েছেন — শুধু বুদ্ধিজীবী মেয়েদেরই নয়, নিম্নবিত্ত এমনকি কারখানায় কর্মরত মেয়েদেরও। '''আপনার বইটা খুব সাহায্য করেছে আমায়, আমায় বাঁচিয়েছে'— একথা আমি নানা বয়সের জীবনের নানান ক্ষেত্রে কর্মরত মেয়েদের চিঠিতে পড়েছি''— বলেছেন বোভোয়া। বলেছেন— ''এ বইটার মতো আর কোন বই লিখে এত তৃপ্তি পাইনি আমি।'' কিন্তু এই বই দিয়ে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হবে এমন মোহ তাঁর ছিল না, তিনি স্পষ্টতই বলেছেন সেটা নির্ভর করছে ''দুনিয়ার শ্রমের ভবিষ্যতের উপর''... ''উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধু বিপ্লবের মূল্যেই কোন তাৎপর্যময় পরিবর্তন আসতে পারে''।

এই বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩

সালে। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই বই অনুবাদ হয়েছে এবং সমাদৃত হয়েছে। এইচ এম পার্শলি তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, "নারীর ওপর একজন নারীর, জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন একজন নারীর সুচিন্তিত, সর্বব্যাপী এবং অবাধ রচনা"। তিনি আরো বলেছেন, "নারীর ওপর এবং পশ্চিমী সংস্কৃতিতে তার ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক অবস্থানের ওপর একটি গ্রন্থ, যা একই সঙ্গে জীবনবিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ, নারীর একক বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ে বোধ্য এবং খোলামেলা, আগাগোড়া সাহিত্যিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক উদ্ধৃতির দ্বারা প্রাঞ্জল এবং প্রধানত উদার ও সুসমঞ্জস দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত— তা লেখা বাকি ছিল এবং ঠিক সেই কাজটিই করেছেন শ্রীমতী দ্য বোভোয়া"।

'দ্য সেকেন্ড সেক্স' দুটি খণ্ডে রচিত হয়। প্রথম খণ্ডে আছে — সত্য এবং কিংবদন্তী। এখানে সিমন নারীকে জীববিজ্ঞানের দিক থেকে দেখেছেন। আর শারীরিক গঠন ও তার কার্যকারিতার ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর মনঃসমীক্ষণগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন ও তার অপূর্ণতার কথাটি তুলেছেন, বোভোয়া লিখেছেন, "সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে যৌথ মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে উত্তরণ এবং কোনভাবেই নির্দেশ করা হয়নি যে, কী ভাবে এটা ঘটেছিল। এঙ্গেলস্ নিজে *অরিজিন অফ্ দ্য ফ্যামিলি*-তে ঘোষণা করেছেন, 'উপস্থিত এর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না'। তিনি ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি সম্পর্কে শুধু অজ্ঞই নন: তিনি এমনকি কোন ব্যাখ্যারও ইঙ্গিত দেন না।" পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সিমন মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকে নজর দিয়েছেন। যাযাবর যুগ থেকে শুরু করে আদি কৃষিযুগ, পিতৃতান্ত্রিক যুগ, মধ্যযুগ এবং পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লব ও তৎপরবর্তী যুগ (ফ্রান্সের কথা তিনি বেশি বলেছেন) নিয়ে আলোচনা করেছেন। নারী বিষয়ক কিংবদন্তী যে বাস্তবের থেকে বহুযোজন দূরে তা তিনি দেখিয়েছেন এবং মিথকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। কিংবদন্তীর বিকাশ সম্পর্কে অগস্ত ক্যোঁৎ বলেছেন "পরার্থপরতার সঙ্গে নারীকে এক করে দেখাটা হচ্ছে তার আত্মনিবেদনে পুরুষের অধিকারকে নিশ্চিত করা"। সিমন বলছেন, কিংবদন্তী শাসকজাতের সমস্ত সুবিধা সমর্থন করে এবং তার অপব্যবহারকে অনুমোদন করে। "যে বেদনা ও বোঝাগুলি শারীরবৃত্তীয়ভাবে নারীর ভাগ্য, সেগুলি দূর করার ব্যাপারে পুরুষরা নিজেরা মাথা ঘামানোর দরকার মনে করে না, যেহেতু এগুলি প্রকৃতির দ্বারা অভিপ্রেত, পুরুষ এগুলিকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে, নারীর দুর্ভাগ্যকে আরো বেশি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ নারীর যৌনসুখের অধিকার অনুমোদন করতে অস্বীকার ক'রে তাকে ভারবাহী পশুর মতো কাজ করিয়ে।" —বলেছেন বোভোয়া। নারীর শারীরিকভাবে যেমন অসহায়তা আছে তেমনি নারীপুরুষের মিলনের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে— সিমন আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন— যা পড়তে পড়তে আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিই— আমাদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশান্তিও আসে যে এই মার প্রকৃতির, আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু যে বেদনায় কোনভাবেই প্রলেপ পড়ে না তা হলো পুরুষের কাছে, সমাজের কাছে নারী লিঙ্গ, সে মানবসত্তা নয়। বিধায়ক, পুরোহিত, দার্শনিক, লেখক, বিজ্ঞানী—সবাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন মেয়েদের অধস্তন অবস্থানটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং পৃথিবীর পক্ষে সুবিধাজনক। এই চিন্তার সমর্থনে বালজাকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "তার বিড়বিড়ানি, তার কান্না, তার বেদনার দিকে মনোযোগ দিও না; প্রকৃতি তাকে আমাদের ব্যবহারের জন্য ও সবকিছু বহন করার জন্য তৈরি করেছে : শিশু, দুঃখ, পুরুষের দেওয়া আঘাত ও যন্ত্রণা।"

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে নারীর গড়ে ওঠা ও পরিস্থিতি। এখানে বিবাহিতা নারী, মা, নারীর সামাজিক জীবন, বারাঙ্গনা, পরিণত বয়স, নারীর অবস্থা ও চরিত্র, স্বকামী নারী, প্রেমাসক্ত নারী ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থানের বিশ্লেষণ করেছেন উদাহরণ সহযোগে। বোভোয়া দেখিয়েছেন সমাজ তথা পুরুষ নারীকে বিষয় হিসাবে দেখে। তারা যে বিষয়ী, অর্থাৎ নারী যে মানবসত্তা একথা স্বীকার করে না, সিমন লিখছেন, "প্রতিটি স্ত্রীলোক অপরিহার্যভাবে নারী নয়, তা হবার জন্য তাকে রহস্যময় ও বিপন্ন সেই বাস্তবতায় অংশ নিতে হবে যার নাম নারীত্ব।" অর্থাৎ কেউ 'নারী' হয়ে জন্মায় না, জন্মের পর 'নারী' হয়ে ওঠে সমাজের হাতে। তিনি লিখছেন একটি মেয়েকে "শেখানো হয় সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে হবে, সে নিশ্চয়ই নিজেকে বিষয় করে তুলবে; কাজেই তার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করা উচিত, তার সঙ্গে একটা জীবন্ত পুতুলের মত ব্যবহার করা হয়।... যদি তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হত, তা হলে সে একটি ছেলের মতই একই প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস, একই ঔৎসুক্য, একই উদ্যোগ, একই দুঃসাহসিকতা দেখাত। এটা সময়ে সময়ে ঘটেই, যখন মেয়েটিকে একটি ছেলের মত করে লালন করা হয়; এরকম ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।"

নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোভোয়া-র যে ভাবনা, সে বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরিরা হলেন মার্কস, এঙ্গেলস্, বেবেল। বোভোয়া বলেছেন, "দক্ষিণপন্থীরা আমার বইটাকে কেবল ঘৃণাই করতে পারে— আশা করেছিলাম উগ্রবামেরা অন্তত বইটাকে ভালভাবে নেবে। ...আমার তত্ত্ব মার্কসবাদের কাছে এত ঋণী এবং তাকে এতটাই শ্রদ্ধার আলোয় দেখায় যে অন্তত তাদের কাছ থেকে আমি আর একটু নিরপেক্ষতা আশা করেছিলাম।"

''মূলত নারীবাদী চেতনার বিকাশ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের গভীরে, ধনতন্ত্র যে গোটা দুনিয়ার মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে এটা বুঝতে পেরে বহু নারীই শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। কিন্তু সে কাজের জন্য তারা যে সংগঠনে যোগ দেয় সেখানেও দেখে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, নেতারা সর্বদাই পুরুষ এবং তারাই নীতিনির্ধারক। এই পুরুষরা হয়তো অনেকে সত্যিই বিপ্লবী, কিন্তু পুরুষ প্রধান সমাজে শিক্ষিত, বর্ধিত এবং মার্জিত হওয়ার ফলে সংগঠনেও সেই অভিমুখ এনে ফেলে।'' সিমোন এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পুরুষ সহজে এই প্রবণতা ছাড়বে না, যেমন বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ছাড়বে না। ফলে ধনীর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার দায় যেমন গরিবের তেমনি পুরুষের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার দায় মেয়েদের। তার মানে পুরুষকে দমন করা নয়— সমতা প্রতিষ্ঠা করা। মেয়েরা মূলত শ্রেণীসংগ্রামে অংশ নিয়ে বুঝতে পারে যে শ্রেণীসংগ্রাম লিঙ্গ বৈষম্যকে অপসারিত করে না। বোভোয়া বলেছেন, ''মহিলাদের এ সমাজে সত্যিই দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসাবে ধরা হয়, এ সমাজের কাঠামো পুরো ধ্বসে যাবে যদি এই অভিমুখটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।'' ধনতন্ত্র ধ্বংস না হলে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা হবে না, কিন্তু সমাজতন্ত্র অবধারিতভাবে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করে না— সোভিয়েত রাশিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে তাকিয়েই সিমন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের পরেও নারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সাজগোজ করে তাদের স্বামীদের মন ভোলাতে এবং সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি করে পরিবারকে ধরে রাখতে। এই বই লেখার সময় সিমোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সোভিয়েত সরকার তাঁকে অনুমতি দেয়নি।

মাদাম বোভোয়া কখনই নিজেকে নারীবাদী বলেননি, নারীবাদী হওয়ায় তাঁর আপত্তি ছিল, কিন্তু তাঁর কাজ নারীবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছে। শ্রেণীসংগ্রাম যে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাকে অপসারিত করে না— ''এই চেতনাই নারীবাদী আন্দোলনের বড় সাফল্য'', যা পরবর্তীকালে সমাজ ইতিহাস বদল করতে সাহায্য করবে। তিনি নারীবাদী আন্দোলনকে বামপন্থার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন, একজন ''নারীবাদী নিজেকে বামপন্থী বলুক আর না বলুক সে প্রকৃতই বামপন্থী''— কারণ তার দাবি ও লড়াই সাম্যের। বোভোয়া বলেছেন, ''প্রথাগতভাবে যাকে এখন আমরা রাজনৈতিক বামপন্থী বলি, নারী(-বাদী)র অবস্থান তারও বাঁদিকে।'' এর কারণ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রাম পিতৃতন্ত্রকে অপসারিত করতে পারে না। তার পরেও থেকে যায় লিঙ্গ সংগ্রাম।

সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনা করতে গেলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়টি এসে পড়ে। বস্তুত এটিই হলো মূল কথা। নারী-পুরুষের মৌলিক সম্পর্ক যৌন সম্পর্ক এবং তৎসঞ্জাত যে প্রেম অর্থাৎ 'যৌনপ্রেম', এ বিষয়ে পূর্বে কোন ধারণা ছিল না। এঙ্গেলস্ বলেছেন, ''মধ্যযুগের আগে ব্যক্তিগত 'যৌনপ্রেম' বলে কোন জিনিস ছিল না। ...প্রাচীনকালে আধুনিক অর্থে প্রেম যদি হয়ে থাকে তাহলে সরকারি সমাজের গণ্ডীর বাইরেই তা হয়েছে।'' এঙ্গেলস্ এক পতিপত্নী বিবাহের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ''ইতিহাসে একবিবাহ দেখা দিল মোটেই স্ত্রী ও পুরুষের সদ্ভাব সূত্রে নয়, বরং তা দেখা দিচ্ছে নারী-পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের উপর আধিপত্য হিসাবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ যাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি বৈরীর ঘোষণা রূপে।''

এরপর এঙ্গেলস্ লিখছেন, ''১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস ও আমার রচিত অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোক্ত কথাগুলি আছে— 'শ্রমের প্রথম বিভাগ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভাগ।' বর্তমানে আমি এর সঙ্গে আরো যোগ করতে চাই— ইতিহাসে শ্রেণীবিরোধ প্রথম যা দেখা যায় সেটা মিলে যায় এক পতিপত্নী বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিরোধের বিকাশের সঙ্গে এবং প্রথম শ্রেণীপীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে।''

সোপেনহাউয়ার বলেছেন—''যৌন প্রেরণাই হল মানুষের বাঁচার আকাঙ্খার জন্য সবচেয়ে পরিপূর্ণ প্রেরণা। এখানেই মানুষের সমস্ত আকাঙ্খা কেন্দ্রীভূত হয়েছে।'' মেন ল্যান্ডারও একই মত প্রকাশ করে বলেছেন, ''যৌনপ্রেরণা হল মানুষের অস্তিত্বের মাধ্যাকর্ষণ।'' দুটি নরনারীর ভালবাসার ভিত্তিতে এই চরম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে এবং মানবজাতির প্রবাহ অব্যাহত থাকবে এটিই আমাদের কাম্য। কিন্তু তা যে হয়নি আমরা এঙ্গেলস্-এর কথাতেই দেখেছি। মেয়েরা যেহেতু সমগ্র মানবজাতির অর্ধেক তাই এই দমন ব্যাপকভাবে মানবজাতির অসাফল্য সূচিত করেছে এবং সমাজে ''অশুভের জন্ম দিয়েছে এবং নারী পুরুষের যৌনসম্পর্ককে বিষাক্ত করেছে।'' এঙ্গেলস্ এবং বেবেল অল্পকথায় যে বিষয়টির নির্দেশ করেছিলেন তারই উত্তরভাবনা বোভোয়া-র।

পুরুষ এই 'সেকেণ্ড সেক্স'-এর ওপর নির্ভরশীল তার পরম আকাঙ্খা যৌন ক্ষুধা ও সন্তানলাভ এই দুটির জন্য আর তার থেকেই আসে প্রেমের প্রসঙ্গ, যে প্রেমের নামে নারীর উপর সবচেয়ে বেশী শোষণ চালানো হয়; যে প্রেম তার কাছে অধরাই থেকে যায়, আর ধ্বংস হয় তার শরীর মন। 'বিবাহিতা নারী' অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সিমোন লিখেছেন, ''বলা হয় যে, বিবাহ পুরুষকে খাটো করে, যেটা প্রায়ই সত্য; কিন্তু প্রায় সব সময়ই এটা নারীকে ধ্বংস করে দেয়।'' ড. সুধীর কক্কর তাঁর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'ইন্টিমেট রিলেশনস্'-এ দেখিয়েছেন এক নারী চরিত্রকে যে দিল্লীর মেহেরৌলীতে থাকতো এবং স্বামীর

সমস্তরকম নির্যাতন সহ্য করেও তাকে ভালোবাসত। এই নির্যাতনের মধ্যে ছিল দায়িত্ব পালন না করা, কুৎসিত গালাগাল, বেদম প্রহার, অন্য নারীসঙ্গ, তাকে খুন করার চেষ্টা ইত্যাদি। এই মহিলা অগত্যা বহু পরিশ্রমে কিছু উপার্জন করে বাচ্চাদের মানুষ করার চেষ্টা করতো, স্বামী অপকর্ম করে জেলে গেলে সেই টাকা থেকে তার জামিনের ব্যবস্থা করতো। আর স্বামী দেবতাটি জামিনে বাড়ি ফিরে মুখের সামনে গরম দুধের গ্লাস পেয়ে সেটি স্ত্রীর মুখে ছুঁড়ে মারে এমন একটি গালাগাল সমেত যা এই পত্রিকায় ছাপা সম্ভব নয়। ড. কক্করের সঙ্গে যখন এই মহিলার দেখা হয় তখন তার শরীর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। সে বলেছিল, ''নারী-পুরুষের ভালোবাসা এক আশ্চর্য ব্যাপার, নারী যাকে ভালোবাসে সেই পুরুষ তাকে যা দেয় তা আর কেউ পারে না।'' তবে এই সময়ে তার মন ভেঙ্গে এসেছিল। মাদাম বোভোয়াও প্রায় একই কথা বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে— ''মেয়েরা প্রেমে নিজেদের অনেক বেশি দেয়। বোধহয় গভীর সহমর্মিতার ক্ষমতাও তাদের বেশি, প্রেমের যা ভিত্তি।'' এই অপরিসীম ত্যাগ ও জীবনের আনন্দের উৎস বিফলে যায় সমাজের ভ্রান্ত গতির জন্য— পুরুষরাও বঞ্চিত হয়।

প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজে পুরুষের অবস্থানটি এক্ষেত্রে দেখে নেওয়া যায়। পুরুষ সমাজে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় সক্রিয়ভাবে তার ভালবাসা দেখাতে পারে। পুরুষ নারীকে সমর্থন করে, বিয়ে করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেয়, উপহার দেয় বা আর্থিক সহায়তা করে, এমনকি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় (যেটি পুরুষের বেশ পছন্দের), এমনকি মিলনের উদ্যোগও পুরুষই নেয়। বোভোয়া উদাহরণ দিয়েছেন, মাদাম ভিল্ পারিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মঁসিয়ে নর্পোয়া চব্বিশ ঘণ্টার যাত্রা করেছিলেন। আমাদের সমাজে উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে নারীর দেখানোর মতো কিছু নেই, আর ''তার হৃদয়ের গভীরতা কী দিয়ে মাপা হবে?'' অর্থাৎ, লিঙ্গ হিসাবে বিষয়ী হিসাবে তাকে যে জগতে ঠেলে দেওয়া হল সেখানে সেই প্রেমের জগতেও নারী পরাজিত। তার সক্রিয়ভাবে কিছু করার না আছে উপায়, না আছে সামাজিক অনুমোদন। সমাজ নারীকে যেভাবে দমিয়ে রেখেছে তার ফলে সে অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। সমাজে মেয়েদের আইনগত সুবিধা নেই, কোথাও কোথাও কেতাবি সুবিধা আছে কিন্তু বাস্তবে কাজে লাগে না। কর্মক্ষেত্রে সুবিধা নেই, শিক্ষায় নেই, রাজনীতিতেও পুরুষ বেশি সম্মান ও স্থান পায়। নারীকে যে ঘরে ঠেলে দেওয়া হয় সেখানেও তার সম্মান নেই। সে পুরুষের দাসী অথবা সম্ভোগের বস্তু। এই সামাজিক অবস্থানের দরুন মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে—*দ্য সেকেণ্ড সেক্স*-এ সিমোন তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এবং মেয়েদের নিজেদের অবস্থান চিনে নিতে সাহায্য করেছেন।

এই বইটি প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে আলোচনা না করলে আলোচনা অপূর্ণ থাকবে তা হলো জাঁ পল সার্ত্র। *সেকেণ্ড সেক্স* লেখার সময় তিনি সিমোনকে সাহায্য করেছিলেন নানারকম পরামর্শ দিয়ে। বিশেষ করে এই গ্রন্থে শারীরবৃত্তীয় আলোচনা সার্ত্রের অনুরোধে। সার্ত্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতি দার্শনিক হিসাবে। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর অন্য পরিচয় অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বে অনেক বড় বড় দার্শনিকের পরিচয় আমরা পেয়েছি, কিন্তু যে পুরুষটি সিমন দ্য বোভোয়া-র সারা জীবনের সঙ্গী তিনি আমাদের অনেক বেশী শ্রদ্ধেয়, আকর্ষণীয়। বোভোয়া 'দ্য প্রাইম অফ লাইফ'-এ ব্যক্তি সার্ত্রকে উন্মোচন করেন, যেটিকে কার্লো লেভি শতকের মহান প্রেমকাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সিমোন যিনি *সেকেণ্ড সেক্স*-এর রচয়িতা, যিনি মুক্ত দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এবং নারী-পুরুষের প্রকৃত প্রেম যাঁর চেতনায় স্বচ্ছ হয়ে ধরা দিয়েছিল, তাঁর জীবনসঙ্গীকে আমরা বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁকে দেখেই আমাদের একটি গোপন আশার কথা ব্যক্ত করছি যে এই সমাজেও এমন পুরুষের সন্ধান করা একেবারে বৃথা নাও যেতে পারে।

ফিরে আসা যাক নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রসঙ্গে যেখানে অর্থনীতিই হল মূল বিষয় (সামাজিক দিকটি মাথায় রেখেই বলছি) এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থির হয় আর্থিক লেনদেন-এর মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে নারীর কাছে ''বিবাহ অন্য অনেক কিছুর চাইতে অনেক বেশি সুবিধাজনক জীবিকা।'' বোভোয়া আরো বলেছেন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য, ''যার লক্ষ্য হচ্ছে নরনারীর আর্থনীতিক ও যৌন মিলন দিয়ে সমাজের স্বার্থসাধন করা, তাদের ব্যক্তিগত সুখকে নিশ্চিত করা নয়।'' এই বিষয়টি এঙ্গেলস্ পূর্বেই আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''এক পতিপত্নী বিবাহের সূচনা ব্যক্তিগত যৌন ভালবাসা থেকে কোনক্রমেই নয়, এই দুইয়ের মধ্যে কোনই মিল নেই, কারণ আগের মতোই বিবাহ রয়ে গেল শুধু সুবিধার বিয়ে। এটি হচ্ছে পরিবারের প্রথম রূপ যা স্বাভাবিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল— স্বাভাবিকভাবে বিকশিত সাধারণ মালিকানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার জয়লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য, সন্তানসন্ততি কেবলমাত্র তার দ্বারাই হবে এবং ভবিষ্যতে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে...।'' এরপর তিনি আরো বলেছেন— ''এক পতিপত্নী বিবাহ ইতিহাসের একটি বড় অগ্রসর পদক্ষেপ, কিন্তু সেই সঙ্গেই একটা আপেক্ষিক পশ্চাদগতি, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি হয় অপর এক অংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্য দিয়ে। এক পতিপত্নী বিবাহ হচ্ছে সভ্য সমাজের কোষরূপ, এখানে আমরা সেইসব বৈরিতা ও বিরোধের প্রকৃতি লক্ষ্য করতে পারি যেগুলি শেষোক্তের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।''

এক পতিপত্নী বিবাহ প্রথার সঙ্গে সমাজে দুটি নতুন

জিনিসের আবির্ভাব হলো— স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। এটাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ পুরুষের যৌন স্বাধীনতা ছিল আর নারীর তা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল— আর এর পাশাপাশিই স্বাভাবিকভাবে এসেছিল বারাঙ্গনা। "বিবাহ বারাঙ্গনা-বৃত্তির সঙ্গে সরাসরিভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত"— উভয়ের পেছনেই রয়েছে যৌনসেবার পরিবর্তে গ্রাসাচ্ছাদন। "পাদ্রীদের মতানুসারে প্রাসাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পয়ঃপ্রণালী প্রয়োজনীয় আর সেই কাজটি সমাজে করে বারাঙ্গনারা। বোভোয়া লিখছেন— "বারাঙ্গনা পাপের বোঝা বহন করে; পুরুষ তার নীচতা তার ওপরে ঢেলে দেয়, এবং তাকে বাতিল করে।" অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে, তার অবস্থান বিবাহিত নারীর অবস্থানের অনুরূপ। মারো বলেন— "যে মেয়েরা বারবণিতা বৃত্তিতে নিজেদের বিক্রয় করে, আর যারা বিবাহে নিজেদের বিক্রয় করে এদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে দামে আর চুক্তির সময়ের দৈর্ঘ্যের মধ্যে।" উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌনক্রিয়া হচ্ছে একটা সেবা; একজনকে একটি পুরুষ সারা জীবনের জন্য ভাড়া করে; অন্যজনের বিভিন্ন মক্কেল থাকে, যারা ফুরন হিসাবে দাম দেয়। একজন একটি পুরুষের দ্বারা অন্য সকলের বিরুদ্ধে রক্ষিত হয়; অন্যজন রক্ষিত হয় সকলের দ্বারা, প্রত্যেকের একচেটিয়া যদৃচ্ছ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে।"

সমাজের এই মৌলিক কাঠামো যা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে লেনদেন-এর উপর দাঁড় করিয়েছে তার থেকে মেয়েদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বোভোয়া। তিনি শুধু মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার কথাই বলেননি, সেই সঙ্গে বলেছেন, "অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব না যে শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই নারীকে রূপান্তরিত করার পক্ষে যথেষ্ট, যদিও এই বিষয়টি তার বিবর্তনে একটা মৌলিক উপাদান হয়ে থেকেছে ও আছে; কিন্তু যতক্ষণ না এটা নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ফলাফলগুলি সৃষ্টি করে, যার প্রতিশ্রুতি সে দেয় ও যার প্রয়োজন সে বোধ করে, (ততদিন) নতুন নারী আবির্ভূত হতে পারে না।" এইভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা করে মাদাম বোভোয়া শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত টেনেছেন, "যেদিন নারীর পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব হবে, তার দুর্বলতায় নয়, তার শক্তিতে, নিজেকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নয়, নিজেকে দেখার জন্য, নিজেকে হেয় করতে নয়, প্রতিপন্ন করতে— সেইদিন প্রেম হয়ে উঠবে তার কাছে, যেমন পুরুষের কাছে, জীবনের একটা উৎস, এবং মারাত্মক বিপদের নয়। ইতিমধ্যে প্রেম তার মর্মস্পর্শী আকারে সেই অভিশাপকে তুলে ধরে, যা নারীত্বের বিশ্বে বন্দী, ক্ষতবিক্ষত ও নিজের কাছে অসম্পূর্ণ।" এই কাম্য অবস্থানে পৌঁছনো প্রসঙ্গে সিমোন একটি দার্শনিক মন্তব্য করেছেন—"উভয় লিঙ্গতেই দেহ ও আত্মার, সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণের একই নাটক অনুষ্ঠিত হয়; উভয়েই সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে, একের অন্যের জন্য একই অপরিহার্য প্রয়োজন আছে; এবং তারা তাদের স্বাধীনতা থেকে একই গৌরব অর্জন করতে পারে। তাদের যদি এটার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়, তা হলে তারা আর মিথ্যা সুবিধাগুলি নিয়ে বিতর্ক করতে প্রলুব্ধ হবে না, এবং তখন তাদের মধ্যে মৈত্রীর অস্তিত্ব দেখা যাবে।"

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে বসে তিনি আরো দেখেছেন, "বাস্তবিকই, ইতিমধ্যেই নর-নারীর মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে বন্ধুত্বের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার, কুকর্মে সহযোগিতার, সহচরত্বের— সহজ সরল অথবা ইন্দ্রিয়ানুগ— যা অতীত শতাব্দীগুলি উপলব্ধি করতেই পারত না।" এই নতুন সম্পর্ক ও নতুন নারীদের ক্রমবিকাশ আমরা সময়ের সাথে লক্ষ্য করছি সারা বিশ্বজুড়ে। 'আধুনিক' নারী "পুরুষোচিত মূল্যবোধ গ্রহণ করে! সে নিজেই গর্ববোধ করে যে, পুরুষদের মত একই অর্থে সে চিন্তা করে, সক্রিয় ব্যবস্থা নেয়, কাজ করে, সৃষ্টি করে;"— বলেছেন বোভোয়া।

কাম্য অবস্থায় পৌঁছনোর জন্য ক্রম বিকাশের পথে এই বইটি নারীকে শক্তি যোগাবে, দিক নির্দেশ করবে আর পৌঁছনোর পর সমাজ-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল হিসাবে মর্যাদা পাবে।

প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারত ও হিন্দু ধর্ম : 'ভারতীয় নারী'র নির্মাণ

গার্গী

যা ধারণ করে

ধর্ম, অর্থাৎ যা ধারণ করে। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত প্রায় সব ধর্মই মানব-মানবীকে ভিন্নভাবে ধারণ করেছে—এটা সর্বজনবিদিত। ধারণ করেছে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে যেখানে দাঁড়িয়ে নারী ও পুরুষের সামাজিক অসমান অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে, একই সঙ্গে সীমায়িত হয়েছে। ধারণ করে, তাই তা তৎকালীন সমাজের সমাজকাঠামোকেই বহন করে যাওয়ার পক্ষে, সমাজ-প্রগতির পক্ষে নয়। যাই হোক, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে যবে থেকে সমাজে ধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারও আগে থেকে ধর্ম-চিন্তা বা শাস্ত্র-চিন্তা নারীর জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ করেছে। সেই স্থান নারীর ইচ্ছা নিরপেক্ষ। যেখানে নারীর মন বা দৃষ্টিভঙ্গিকোনটাই প্রতিফলিত হয়নি এবং গুরুত্ব পায়নি। কেন পায়নি, এবং কোন্ চোখেই বা ধর্মে নারীর স্থান নির্ণীত হয়েছে, তা এই আলোচনার উপজীব্য।

বিশ্বে প্রায় সর্বব্যাপ্ত ধর্মের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম অগ্রগণ্য। তারপরই উল্লেখ করতে হয় ইসলাম ধর্মের। আমাদের দেশে প্রধান ধর্ম দুটি। সংখ্যাগুরু হিন্দুরা ছাড়াও রয়েছেন সংখ্যালঘু মুসলমানরা, এদেশে সংখ্যালঘু হলেও যারা সারা বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যায় দ্বিতীয়। এছাড়াও খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষও আছেন। প্রতিটা ধর্মেই নারীর স্থান বিষয়ক আলোচনা কৌতূহল উদ্রেক করে। খ্রিস্টধর্ম নারীকে অপবিত্র কামনার প্রেরণা বলে মনে করে। ইসলাম ধর্ম বহুবিবাহের ও তিন তালাকের কারণে সঠিকভাবেই সমালোচিত হলেও এই ধর্মে বিধবাদের জন্য কঠোর বিধিনিষেধ অনুপস্থিত, যা হিন্দু ধর্মে প্রবলভাবে উপস্থিত। তবে এই লেখাটি আবর্তিত হবে হিন্দুধর্ম ও নারী, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ধর্ম একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ যা কোটি কোটি মানুষের চিন্তন-মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তৈরি করেছে এমন এক জীবনদর্শন যেখানে নারী অনেকটাই প্রান্তিক অবস্থানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। "নারী পুরুষের প্রসঙ্গে সংজ্ঞায়িত এবং পৃথকীভূত, নারীর প্রসঙ্গে পুরুষ নয়। নারী আপতিক, আবশ্যিকের বিপরীতে অনাবশ্যক। পুরুষ অহং, পরম, নারী হচ্ছে 'অন্য'।" (*দ্বিতীয় লিঙ্গ* : সিমন দ্য বোভোয়া) পুরুষ বিষয়ী, নারী বিষয়।

মনুষ্যকুল থেকে বিচ্যুত এই 'অন্য' বা 'অপর'-এর স্থান নির্ণয় করতে— কী পরিবারে কী সমাজে তাকে দমিয়ে রাখতে, তার উপর স্বেচ্ছা-অভিভাবকত্ব করতে যুগে যুগে কালে কালে পুরুষকুলের ঘুম ছুটে গেছে। নারীর জন্য যে রায় ঘোষণা হয়েছে শাস্ত্রগ্রন্থের পরতে পরতে তা নারীর 'অপর' সত্তাকেই প্রতিফলিত করেছে। এই 'অন্য' বা অপর-এর জন্য ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থগুলো বহু শব্দ খরচ করেছে। কারণ 'পরম' পুরুষের ভূমিকা বা কাজ তো স্বতঃসিদ্ধ, নারীর জন্য তা আরোপিত। সিমন দ্য বোভোয়া বলছেন— "পুরোহিত, দার্শনিক, লেখক এবং বিজ্ঞানীরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে মেয়েদের অধস্তন অবস্থানটি স্বর্গের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত এবং পৃথিবীর পক্ষে সুবিধাজনক। পুরুষ দ্বারা আবিষ্কৃত ধর্মগুলি এই ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে।"

হিন্দু কারা?

হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনার শুরুতেই প্রশ্ন জাগে, 'হিন্দু' কারা? কোন ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলব? হিন্দুদের কি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ আছে? প্রথমেই বলতে হয়, 'হিন্দু' শব্দটির প্রচলন ঘটে আরবদের দ্বারা। কিন্তু তখনও হিন্দু শব্দটির অর্থ ছিল হিন্দুস্থানবাসী। 'হিন্দু' শব্দটি ধর্মীয় অর্থে প্রথম প্রযুক্ত হয় চতুর্দশ শতকে বিজয়নগরের একটি শিলালেখে (*হিন্দু মৌলবাদ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)। হিন্দু তারাই যারা নানা দেবদেবীতে আস্থা রাখে, যাগযজ্ঞ, উপাসনা মানে, কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে, জাতিভেদে বিশ্বাসী। প্রচলিত ধারণা হলো, বৈদিক কাল থেকে আধুনিক কালপর্বের ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম। তবে ক্রমিক চর্চায় বৈদিক যুগের ধর্ম স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। "সাধারণভাবে পুরাণের ধর্মকেই হিন্দু ধর্ম বলে। এর এখন বয়স হল দেড় হাজার বছরের কিছু বেশি" (*ধর্ম এই সময়ে* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)। হিন্দু ধর্ম কী, এর উত্তরে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন, "এ হল মূলত নঞর্থক; যা মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈনের ধর্ম নয়— তাই হিন্দু ধর্ম।" তিনি আরো বলেন— "এই বৃহৎ শাস্ত্রসম্ভারে এমন কিছু নেই যা দিয়ে সমস্ত হিন্দু জাতির জন্য একটি বোধ ও বিশ্বাসের কাঠামো গড়া যায়। এর একটা কারণ অর্ধেক দেবতাই আঞ্চলিক। ভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা তাদের নামও শোনেনি।"(*হিন্দু মৌলবাদ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ কী? খ্রিস্টানদের বাইবেল বা মুসলিমদের কোরানের মতো কোনো ধর্মগ্রন্থকে এভাবে নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। অনেকে বলবেন, বেদ। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে, "হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ হতে পারে না। কারণ সে ধর্ম বহুকাল বাতিল হয়ে গেছে" (*ধর্ম এই সময়ে* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)।

হিন্দুধর্ম এদেশের প্রাচীনতম ধর্ম কি না সে বিষয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মত হলো— "প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম ছিল দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতের ধর্ম, যার লিখিত সাহিত্য ছিল না

বলে যার বিষয়ে কোন তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছয় নি।''(ঐ) ইন্দো-ইউরোপীয়ান আর্যদের ধর্ম তারা এদেশের বাইরে থাকার সময়েই তৈরি হয়েছিল এবং এদেশে এসে অনার্যদের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের ধর্ম মিশ্রিত হয়েই তৈরি হয়েছিল বৈদিক ধর্ম। বেদের ধর্ম মানে হিন্দু ধর্ম নয়। বেদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বহু অমিল আছে (একদিকে যেমন বেদের যজ্ঞে মন্দির, মূর্তির স্থান ছিল না, তেমনি বেদের দেবতারা এখন বিশেষ পূজা পান না), তবে বেদ এবং হিন্দু ধর্মের যেখানটিতে মিল তা হলো ''বেদ এবং হিন্দুধর্মের মূল শাস্ত্রগুলিতে নৈতিকতার কোন বালাই নেই'' (*ধর্ম এই সময়ে* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)। দেবদেবীর বন্দনার পাশাপাশি শুধু চাওয়া— আধ্যাত্মিক চাহিদা নয়, আরও ধন, আরও শক্তি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণের পাশাপাশি আরও কিছু ধারা, যেমন বৈষ্ণব, শৈব্য, শাক্ত, সৌর ইত্যাদি মিশেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্য থাকলেও এই সম্মিলিত স্রোতকে তাই স্বীকার করা প্রয়োজন।

হিন্দুধর্ম ও জাতিভেদ

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে বেদের সাথে হিন্দুধর্মের সাযুজ্য লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষসূক্ত'-এ বলা হয়েছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। (বেদ-বিরোধী প্রাচীন ধর্ম জৈনধর্মের ধর্মগ্রন্থ 'অঙ্গবিজ্জ'-তে বলা হয়েছে সমাজে আসলে দুটি বর্ণ— বিত্তবান উচ্চবর্ণ এবং বিত্তহীন নিম্নবর্ণ।) এবং নিম্নবর্ণের সৃষ্টিই হয়েছে গতজন্মের কর্মফল হিসেবে। আধিপত্যকামী ব্রাহ্মণ্যবাদ জাতিভেদপ্রথার পাশাপাশি জন্মান্তর ও কর্মফলের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মকে আরও রক্ষণশীল করে তুলেছে। অ-বর্ণ বা পঞ্চম নামে জাতির অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতেই পাওয়া যায়, যারা অস্পৃশ্য ছিল, যারা দাস হিসেবে পরিগণিত হত। তবে শুধু শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়েই জাতিভেদ তৈরি হয়নি। ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জাতিভেদ ছিল সম্পৃক্ত। আজও তাই। হেগেল-এর মতে, ''জাতিভেদ ব্যবস্থাই ভারতের ঐতিহাসিক চেতনা এবং প্রগতির অভাবের মূল কারণ'' (*ধর্ম ও প্রগতি* : জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ধর্মীয় সাহিত্যের আলোকে প্রাচীন ভারত : বৈদিক যুগ

ভারতে আর্যজাতির আগমনকাল ১৫০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই সময়কালকে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য যেমন— বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র, বিভিন্ন স্মৃতি এবং আরও ধর্মগ্রন্থ-র মধ্য দিয়ে আমরা প্রাচীন ভারতে ঐ সময়কার নারীদের অবস্থা, সমাজে তার স্থান সম্পর্কে একটা চিত্র পাই।

শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের অধিকার, তাদের অংশগ্রহণের চিত্র সেই সমাজে তাদের স্থান অনুমানের একটা সূচক। ঋক্‌বৈদিক এবং পরবর্তী বৈদিক যুগ-ইতিহাসের এই বিভাজনের নিরিখে প্রথমেই বলতে হয়— ''ঋগ্বৈদিক সাহিত্যের সমাজ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের বাকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নারীরা কী ধরনের শিক্ষা পেতেন বা তার বিস্তার কতটা ছিল এ বিষয়ে কোন তথ্যই প্রায় আমাদের হাতে নেই'' (*প্রাচীন ভারতে নারী* : রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতা ভট্টাচার্য)।

ঋক-বৈদিক পর্বে কিছু বৈদিক স্তোত্রের রচনাকারী হিসেবে ঘোষা, বিশ্ববারা, অপলা, লোপামুদ্রা প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। পাশাপাশি বলতে হয়, মোট সূক্তের সংখ্যা যেখানে অজস্র সেখানে এই নারীদের লেখা সূক্তের সংখ্যা ১০/১৫-র বেশি নয়। এবং ''ঋষিরা যেখানে গোষ্ঠীর সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করার জন্য সন্তান, পশু লাভ, যুদ্ধজয় প্রভৃতির প্রার্থনা করেন ঋষিকাদের প্রার্থনায় সেখানে আসে নানা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা।'' (*প্রাচীন ভারতে নারী* : রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতা ভট্টাচার্য)। যেমন— ''এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, এ ওষধি, এ আমি খননপূর্বক উদ্ধৃত করছি, এর দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, এ দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।'' ''হে ওষধি। তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে, এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে সপত্নীকে হীনবল করি।'' (উদ্ধৃত: *ধর্ম ও নারী : প্রাচীন ভারত*, কঙ্কর সিংহ) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এই সূক্তের রচয়িতা ঋষিকা ইন্দ্রাণী। ঋষিকার কামনা স্বামীর জীবনে প্রধান নারী হওয়া!

ঋগ্বেদে যোদ্ধা নারীরও উল্লেখ আছে। বিশ্‌পলা, বধ্রিমতী, শশীয়সী তাঁদের বীরত্বের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এর বিপরীতে নেতিবাচক দিকটিও উল্লেখযোগ্য, যেখানে ঋগ্বেদে নারীকে 'নির্লজ্জ' অভিধা দেওয়া হয়েছে। বোঝা যায় সমাজে নারীর স্বাধীন বিচরণ কাম্য ছিল না।

পরবর্তী বৈদিক যুগ— নারীর সামাজিক অবস্থান

পরবর্তী-বৈদিক যুগে নারীর এই কিছুটা মর্যাদা আরও হ্রাস পেতে থাকে। এ সময়কার সাহিত্যে নারী সম্পর্কে নানা নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে নারী, মদ্যপান, পাশাখেলা সমতুল্য (নারী এখানে বিষয়ী নয়, বিষয় মাত্র)। স্ত্রীলোক স্বয়ং আপদ ও অসত্য। এই যুগেই নারীরা উপনয়নের অধিকার, ধর্মীয় কাজে সরাসরি যোগদানের অধিকার হারান। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথার প্রচলনও এ সময়ে দেখা যায়। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে বলা হয়েছিল, 'শ্বশুরকুলের সবার সম্রাজ্ঞী' হওয়ার কথা। আর, ব্রাহ্মণ ও সংহিতায় কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক বলা হয়েছে। এ সময়ে কৃতী নারীদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যানটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য যখন

গার্গীর সঙ্গে দার্শনিক বিতর্কে পেরে উঠছিলেন না তখন যাজ্ঞবল্ক্য তিরস্কার করে বলেন— 'আর প্রশ্ন কোরো না, তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে।' এভাবেই প্রতিবাদিনীর কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, তথা পুরুষ।

এই সমাজের মধ্যেই বর্ণ ও শ্রেণীগত বৈষম্য তীব্রতর হচ্ছিল। একদিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য বাড়ছিল, বৈশ্যের মর্যাদা কমছিল, এবং শূদ্রকে মনে করা হত অপবিত্র। সংস্কৃত নাটকগুলোতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের পুরুষ চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। নিম্নবর্ণের নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন।

সমাজের এই পটপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণেই মেয়েদের বৈদিক বিদ্যাচর্চায় অধিকার হারাতে দেখা যায়। নারীর ভূমিকা শুধু গৃহকর্মেই আবদ্ধ হতে থাকে। ব্যতিক্রম গণিকারা। "বাইরের জীবন বলতে যা কিছু সে একসময় ভোগ করেছে, ভারতীয় মাটিতে আর্যেরা বসতি করার পর আনুমানিক দুই শতক অবধি সেই স্বাধীনতাটুকু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সব অধিকারের সঙ্গেই সে হারিয়েছে। তার মনের উপর কোন অধিকার নেই, এমনকি নিজের শরীরের উপরেও না।" (*প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)

পারিবারিক বিষয়ে যার কথা বেদবাক্য বলে মনে করা হত সেই মনুর মতে— "নারীর পক্ষে বিবাহ হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যায়ন এবং পতিগৃহে বাস গুরুগৃহে বাস।" (*ধর্ম এই সময়ে* : সুকুমার ভট্টাচার্য) মন্ত্রোচ্চারণে শূদ্রের মতো নারীরও অধিকার ছিল না। বর্ণভিত্তিক সমাজ অন্ত্যজ শ্রেণীকে কোণঠাসা করবে এটা যেমন স্বাভাবিক, পুরুষ-প্রধান সমাজ নারীকে অবদমনের জন্য নানা নিদান দেবে এটাও স্বাভাবিক। নিম্নবর্ণের নারীরা বাইরের কাজে যুক্ত থাকার কারণে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করলেও এটাই সত্য যে নারীর অসম্মান বা তাকে অবদমনের প্রশ্নে সব বর্ণের পুরুষ কমবেশি একই ধরনের অবস্থান নিয়েছেন— তা সে প্রাচীন ভারত হোক বা আধুনিক ভারত। হুমায়ুন আজাদের ভাষায় বলতে হয়— "পুরুষের যৌন চেতনায় মহাজাগতিক ভীতির মত বিরাজ করে নারী। তাই নারীর কোন স্বাধীনতা স্বীকার করে নি পুরুষ।" (*নারী* : হুমায়ুন আজাদ)

দেবী বনাম দাসী :

The ancient Indian attitude to women was in fact ambivalent. She was at once a goddess and a slave, a saint and a strumpet.—এই বক্তব্য অধ্যাপক এ এল ব্যাশমের। মনু সহ অনেক ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতাই নারীর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। মনুর বিধান অনুযায়ী, সংসারে নারী সম্মান না পেলে বা দুঃখে থাকলে সেই সংসার উচ্ছন্নে যায়। ভারতীয় জনমানসে এ বিশ্বাস প্রোথিত যে, ভারতবর্ষ নারীকে দেবীর আসনে রেখেছিল, মধ্যযুগে বিজাতীয় মুসলমানদের আগমনের সময় থেকেই এদেশে প্রথম নারী সম্পর্কে নানা নেতিবাচক রীতিনীতির সূত্রপাত। তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বৈদিক যুগেও নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতেন না, আর মৌর্যযুগের শুরুতেই সমাজে নারীর অবস্থান আরও নিচে চলে যায়।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে— প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান উপমানবীর, তাকে শুধু ভোগের সামগ্রী রূপে দেখা হত। তার দেহ, তার শ্রম তার প্রভুর ভোগের জন্য। তাই তাকে বন্ধক রাখা যেত, কেনা যেত, বিক্রি করা যেত। যজ্ঞের দক্ষিণা হিসেবে, যৌতুক হিসেবে বা অতিথির উপহার হিসেবে দানও করা যেত। (ঐ) মনুর বিধানে বলা হয়েছে, নারী শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। অর্থাৎ আজীবন নারীর পরাধীনত্বের সোচ্চার ঘোষণা! কাজেই তত্ত্বকথায় নারীর জন্য দেবীর আসন নির্দিষ্ট হতে পারে, বাস্তব সমাজ এবং বাস্তব সমাজের বিধান তার থেকে বহু দূরেই অবস্থান করত।

বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা

প্রাক্-ইতিহাস বাদ দিলে হরপ্পার নগরকেন্দ্রিক সমাজ থেকে বৈদিক যুগের সমাজ প্রাচীন ভারতের সমস্ত ইতিহাসটাই ছিল পিতৃতান্ত্রিক। এবং এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের একবিবাহই ছিল দস্তুর। ঋগ্বেদীয় সমাজে মেয়েদের ১৭-১৮ বছর বয়সে বিয়ে হত। যাজ্ঞবল্ক্য বয়ঃসন্ধির আগে মেয়েদের বিয়ে দেবার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু মনুর মতে উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া পর্যন্ত কন্যার বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। "তবে ঋগ্বেদের সময় থেকেই বিবাহকে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে দেখা হত" (*প্রাচীন ভারতে নারী* : রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রীতা ভট্টাচার্য)।

আর্য সমাজে যখন পশুপালন থেকে কৃষিনির্ভর জীবন যাপন বিস্তার লাভ করল তখনও ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যে নানারূপ বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্ম' বিবাহে সবস্ত্রা সালংকারা কন্যাকে পিতা উপযুক্ত পাত্রে দান করতেন।' 'অসুর' বিবাহে কন্যার পিতাকে অর্থদানে তুষ্ট করে বর কন্যাকে বিবাহ করতে পারত। 'রাক্ষস' বিবাহে আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে রোরুদ্যমান কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করত বর ও তার বন্ধুরা। 'পৈশাচ' বিবাহে ঘুমন্ত অথবা মদমত্ত কন্যাপক্ষীয়দের মধ্য থেকে ঘুমন্ত কন্যাকে ধর্ষণ করে দিয়ে যেত বর।' শুধু দান নয়, ধর্ষণ, হরণও যে বিয়ের পদ্ধতি হতে পারে তার প্রমাণ দিচ্ছে বিবাহ পদ্ধতির এই রকমফের। এর তুলনায় বোধ হয় ভালো ছিল 'প্রজাপত্য' বিবাহ, যেখানে কন্যার পিতা বর ও কন্যাকে 'উভয় একত্রে ধর্মাচরণ কর'— এই বলে আশীর্বাদ করে কন্যাদান করতেন। তুলনায় সমতার ভিত্তিতে ছিল 'গান্ধর্ব্য' বিবাহ। (*দাম্পত্যের স্বরূপ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)।

বিয়ে সংক্রান্ত সামাজিক বিধিনিষেধ সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাদের ক্ষেত্রে যতটা কার্যকর ছিল, নীচুতলায় মহিলাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ততটা ছিল না। অবশ্য বাল্যবিবাহ

প্রথা যখন সমাজে জোরদার হচ্ছে সেই সময় বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীন নির্বাচন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। তাই গান্ধর্ব বিবাহ একসময় সমাজে প্রাসঙ্গিকতা হারায়। বিবাহের অনুষঙ্গে কন্যাপণ ও বরপণের প্রচলন ছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর *দাম্পত্যের স্বরূপ*-এ উল্লেখ করেছেন যে, ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, পরবর্তীকালে কাত্যায়ন গৃহসূত্রে এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে কন্যাপণের উল্লেখ আছে। কিছু কিছু পুরাণে কন্যাপণ ধিকৃত হয়েছে। কন্যাপণ গ্রহণকারী পিতাকে 'কন্যাবিক্রয়ী' বলা হয়েছে। কিন্তু বিপরীত অভিধাটি অর্থাৎ 'পুত্রবিক্রয়ী' কখনও বলা হয়নি। এর একমাত্র কারণ পুরুষতন্ত্র। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঢক্কানিনাদে 'পণ'-এর অন্তর্নিহিত অপমান চাপা পড়ে গেছে। ''কারণ পুরুষ মাত্রই স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত; নারী উপমানব'' (সুকুমারী ভট্টাচার্য)।

পণ ছাড়াও বিয়ের সময় নারীকে তার পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং পরে স্বামীর পরিবার উপহার দিত। ''পারিবারিকভাবে বিবাহের সময় অগ্নির সামনে তাকে যা দেওয়া হত (অধ্যাগ্নি) এবং স্বামীর গৃহে যাওয়ার সময়ে পথে তাকে যা দেওয়া হত (অধ্যাহবণিক), যা স্নেহবশত অপরে তাকে দিত বা তার ভাই বা মাতা-পিতা তাকে যা দিত— এই দুটি হল স্ত্রীধর্ম, নারীর ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি'' (*প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)। এই স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়ার বা দান করার অধিকার কারো নেই। ''তবে দুষ্টা বা অপব্যয়ী পত্নী স্ত্রীধনের উপর অধিকার হারাতে পারে'' (*ঐ*)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, স্বামী ও তার পরিবার যে কোন অছিলায় নারীকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারত।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'প্রজনার্থং মহাভাগা'। অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দেয় বলেই মেয়েরা সৌভাগ্যের অধিকারী। বাস্তবে অবশ্য এটা সবসময় সৌভাগ্যের কারণ নয়। যদি কোন নারী কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়, মৃত সন্তানের জন্ম দেয় বা কোন সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হয় তবে শাস্ত্রের বিধান তার দুর্ভাগ্যের সূচক হয়েই থাকবে। কারণ উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই নারীকে ত্যাগ করার অধিকার যাজ্ঞবল্ক্য দিয়ে গেছেন। যদিও স্ত্রীকে ত্যাগ করলে স্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে— এই বিধান থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের হাতকেই শক্ত করেছে। কারণ মৃত সন্তানের জন্ম দেওয়া বা কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া স্ত্রীকে বারো বছর বাদে ত্যাগ করার শাস্ত্রীয় বিধান আসলে মানুষ হিসেবে নারীর অমর্যাদাকেই চিহ্নিত করছে।

নারীর উপর অবমাননাকর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— নারীর নিজের দেহের উপর তার নিজের অধিকারকে অস্বীকার করা। স্বামীর দেহ সম্ভোগের আখাঙ্ক্ষাতে কোন স্ত্রী যদি অসম্মত হন তবে সেই স্ত্রীকে প্রথমে মধুর বচনে বা জিনিসের লোভ দেখিয়ে সম্মত করা এবং না হলে তাকে লাঠি বা হাত দিয়ে মেরে স্ববশে আনা— এটি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পরামর্শ! ''প্রাচীন সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বচন : ধন বা নিজ দেহের ওপরে নারীর কোনও অধিকার নেই।'' (*দাম্পত্যের স্বরূপ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)

আজকের একবিংশ শতক পার করে কজন নারী সোচ্চারে বলতে পারেন, আমার শরীর আমার অধিকার? অধিকাংশই পারেন না। এই ক্ষেত্রে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে অথবা প্রান্তিক যে কোন অবস্থানে থাকা নারীদের অবস্থা একই। দাম্পত্য শারীরিক সম্পর্কে নারীর সম্মতির যে প্রয়োজন আছে তা ভাবার মতো শিক্ষা আজও নেই সেদিনও ছিল না। দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় বহু বিয়েই তাই অচিরে ভেঙে যায়। বাইরে না হলেও ভেতরে ভেতরে। বলা হয়, অর্থনৈতিক পর-নির্ভরতা নারীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও অনেক নারী-ই কি এই অন্যায় শোষণের শিকার হন না? নারীর নিজস্ব সত্তাকে আসলে কোনকালেই মর্যাদা দেওয়া হয়নি— আর বিবাহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর এই স্বাধীন অস্তিত্বকেই পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে যে নারী স্বনির্ভর সে হয়ত এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে— উনবিংশ শতকের নারী শিক্ষার প্রচলন কিছু ক্ষেত্রে সেটুকু পরিসর হয়তো তৈরি করেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল অসম্ভব। তাই বলতে হয়, ''পরাধীনতার অন্তরাল থেকে বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রশক্তি— প্রাচীনকালে শাস্ত্রের মাধ্যমে, পরে আইনের দ্বারা।'' (*দাম্পত্যের স্বরূপ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য)

বিবাহ : এক বন্ধন

''বিগত তিন হাজার বছরের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দাম্পত্য সম্পর্ককে বিশেষিত করেছে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে যাতে এ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী ব্যাপারে একটা রাজা প্রজা মনোভাব উভয়েই মেনে নিয়েছে।'' (*ঐ*)

পুরুষ যে শ্রেষ্ঠ এ বিশ্বাস প্রত্যয় শুধু পুরুষের নয়, নারীরও, যা উত্তরাধিকার সূত্রেই তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। নারী যে পুরুষের তুলনায় হীন তা দৃঢ়ভবে ব্যক্ত করেছেন মনু : ''সর্বগুণহীন পুরুষও সর্বগুণযুক্তা নারীর পূজ্য।'' (ঐ) পৃথিবীব্যাপীই পুরুষের উৎকর্ষের উচ্চকিত ঘোষণা, নারীর যোগ্যতা বিচারের মানদণ্ড কোথায়! বিবাহের অনুষ্ঠানে মন্ত্রে নারীর হীন অবস্থার প্রতিফলন। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাই মন্তব্য করেছেন— ''দুটি অসম মানুষের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ছেলে তার মাকে বলে— 'মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি'।'' (ঐ) এ বিশ্বাস কন্যাপক্ষেরও। এই বিশ্বাস শুধুমাত্র স্বামীর লিঙ্গগত বৈশিষ্টকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রভুত্বের অধিকার হিসাবে স্বীকার করে স্বামীর অহমিকাকে পুষ্ট করেছে।'' (*দ্বিতীয় লিঙ্গ* : সিমন দ্য বোভোয়া)

নারীর খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়ে পুরুষ তাকে বিশেষভাবে বহন করে— বিবাহ তাই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? এখনও এ সমাজের অধিকাংশ বিবাহের অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যুগে যুগে নারীর হীন অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে যাতে নারী পুরুষের প্রতি, তথা কর্তৃত্বের প্রতি, চিরকাল অনুগত থাকে। তাই বিবাহের অর্থ ও অনুষঙ্গ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এক নয়, "বিবাহের জৈব, আবেগগত, মানসিক প্রয়োজন নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে মূলত একই, কিন্তু এই প্রয়োজনগত সাম্য পারস্পরিক সম্পর্কে কোন সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।" (*দ্বিতীয় লিঙ্গ* : সিমন দ্য বোভোয়া)

"পুরুষ বিবাহকে গৃহ এবং গৃহিণী পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু এখন পুরুষের পক্ষে এই দুইয়ের দায়িত্ব এতটা দৃঢ় নয় যে, তার থেকে সে সরে যেতে পারে না। বস্তুত সরে যাওয়ার বহু পথ তার সামনে ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই খোলা।" (*দাম্পত্যের স্বরূপ* : সুকুমারী ভট্টাচার্য) "সে (পুরুষ) গৃহ ও গৃহিণী চায় কিন্তু এই দুই থেকে পলায়নের স্বাধীনতাও তার চাই।" (*দ্বিতীয় লিঙ্গ*, সিমন দ্য বোভোয়া)

পুরুষের এই পলায়নী মনোবৃত্তি এবং যৌথতার যাবতীয় শর্ত লঙ্ঘন করে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেও নারীরা বন্ধনে সংযুক্ত থাকতে চায়। অনেক অপ্রাপ্তি, অস্বীকৃতির যন্ত্রণা সত্ত্বেও পুরুষকে মেনে নিয়ে চলতে চায়। কেন চায়? কীভাবেই বা নারী এমন অপার সহনশীলতা আত্মস্থ করল? কারণটা সেই পুরুষতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত। এক তো নারীর স্বাধীন সত্তা, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বাধা তৈরি করেছে সমাজ। আর, পুরুষতন্ত্র নারীকে সর্বংসহা-স্নেহশীলা কন্যা, জায়া, জননী রূপে নির্মাণ করেছে। যুগ যুগ ধরে এই ছাঁচেই নারী নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। তাই প্রশ্নহীন আনুগত্যেই নারী বাঁধা পড়ে আছে। দাম্পত্যে নারীর সমানাধিকার যে যৌথতার প্রধান শর্ত তা পুরুষ কখনও ভাবেনি। আর নারীর ভাবনার জগৎ তো পুরুষতন্ত্রেরই অনুরূপ। তাই বলা হয়, প্রকৃতিই তাকে পরাধীন করে নির্মাণ করেছে, একারণে বিবাহ তার একমাত্র গন্তব্য। বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে মহিমান্বিত করার শাস্ত্রগ্রন্থের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিবাহ নারীর জন্য 'কারাগার' তৈরি করেছে কিনা তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ থেকেই যায়।

নীরবতা : নারীর অলঙ্কার

"নারীর কোন স্বাধীনতা স্বীকার করে নি পুরুষ", বলেছেন হুমায়ুন আজাদ। আর নারীর স্বেচ্ছা অভিভাবক পুরুষ নারীর স্বাধীন সত্তাকে শৃঙ্খলিত করেছে। জন্মাবধি যে নারী কোন না কোন পুরুষের অধীন সে স্বাধীন স্বতন্ত্র বাক্য উচ্চারণ করবেই বা কীভাবে? প্রাচীন ভারতে ঋক-বৈদিক যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট নারী এবং পরবর্তী বৈদিক যুগেও কয়েকজন নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। পুরুষপ্রধান সমাজে তারা আপন সত্তার বিকাশে সচেষ্ট ছিলেন তবু কোথাও যেন তা সীমায়িতও ছিল। ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্-এর কথা পাই যিনি বেদান্ত দর্শনে সোহম্ তত্ত্ব উচ্চারণ করেন, তবু পুরুষের সামনে তিনি নীরবই ছিলেন। সভা-সমিতিতেও মেয়েদের অংশগ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— "সোমযাগের অগ্নিপত্নীবৎ অনুষ্ঠানে একটি লাঠি দিয়ে ঘি-তে আঘাত করা হত... যাতে আপন শরীরে কিংবা উত্তরাধিকারের উপর পত্নীদের কোন অধিকার না থাকে।" বোঝাই যাচ্ছে পত্নীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা ছিল অনুমোদিত এবং তাতে পত্নীও স্বাভাবিকভাবে নীরবতাই পালন করত। গার্গীর কথা জেনেছি— কীভাবে তাকে চুপ করানো হয়েছিল যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে অতিক্রম করার স্পর্ধা দেখানোর জন্য। এক নারীর কথা জানা যায় বৌধায়ন ধর্মসূত্রে যিনি প্রচুর কথা বলতেন, কারণ তার উপর গন্ধর্ব ভর করেছিলেন। ঐ নারীর নিজস্ব স্বাধীন কথা নয়, আসলে তার মুখ থেকে পুরুষই কথা বলতেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, শিক্ষিত নারী আসলে পুরুষ কণ্ঠেরই প্রতিনিধি। শাস্ত্র সেই নারীর প্রশংসা করেছেন— "যিনি কখনও কথার উত্তর করেন না।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ সংসারে সমাজে সর্বত্র নারী নীরব থাকবে নির্বিবাদে সংসারের সেবা করে যাবে এবং সামাজিক অনুশাসন সহ্য করে যাবে। এর অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা। তাই পুরুষের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস মেয়েদের হয়নি। উচ্চবর্গের এই বিধিনিষেধ হয়ত নিম্নবর্গের ক্ষেত্রে সবসময় প্রযোজ্য নয়, তবু সার্বিকভাবে মেয়েদের নীরবতাই সমাজে মান্যতা পেয়েছে।

সতী নারী : অসতী নারী

সীতা সাবিত্রীর মত সতী হওয়ার উপদেশ এই সেদিন পর্যন্ত সমাজে বেশ দৃঢ়ভাবেই চালু ছিল। আজ সময় কিছুটা পরিবর্তিত হলেও গোঁড়া পরিবারগুলিতে এর চল যে খুব বেশি বদলায়নি তা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিবাহস্থলে মেয়েকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে ব্রাহ্মণরা মেয়েটিকে ধনবতী, পুত্রবতী এবং সতী নারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। ধর্মের নানা অনুশাসন, রীতিনীতি একশ ভাগ মেনে চললে তবে নারী সতী হয়, আর সামান্য স্খলন হলেই সেই নারীই 'অসতী' হয়। মেয়েরা শুধু 'নারী' হয়ে ওঠে না, তার লিঙ্গের আগে বিশেষণটাও সে বহন করে চলে আশৈশব। তাই নারীকে 'সতী' হয়ে উঠতে হয়, নতুবা 'অসতী' হওয়ার বদনাম তাকে বয়ে চলতে হয়। সামাজিক উৎপাদন থেকে নিক্ষিপ্ত নারী যখন গৃহ-শ্রমে বাধা পড়ল তখন থেকেই এক-পুরুষের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সন্তানের প্রতিপালনের দায়

নেওয়াটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ল। আগেই দেখিয়েছি, হিন্দু ঋষিকাদের যেসব সূক্ত ঋক বেদে লিপিবদ্ধ আছে সেখানে নারীরা নানাভাবে সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া এবং পতির প্রণয় লাভ করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। যেমন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ঋষিকা ইন্দ্রাণী এক জায়গায় বলছেন—'হে ওষধি... তোমার তেজ, অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূরে করে দাও, যাতে আমার স্বামী, আমারই বশীভূত থাকেন...!' ঋষিকাদের এই ধরনের উক্তিগুলোর মধ্যে সকাতর আর্তি আছে। কিন্তু সমাজটা তো চিরকালই পুরুষতান্ত্রিক, তাই নারীর আর্তি শোনার দায় কোনোদিনই পুরুষের ছিল না। অথচ স্বামী পুরুষটির প্রতি একনিষ্ঠতায় সামান্য ঘাটতি হলেই সেই নারীকে 'অসতী' বানাতে পুরুষের কখনও দ্বিধা হয়নি। তাই নারীকে 'সতী' বা 'অসতী' বানিয়েছে পুরুষই। পুরুষের জন্য এমন কোন শব্দ তৈরি হয়নি। বস্তুত, 'সতী'র কোন পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই। (সুকুমারী ভট্টাচার্য)

নারীর সতীত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা ছিল সহমরণ প্রথায়। এর মূল প্রোথিত ছিল সম্ভবত প্রাগার্য যুগে। কারণ আর্য সাহিত্যের সমগোত্রীয় অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় সাহিত্যে এই ধরনের প্রথার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। (*প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ :* সুকুমারী ভট্টাচার্য)। মহাভারতে মাদ্রীর *স্বেচ্ছামৃত্যুকে* 'সহমরণ' বলে গণ্য করা হয় না। সপ্তম শতাব্দীতে 'হর্ষচরিত'-এর রচনা পর্বেও 'সহমরণ' দুর্লভ। মধ্যযুগের সূচনায় এই প্রথা বিস্তার লাভ করে। 'রাজতরঙ্গিনী'-তে এর উল্লেখ আছে। বিশেষত মধ্যযুগে রাজপুত নারীদের সম্মান রক্ষার্থে জহরব্রতের প্রথা— নারীর সতীত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল মহিমা হিসাবে চিহ্নিত হত। তবে প্রাচীন ভারতে স্মৃতি ও পুরাণের যুগ থেকে 'সহমরণ' নারীর জন্য মর্যাদাকর হিসেবে দেখা হতে থাকে। তবে স্মৃতিকারদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি এই প্রথায় বিশ্বাসী নয়। যাজ্ঞবল্ক্য-এর মত বিষ্ণুধর্মসূত্রের লেখক কঠোর বৈধব্য জীবনের নিদান দিয়েছেন। সর্বোপরি বিধবার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার আত্মীয়রা নিতে বাধ্য— একথাও বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। পরাশর ধর্মসূত্র অনুযায়ী মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা নারী স্বর্গে চিরকাল স্বামীসঙ্গ লাভ করেন। হারীত সংহিতায় বলা হয়েছে— 'যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকূল, স্বামীকূল উভয়কেই পবিত্র করে।' (*ঐ*)। অবশ্য স্বর্গে স্ত্রীর সঙ্গলাভের আশায় বা বংশের পবিত্রতা রক্ষার দায়ে কোন স্বামী মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে সহমৃত হয়েছেন— এমন তথ্য ভারতীয় কোন সাহিত্যেই পাওয়া যায় না। মানুষের জীবনচর্যায় 'পবিত্র' এবং 'ভাল' হওয়াটা আপেক্ষিক। তবু যে নারী সারাজীবন 'পবিত্র' ও 'ভাল' থেকেছে সে মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে অস্বীকার করলেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবেত্তাদের চোখে সে 'অসতী', 'অসাধ্বী' নারীতে পরিণত হয়। নারীকে কেন্দ্র করে 'সতী' বা 'অসতী'র নির্যাস পুরুষতন্ত্রের হাতে, ধর্ম তাতে সহযোগীর হাত বাড়িয়েছে। এভাবেই সতীপ্রথা মহিমান্বিত হয়েছে। শুধু পুরুষের চেতনায় নয়, অনেক নারীও তাকে বহন করেছে। সমাজ সহমরণকে অনুমোদন দিয়েছে দুটো কারণে— বিধবা নারীর দায়ভার অস্বীকার করা, হয়ত পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বিধবাকে বঞ্চিত করা। একবিংশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রূপ কানোয়ার যখন 'সতী' হন তখনও হিন্দু সমাজের একাংশ উল্লাস করেছে। এই পুরুষদের নারীমেধ যজ্ঞে যত উল্লাস যত আক্রম, তত আর কিছুতে নয়। আর সুদীর্ঘ কাল ধরে এই উল্লাসের ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে গেছে নারীর বাঁচার আর্তি।

গণিকাবৃত্তি : প্রাচীন ভারতে

মূল্যের বিনিময়ে নারীর দেহদানের শুরুর ইতিহাস সঠিকভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও এটা বলা যায় যে সমাজে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থার বাইরে অবস্থানকারী নারী মূল্যের বিনিময়ে পুরুষের সম্ভোগে ব্যবহৃত হতে থাকে যে সময় সেটাই গণিকাবৃত্তির শুরুর ইতিহাস। ''কাজেই গণিকাবৃত্তি বিবাহবন্ধনের বাইরে একটি নিয়ামক লক্ষণ এবং 'মূল্যগ্রহণ'— এ দুটির দ্বারা চিহ্নিত।'' (*প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, সুকুমারী ভট্টাচার্য)

গণিকাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র অনুযায়ী সবার উপরে স্থান গণিকার। সে শিক্ষায় রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ। তারপরে স্থান রূপোজীবী এবং সবচেয়ে নীচে স্থান বেশ্যার। গণিকার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করত রাষ্ট্র, সে যখন আয় করত তখন রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বার্ধক্যে গণিকাদের রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পাওয়ার উল্লেখ আছে। এছাড়াও রক্ষিতা, নটী, সৈরিন্ধ্রী, ভুজিকা, কুম্ভদাসী প্রভৃতি নানা নামের বৃত্তিধারিণীর কথা জানা যায় যারা কায়িকশ্রমের মধ্য দিয়েই ধর্মীয় প্রাসাদে থাকত এবং গৃহস্বামীর ভোগ্যা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গণিকাকে প্রকাশ্যে অপমান করার দণ্ড চব্বিশ পণ এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করার দণ্ড পঞ্চাশ পণ ধার্য করা হয়েছে। অন্যদিকে গণিকাদের প্রতি অমর্যাদাকর উক্তিও আছে। যেমন মনু বলেছেন— ''সব গণিকাই চোর ও প্রতারণাপরায়ণ''; ধর্মসূত্রকার গৌতমের মতে— ''বেশ্যাকে হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ-ই নয়।'' (*ঐ*)। বাৎসায়নের নিদান অনুসারে রাজার নির্দেশ ছাড়া যেমন কোন প্রার্থীকে গণিকার উপর আরোপ করা চলবে না, তেমনি রাজা যদি কোন প্রার্থীকে গণিকাগমনে পাঠায় এবং প্রার্থীকে বিমুখ হতে হয় তবে গণিকাকে পাঁচশো পণ দণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি তাকে এক হাজার বেত্রাঘাতও সহ্য করতে হবে। অর্থশাস্ত্র তো এমন নিদানও দিয়েছে যে কোন একজন পুরুষের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে অনুরক্ত থাকা কোন গণিকার পক্ষে অনুচিত কাজ। গণিকারা আয়ের পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিতেন— যার উল্লেখ পাই দ্বাদশ শতকের গ্রন্থ 'মৃন্ময় সুন্দরী কথা'-তে।

অর্থশাস্ত্র এবং *কামসূত্র* অনুযায়ী গণিকাপ্রথা সমাজের তথা নাগরিক জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। আজকে যখন বেশ্যাবৃত্তিকে আইনিকরণের দাবি উঠছে তখন এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, এটি নাগরিক সমাজের পক্ষে এক অপরিহার্য, কারণ যারা ভিন রাজ্যে পরিবার ছেড়ে থাকতে যান তাদের যৌনতৃপ্তি দিয়ে গণিকারা নাগরিক পরিষেবাই দিচ্ছেন। (যদিও প্রোষিতভর্তৃকা নারীর যৌনতৃপ্তি সম্পর্কে কোনো কথা এরা বলেন না) অন্য কুযুক্তিটি আরও মারাত্মক— গণিকারা আছে বলেই নাকি সমাজের অগণিত মেয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে না! তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গণিকা প্রথা এবং সমাজে তার টিকে থাকার নায্যতা প্রদানের ইতিহাসটা সেই প্রাচীনকাল থেকেই এখনও পর্যন্ত একরকমই আছে।

ধর্মের নামে নারীর অমর্যাদা এবং শোষণের আর একটি ক্ষেত্র হলো দেবদাসী প্রথা। সমৃদ্ধশালী প্রায় প্রতিটি মন্দিরে দেবদাসী প্রথার নামে বকলমে গণিকাবৃত্তিই চলত— যাদের মন্দির-গণিকা বলা যেতে পারে। মন্দির-পুরোহিত রাষ্ট্র থেকে যে বৃত্তি পেতেন তা দিয়ে দেবদাসীদের ভরণপোষণ চলত। 'দামোদর গুপ্তের কুট্টনী' মতে দেবদাসীরাও বৃত্তি পেতেন। তবে এদের মূল কাজ ছিল পুজো-আরতির সময় তারা মন্দিরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৃত্য করতেন এবং পাশাপাশি পুরোহিতকুলের কামনাও তাদের চরিতার্থ করতে হতো। আলবেরুনীর মতে, বিভিন্ন দেশের মত এদেশেও রাজারা দেবদাসী প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন কারণ তাতে মন্দিরগুলো থেকে মোটা রাজস্ব পাওয়া যেত। ১৯২৯ এবং ১৯৪৭ সালে আইন করে এই প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, তবু সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়েছে এমন দাবি করা যায় না। সম্ভবত নব্বই-এর দশকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে অসংখ্য তরুণী ভিড় জমিয়েছিলেন। স্ব-অমর্যাদার জন্য এমন কাড়াকাড়ি কেন— তা পাঠকই বিবেচনা করবেন!

মন্দির-গণিকাদের সাথে সাধারণ গণিকার মূল তফাৎ এই যে মন্দির-গণিকাদের সুন্দর নৃত্যপটীয়সী হলেই চলত কিন্তু সাধারণ গণিকাদের এই দুটি গুণ ছাড়াও তাদের গণিত চর্চা সহ নানা শিল্প, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, কাব্যনাটক রচনা, নানা বিষয়ে আলোচনার দক্ষতা অর্জন করতে হত। আর এসমস্ত গুণ থেকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করত কুলনারীরা। কারণ শিক্ষায় তো তাদের অধিকার ছিল না— নিষ্ঠাভরে পতিসেবা করলেই তাদের 'বেদাধ্যয়ন' হয়ে যেত (*মনুসংহিতা*)। তার উপর সন্তান ও শ্বশুরবাড়ি প্রতিপালনেই জীবনটা কেটে যেত। স্বাভাবিকভাবে গণিকাদের 'মানসিক উৎকর্ষ' পুরুষদের আকর্ষণের বিষয় ছিল। সাধারণভাবে নারীকে শিক্ষার আলোক থেকে দূরে রেখে তাকে অপাংক্তেয় করেছে পুরুষতন্ত্র। কিন্তু বাইরের জগতে নারী সম্ভোগ এবং নারীর উৎকর্ষ উপভোগ থেকে পুরুষ কখনও বঞ্চিত হয়নি।

যে বিষয়ে ভাবতেই হয়

''মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষ যা লিখেছে তার সবকিছুকেই সন্দেহ করতে হবে, কারণ পুরুষ একই সঙ্গে বিচারক ও মামলার একটি পক্ষ।'' আমাদের দেশের ধর্ম ও শাস্ত্রকারদের বিস্তৃত লেখনি সম্বন্ধে পুলগবার-এর মন্তব্যটি সুপ্রযুক্ত। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ এবং শাস্ত্রগ্রন্থের প্রণেতা পুরুষ এখানে প্রতিপক্ষ এবং অন্যপক্ষ হল নারী। নারীকে স্ববশে রাখতে, শাসন করতে, সর্বোপরি শোষণ করতে ধর্মবেত্তা এবং শাস্ত্রকাররা যে হাজারো প্রচেষ্টা নিয়েছেন তাতে সংশয় তৈরি হয়— প্রতিপক্ষ পুরুষ কি চিরকাল নারীকে দমিয়ে রাখার অভিসন্ধি খুঁজছে নারীর ক্ষমতাকে ভয় পেয়েই? পুরুষের তৈরি সভ্যতায় তথা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় 'নারীকে সম্পূর্ণ বন্দী' করা কি পুরুষতন্ত্রের পক্ষে এতটাই অপরিহার্য ছিল? ছিল, কারণ পুরুষের পক্ষে নারীকে মূল্য দেওয়া বা তার সম অধিকার স্বীকার করা অসম্ভব ছিল। যদি নারীকে একটি শ্রেণী হিসেবে গণ্য করতে হয় তবে বলতে হয় ''পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম শোষক শ্রেণী পুরুষ, প্রথম শোষিত শ্রেণী নারী''। (*নারী* : হুমায়ুন আজাদ) আর নারীকে শোষণের জন্য পুরুষের প্রধান হাতিয়ার হয়েছে ধর্ম। ধর্মের আশ্রয়ে, অপচেষ্টায় শূদ্রকে যেমন প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে অপর তিনটি শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তেমনি প্রান্তিকতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে নারী। অন্য রূপে ধর্ম আবার হয়ে উঠেছে এইসব শোষিতের দীর্ঘশ্বাস, আমজনতার আফিম।

''নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নয়। ...অন্তক, শমন, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প, অগ্নি— এইসব কিছু একত্রে একটি নারীর সমান''— বলেছেন ভীষ্ম। সমাজ, সভ্যতায় যা কিছু খারাপ তা নারীর সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পুরুষ জন্ম তাই সৌভাগ্যের সূচক— নারী জন্ম দুর্ভাগ্যের। নারীর ক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতাকে বাদ দিয়ে সভ্যতার চাকা যে এক পাও এগোত না তা ধর্মবেত্তারা মনে রাখেন নি। তাই প্রায় সমস্ত ধর্মেই নারীর অবনমন ও হীন অবস্থানটি প্রধান হয়ে উঠেছে। ধর্মের হাতে নারীর এই যে নির্মাণ যে নারীর মুক্তির পথে কীভাবে কাঁটা বিছিয়ে রাখে, তা বিচার করে দেখতে হবে।

দাভোলকর হত্যার প্রতিবাদ

কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী সাথী নরেন্দ্র দাভোলকর গত ২০ আগস্ট ২০১৩ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিকতা বিরোধী আন্দোলনের এই সৈনিকের হত্যার বিরুদ্ধে অনীক তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং হত্যাকারীদের কঠিন শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

প্রবন্ধ

কোন শ্রম বেছে নিবি বল্ ?

শাশ্বতী ঘোষ

কাজ না-কাজের সীমানা

কোনটা কাজ আর কোনটা অ-কাজ বা না-কাজ, সেটা ঠিক হয় অর্থমূল্যে। বাজারি অর্থনীতি তো সেই রোগে ভোগেই, তাই ঘরের কাজ, যেটা মূলত মেয়েরাই করেন, সেটা দীর্ঘদিন ধরে সব হিসেব-নিকেশের বাইরে ছিলো, এই সবে তা হিসেবের মধ্যে ঢুকেছে। এমনকি মার্কস সায়েব, যিনি এমন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে শ্রমিক মজুরি দাসত্ব পেরিয়ে যাবে, উৎপাদন আর শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্নতা অনুভব করবে না, শুধু জীবনধারণের জন্য শ্রম করবে না, তিনিও কিন্তু শ্রমের পুনরুৎপাদন করে যে শ্রম— তাকে হিসেবের গণ্ডির মধ্যে আনেন নি। তাই শ্রমের হিসেব-নিকেশের মধ্যে এমন কাজ যা বাজারজাত হয়না, যা মূলত মেয়েরাই করেন, সেসবের হিসেব কী ভাবে হবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা প্রায় শূন্য থেকে শুরু হয়েছিল। মেয়েদের কাজের এই অ-দৃশ্য চরিত্র নিয়ে ভারতের গবেষকদের অন্যতম পথিকৃৎ, বর্ষীয়ান অর্থনীতিবিদ দেবকী জৈন (গবেষণাটি নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে করেন) বলছেন তাঁদের সেই অনুসন্ধান শুরুর প্রক্রিয়া, ১৯৭১ সালের জনগণনা দেখায় ১৫ শতাংশ মেয়ে আর জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (জানস) ২৭তম রাউন্ড (১৯৭২-৭৩) দেখায় ৬৬ শতাংশ মেয়ে অর্থকরী কাজে অংশ নেন, কিন্তু তাঁরা ১৯৭৫ সালে একটি সমীক্ষা চালিয়ে, মেয়েরা কোন কাজে কতো সময় ব্যয় করছেন সেটার ভিত্তিতে হিসেব করেন— সরাসরি না হলেও সাশ্রয়কারী কাজ করে পরিবারের অর্থ সাশ্রয় করছেন ৮০ শতাংশ মেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা চিরকাল অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণে বেশ পিছিয়ে, ১৯৭১ সালের জনগণনা বা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (জানস) ২৭তম রাউন্ড (১৯৭২-৭৩ সাল) দেখায় ৮ শতাংশ আর ১৯৭১ সালের জনগণনায় ১৭ শতাংশ, দেবকীদের হিসেবে তা হয়ে যায় ৬২ শতাংশ।

কী কাজ করেন জিজ্ঞেস করলে যেসব সাশ্রয়কারী কাজ করেন অথচ হাতে পয়সা পাননা, তাঁরা কাজ করেন বলে জানান না। হয়তো তাঁরা নিজেরাও সেই কাজকে 'কাজ' বলে মনে করেন না। এছাড়া অনেক সময় পরিবারের পুরুষদের সামনে সমীক্ষকরা প্রশ্ন করছেন, মেয়েরা কাজ করে হাতে যে কিছু অর্থ পান, সেটা পুরুষদের সামনে জানাতে নারাজ। এমনকি বহু সময় বাড়ির মেয়েদের বলার সুযোগ না দিয়ে বাড়ির পুরুষ মানুষরাই বলে দেন 'আমাদের বাড়ির মেয়েরা কোনো কাজ করেনা'—বাড়ির মেয়েদের বাইরে কাজ করাটা এখনো বহু পরিবারের কাছে অপমানের বিষয়। তাই অনেক সময় নতুন একটি পদ্ধতিতে মেয়েদের কাজের সম্বন্ধে প্রচলিত। কী কী কাজ করেন সে প্রশ্ন না করে এখন মেয়েরা সারাদিনে কী কী কাজ করেছেন, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করে তার থেকে কাজের চাপের আন্দাজ পেতে চেষ্টা করা হয়— একে বলে সময়-ব্যবহার সমীক্ষা। আর সেই কাজগুলোর বাজারি মূল্য হিসেব করে জাতীয় আয়ে অর্থের মূল্যে কতটা বাড়তে পারে তার একটা হিসেব করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ভারতের নির্বাচিত ছ'টি রাজ্যে বাজারজাত হয়না এমন সাশ্রয়কারী কাজ, যদি তা বাজারজাত হত, রাজ্যের আয় বেড়ে যেত, যা রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে যোগ হত, এমন কাজের মধ্যে নারী ও পুরুষেরা কে কতটা অংশ করেছেন, তা নিয়ে একটি সমীক্ষা করে এদেশের আরেকটি অগ্রণী পরিসংখ্যান সংস্থা— সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকাল অর্গানাইজেশন। তাতে দেখা যায় যে অধিকাংশ সময়ে মেয়েরাই সাশ্রয়কারী কাজ বেশি করছেন। সেই কাজের হিসেবটা যদি টাকায় প্রকাশ পেত, তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আয় বেড়ে যেত এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত (মেঘালয়)। কিন্তু সেই হিসেব হয়না বলে মেয়েদের কাজের বা কাজে অংশগ্রহণের পুরো ছবি সাধারণত উঠে আসে না। সেই তথ্য নিয়ে সারণি ১।

না-কাজের মেয়েরা : এদেশে

আমাদের মতো দেশে ঘরের কাজ শব্দটার অর্থ বিস্তৃত। বিনামজুরির কাজ দুরকমের— এক তো হলো যাঁরা পরিবারের নানা কাজে বিনামজুরিতে খাটেন, যাঁরা সেই কাজগুলো না করলে মজুরি দিয়ে করাতে হত। চাষিবাড়ির মেয়ে ধান সেদ্ধ করে শুকোতে পারেন, তাঁতিবাড়ির মেয়ে সুতো রং করতে পারেন, দোকানদারি থাকলে চায়ের দোকান চালান ঘরের

সারণি : ১
বিনামজুরির শ্রম কে কতটা করেন,
রাজ্যের আয়ে তার অনুপাত কত (নির্বাচিত রাজ্য, ১৯৯৮-৯৯)

রাজ্য	*রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিনা-মজুরির শ্রমের অনুপাত*		
	পুরুষ	*নারী*	*মোট*
হরিয়ানা	২.৪৮	২৭.২৮	২৯.৭৬
মধ্যপ্রদেশ	৬.৩১	৪০.৯৯	৪৭.৩
গুজরাত	২.৫৫	২৬.০৭	২৮.৬২
উড়িষ্যা	৪.৪৮	৩৪.৭২	৩৯.২
তামিলনাড়ু	৩.৫২	২২.৮	২৬.৩১
মেঘালয়	১১.৫৮	৩৮.৩৫	৪৯.৯৩

মেয়েরা। নয়তো ঘরের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনমূলক কাজ। গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়ে জ্বালানির অর্থ সাশ্রয় করা বা বিক্রি করে উপার্জন করা, রস জ্বাল দিয়ে গুড় বা পাটালি তৈরি, গরু পুষে দুধ বা হাঁস-মুরগি পুষে ডিম বিক্রি। এই সাশ্রয়ের ফলে পরিবারের যে অর্থটুকু বেঁচে গেল, বা সরাসরি আয় হল— সেটুকু কিন্তু তাঁদের নিজস্ব আয় বলে গণ্য নয়, তাঁরা নিজেরাও সেভাবে ভাবেন না। তাই দেশের কাজের হিসেবে তাঁরা আসেন না। এদেশের শ্রমশক্তির তথ্যের অন্যতম উৎস জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় এধরনের কাজে মেয়েদের ভূমিকাকে স্বনিযুক্ত বিনা-মজুরির সহায়ক বলে চিহ্নিত করেছে, স্বনিযুক্ত কর্মী বলে চিহ্নিত হন পরিবারের পুরুষরা, যিনি পরিবারের কর্তা— বাড়িটা, জমিটা বা দোকানটার মালিক। দেখা যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে এধরনের সহায়কের ৭৪ শতাংশ আর শহরাঞ্চলে ৫০ শতাংশ হলেন মেয়ে। তাঁরা কিন্তু সংখ্যায় পুরুষদের তিনগুণ। অর্থাৎ মালিক পুরুষটি, অর্থপ্রাপ্তি তাঁর, খাটবেন কিন্তু মেয়েরাই।

কী কী ধরনের সাশ্রয়কারী কাজে মেয়েরা আছেন? গ্রামশহরে তফাৎ থাকলেও মোটের উপর চাষবাসে আছেন তাঁদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ। বাকিরা আছেন পশুপালন, রেশম গুটি প্রজনন, সূচিশিল্প, জরির কাজ, দর্জির কাজ, বাঁশ-বেত প্রভৃতির কাজ, এমনকি পাথর কেটে জিনিস বানানোর কাজেও। পরিষেবা ক্ষেত্রে তাঁরা তুলনায় কম। তবু খুচরো ব্যবসা, বিশেষত নিজেদের খাবার দোকান, এমনকি ঠেলা বা ভ্যান গাড়ি চালানোতেও আছেন, আছেন ছোটো কারখানাতেও। বেসরকারিকরণের ঢলে বেড়েছে সাব-কন্ট্র্যাক্ট, ফলে বেড়েছে ঘরে-বসে কাজের মাত্রা, যা স্বনিযুক্ত কাজের অন্যতম উৎস। এই ধরনের কাজ বাড়া মানে কাজের সুযোগ বাড়া না কি আসল সুযোগের অভাব বাড়ার লক্ষণ, সে নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। যাইহোক, সেখানে অন্যতম কর্মী কিন্তু ঘরের মেয়েরাই, সহায়ক হিসাবে।

কিন্তু এ দেশের গ্রামের মেয়েরা শ্রমশক্তিতে যোগ দিচ্ছেন ক্রমশ-ই কম সংখ্যায়। পাঁচ বছর অন্তর হয় জাতীয় নমুনা সমীক্ষার বড়ো নমুনার প্রধান সমীক্ষা, আর প্রতি বছর হয় কম নমুনার সমীক্ষা। সমীক্ষাগুলি রাউন্ড বলে চিহ্নিত। শ্রমশক্তির সংজ্ঞায় আসেন গত এক বছরে বেশিরভাগ সময় কাজ করেছেন এমন প্রধান কর্মী, অন্তত কিছু সময় কাজ করেছেন এমন আংশিক কর্মী আর এখন কাজ নেই কিন্তু খুঁজছেন— এঁরা সবাই। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য থেকে এই প্রবণতা আগ্রহীদের চোখে পড়েছে বেশ কিছুদিন হল, ১৯৮৩ সাল থেকে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে চললেও *জানস*-এর ৬১তম (২০০৪-০৫ সাল) থেকে ৬৬তম রাউন্ড (২০০৯-১০) হয়ে ৬৮তম রাউন্ডে (২০১১-১২) এসে সেই হ্রাসের প্রবণতা এখন বরং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আরো আরো মেয়েদের ঘরে টেনে আনছে বলে তথ্য বলছে। ১৯৮৩ সালে যদি বছরের বেশিরভাগ সময় এবং আংশিক সময় কাজ করেছেন এমন ১৫-৫৯ বছর বয়সী গ্রামীণ নারীর অনুপাত হাজারে ৩৪২ হয়ে থাকে (শতকরা হিসেবে ৩৪.২ শতাংশ), ৬১তম, ৬৬তম ও ৬৮তম রাউন্ডে তা নেমে এসেছে যথাক্রমে ৩৩৩, ২৬৫ ও ২৫১-তে। গ্রামীণ বা শহরাঞ্চলের পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা নেই— ওঠাপড়া অবশ্য-ই আছে, আর শহরাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে সামান্য কমেছে, ১৭৮ থেকে ১৫৫ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের কাজে অংশগ্রহণ এইভাবে হ্রাস পাওয়ার ব্যাখ্যা কি? ৬৮তম রাউন্ডের তথ্য সবে প্রকাশিত হয়েছে, তাই নিয়ে এখন গবেষণা শুরু হয়েছে, কিন্তু ৬৬তম রাউন্ড পর্যন্ত গ্রামের মেয়েদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ কমা নিয়ে গবেষকরা বলছেন, বেশি করে মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে তাই কাজে যোগ দিচ্ছে কম; সেই সঙ্গে পরিবারের আয় বেড়েছে, পরিবার মনে করছে মেয়েদের বাইরের কাজে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। অনেকের মতে অবশ্য গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের কাজের সুযোগ কমছে বলেই মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়া কমেছে।

সারণি ২
শ্রমদাতার সংখ্যা : প্রধান ও অপ্রধান কর্মী (কোটি)

	গ্রামীণ পুরুষ	*গ্রামীণ নারী*	*শহরের পুরুষ*	*শহরের নারী*	*মোট*
১৯৮৩	১৫.৪৮	৯.০৫	৪.৮৬	১.২৬	৩০.৬৬
১৯৮৭-৮৮	১৬.৬৮	৯.৪৮	৫.৫১	১.৪৬	৩৩.১৫
১৯৯৩-৯৪	১৮.৯৬	১০.৫১	৬.৬৭	১.৮২	৩৭.৯৬
১৯৯৯-২০০০	২০.১২	১০.৬৩	৭.৮৩	১.৯১	৪০.৪৯
২০০৪-০৫	২২.০৪	১২.৫২	৯.৪৩	২.৬৭	৪৬.৬৬
২০০৯-১০	২৩.৩৭	১০.৫৫	১০.৫৩	২.৫৪	৪৬.৯৯
২০১১-১২	২৩.৮৮	১০.৩৬	১১.২৫	২.৮৮	৪৮.৩৭

কিন্তু তথ্য যাদের শ্রমশক্তিতে ধরছে না? জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় শ্রমশক্তিতে নেই বলে ধরা হয় ছাত্রছাত্রী, শুধুমাত্র বাড়ির কাজে রয়েছেন এমন মানুষ, বাড়ির কাজের সঙ্গে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ফল-পাকুড়-পাতা কুড়োনো, সেলাইফোঁড়াই ইত্যাদি কাজে যুক্ত, পেনশন পান বা শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষরা। এঁদের মধ্যেও ঘরের কাজে নিযুক্ত যে মেয়েরা, তার প্রায় ৫০ শতাংশ কিন্তু এমন কাজ করেন সেগুলোও আসলে সাশ্রয়কারী কাজ, অতএব সরাসরি না হলেও পরোক্ষে অর্থকরী তো বটেই।

শিক্ষা আর পরিবারের আয়

১৯৮৩ থেকে ২০১১-১২ সাল, ৩৮তম থেকে ৬৮তম রাউণ্ডের মধ্যে শিক্ষায় গ্রামীণ মেয়েদের অংশগ্রহণ ৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ শতাংশ। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণের জন্য কাজে অংশ নিচ্ছে না সে যুক্তি তো সব বয়সের মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না, বড়জোর ১৫-২৪ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য সেটা একটা প্রধান কারণ হতে পারে। কিন্তু ১৫-২৪ বছর বয়ঃসীমার মেয়েরা কাজে যোগ দিতে পারে এমন মেয়েদের মধ্যে ৩০ শতাংশ, তাই তাদের কাজে অংশগ্রহণ কমা মোট সংখ্যাকে প্রভাবিত করে। শহরের মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বেড়েছে, ১৮ থেকে ২৬ শতাংশ হয়েছে, কিন্তু সেখানে কাজে যোগদানের হার এতটা কমেনি। এই বয়ঃসীমার বাইরে গ্রামীণ বাকি মেয়েদের কাজে যোগ না দেবার কারণ তা হলে কী হতে পারে?

পরিবারের আয়। হ্যাঁ, এই সময়ে পরিবারের আয় বেড়েছে, কারণ মজুরির হার বেড়েছে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত একদম নিচের দিকে ছিল যেসব মজুরির হার, সেইরকম মজুরির হার বেশি বেড়েছে। এছাড়া গ্রামীণ পরিবারের গড় ভোগব্যয় (সমীক্ষায় আয়ের বদলি হিসাবে ব্যয়কে নেওয়া হয় কারণ মানুষ সহজে আয় জানাতে চাননা, তাই ব্যয়কেই আয়ের মাপকাঠি ধরা হয়) ১৯৯৩-৯৪ সালের ৯৪২ টাকা (২০১১-১২ সালের দামে) থেকে ২০১১-১২ সালে ১২৮৭ টাকা হয়েছে, মানে ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি। সেইসব গ্রামীণ পরিবারের মেয়েরা কাজে কম যোগ দিচ্ছেন। শহরের ক্ষেত্রে তবু সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিবারগুলিতে মেয়েদের কাজে যোগদান একটু হলেও বাড়ছে, অর্থাৎ ধনী পরিবারের মেয়েরা কাজে কম হলেও যোগ দিচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে কিন্তু তা একেবারেই ঘটছে না। তাই যেসব গ্রামীণ পরিবারে পুরুষ আয় করেন, ধরে নেওয়া যায় পরিবারের মাথার উপর ছাতা ধরে আছেন, সেরকম পরিবারে মেয়েরা শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজন যতটা অনুভব করেন, যেসব মেয়েদের সেই 'ছাতা'টা নেই, তারা অনুভব করেন অনেকগুণ বেশি। তাই বিধবাদের ৬৫ শতাংশ বা বিচ্ছিন্না/পরিত্যক্তাদের ৭৫ শতাংশ শ্রমশক্তিতে অংশ নেন, যেখানে অবিবাহিতাদের অংশ নেন ২৪ শতাংশ বা বিবাহিতাদের ৪১ শতাংশ। প্রত্যক্ষভাবে পুরুষদের মজুরি বা পরিবারের ব্যয় আর পরোক্ষভাবে পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকার সুযোগ গ্রামের মেয়েদের শ্রমশক্তি বা সরাসরি অর্থকরী কাজ থেকে দূরে রাখছে।

কিন্তু তা বলে কি গ্রামীণ পরিবারের মেয়েদের কাজ এতটুকু কমছে? *জানস* ঘরের কাজকে দুটো ভাগে ভাগ করে— এমন কাজ যা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য-ই শুধু, আরেক ধরনের কাজে সরাসরি আয় হয় না বটে, কিন্তু পরিবারের আর্থিক সাশ্রয় ঘটে। রান্না করা সাশ্রয়কারী কাজ, কারণ না হলে রাঁধুনি রাখতে হত বা খাবার কিনে খেতে হত, কিন্তু খাওয়ার কাজটা শুধু ভরণপোষণের জন্য-ই। দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৩ সালে ৩০ শতাংশ গ্রামীণ নারী পুরো সময়ের জন্য ঘরের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, ২০১২ সালে তাঁদের অনুপাত ৪২ শতাংশ। শহরাঞ্চলে অবশ্য ঘরের কাজে অংশগ্রহণের হার বেশিই ছিল, একই সময়ে ৩৮ থেকে ৪৮ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্যে শুধু নিজস্ব ভরণপোষণের কাজের ভাগ গ্রামেও বাড়ছে, কমছে সাশ্রয়কারী কাজ।

সারণি ৩

শ্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা : প্রধান ও অপ্রধান কর্মী (কোটি)

	গ্রামীণ পুরুষ	*গ্রামীণ নারী*	*শহরের পুরুষ*	*শহরের নারী*
১৯৭৭-৭৮	৫.৫৯	৩.৩৮	৫.৩৭	১.৭৮
১৯৮৩	৫.৫৫	৩.৪২	৫.৪	১.৫৯
১৯৮৭-৮৮	৫.৪৯	৩.৩১	৫.৩৪	১.৬২
১৯৯৩-৯৪	৫.৬১	৩.৩১	৫.৪৩	১.৬৫
১৯৯৯-২০০০	৫.৪	৩.০২	৫.৪২	১.৪৭
২০০৪-০৫	৫.৫৫	৩.৩৩	৫.৭১	১.৭৮
২০০৯-১০	৫.৫৬	২.৬৫	৫.৫৯	১.৪৬
২০১১-১২	৫.৫৩	২.৫৩	৫.৬৩	১.৫৫

সূত্র : এনএসএস রিপোর্ট, ভারতে কর্মসংস্থান ও বেকারি নিয়ে

পরিবারের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কাজ সংসারের ঠাটবাট বাড়ানোর জন্য, যাকে সমাজতত্ত্ববিদ হানা পাপানেক বলেছেন 'স্টেটাস প্রোডাকশন'— সেজন্য ব্যবহার হচ্ছে। বাচ্চাদের জামাগুলো আরো পরিষ্কার থাকবে, পর্দা-বিছানার চাদর আরো বেশি নিয়মিত কাচা হবে, বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে টিফিন দেওয়া হবে, দরকারি লোকেদের সঙ্গে পরিবারের সংযোগ বাড়ানো (নেটওয়ার্কিং), বিয়েশাদির যোগাযোগ, ধর্মকর্মের জন্য সময়— এরকম আরো কতভাবে পরিবারের জন্য মেয়েদের সময়কেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সবকিছুর যোগফল— পরিবার যে জাতে উঠছে, সেটা লোককে বোঝানো।

কাজের সুযোগ, কাজের সংস্কৃতি

ভারতে কাজের সুযোগ বাড়া নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছিল, ১৯৯০ সাল থেকে বছরে গড়ে এদেশে ৫৫ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি হবে, কিন্তু ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০-এর মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ করে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে কাজে যোগ দেবার বয়সী মানুষ বাড়বে বছরে ১২০ লক্ষ করে— তার মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ বাস্তবিকই কাজের সুযোগ খুঁজবেন। ফলে সারা ভারতে কাজের বাজারে হাহাকার শুরু হবে। তার মধ্যে গ্রামীণ মেয়েরা কাজ করতেন সাধারণ কৃষিতে, যা কিনা আদৌ উৎপাদনশীল নয়। গবেষকদের মতে কাজের সুযোগ বাড়ে যখন রাজ্যের মাথাপিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ে, যা কিনা ২৮টি রাজ্যের সবার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, ৪ থেকে ১৭ শতাংশ-এর মধ্যে থেকেছে বৃদ্ধির হার। তাহলে তো মেয়েদের কাজের সুযোগ অন্তত কমেছে, সে কথা বলা যায় না। মনে রাখতে হবে, গ্রামীণ মেয়েরা কাজ করতেন সাধারণত কৃষিতে, যা কিনা

সারণি ৪

গ্রামে ও শহরে মেয়েদের কর্মনিযুক্তির চিত্র (শতাংশে)

	১৯৮৩	১৯৮৭-৮৮	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৯-২০০০	২০০৪-০৫	২০০৯-১০	২০১১-১২
গ্রাম							
স্বনিযুক্ত/পরিবারে মজুরিহীন কাজ	২১	২২	১৮.৫	১১.৪	১৩.৬	১০.২	৯.৪
নিয়মিত মজুরির কাজ	১.৬	২.১	১.৩	০.৯	১.২	১.১	১.৩
অনিয়মিত মজুরির কাজ	১৮	১৭	১৭	১১	৯	৯	৬.৮
কর্মহীন	০.৬	১.৪	০.৫	০	০.৮	০.৫	০.৫
শিক্ষাক্ষেত্রে	৭.৬	৭.২	১১.৭	১৮.৪	২১.৩	২৩.৮	২৫.১
সমস্ত গার্হস্থ্য ক্ষেত্র	২৯.৮	২৭.৩	৩৪.৪	৩৬.৩	৩৫.৫	৩৯.৯	৪২.২
শুধু গার্হস্থ্যশ্রম	১৫.৯	১৫.১	১৫.৭	২০.৩	১৭.৫	২২	১৮.৫
গার্হস্থ্য ও সাশ্রয়কারী	১৩.৯	১২.২	১৮.৭	১৬	১৮	১৭.৯	২৩.৭
অন্যান্য	২১.৪	২৩.১	১৬.২	২২.৪	১৮.৪	১৫.৬	১৪.৭
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
শহর							
স্বনিযুক্ত/পরিবারে মজুরিহীন কাজ	৮.৫	৮.৫	৭.৯	৪.৫	৫.৪	৪.২	৪.৬
নিয়মিত মজুরির কাজ	৮.৪	৯	৭.৮	৪.৬	৫.৭	৫.৩	৬.১
অনিয়মিত মজুরির কাজ	৭	৬	৬	৩	২	২.৪	১.৮
কর্মহীন	১.৫	১.৯	১.৮	০.৯	১.৪	০.৯	০.৯
শিক্ষাক্ষেত্রে	১৮.২	১৮.৪	২১.৮	২৫.১	২৫.১	২৫.৬	২৬
সমস্ত গার্হস্থ্য ক্ষেত্র	৩৮.৫	৩৮.১	৪০.২	৪৫.৪	৪৫.৭	৪৮.২	৪৮
শুধু গার্হস্থ্যশ্রম	৩০.৮	২৯.৫	৩০.৫	৩৮.৪	৩৫	৩৯.৯	৩৬.৪
গার্হস্থ্য ও তৎসম্পর্কিত	৭.৭	৮.৬	৯.৭	৭	১০.৭	৮.৩	১১.৬
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
অন্যান্য	১৮.১	১৭.৯	১৪.১	১৬.৯	১৪.৫	১৩.৪	১২.৬

সূত্র : এনএসএস রিপোর্ট

আদৌ উৎপাদনশীল নয়। আর কৃষিও ক্রমশ যন্ত্র ব্যবহার করে মেয়েদের কাজের সুযোগ আরোই কমিয়ে দিচ্ছে। বড়ো রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, জনসংখ্যার আধিক্যের জন্য একাই সারা ভারতের কর্মীমেয়ের ১৬ শতাংশ যোগান দেয়, সেখানেই গ্রামীণ মেয়েদের শ্রমশক্তিতে যোগদানের হার কমেছে ১২ শতাংশ, এছাড়াও অনেকটা কমেছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র আর মধ্যপ্রদেশে। তাই ত্রিপুরা বা জম্মু-কাশ্মীরে বা অন্য ছোটো রাজ্যে গ্রামীণ মেয়েদের শ্রমশক্তিতে বৃদ্ধি মোটের উপর প্রভাব ফেলতে পারছে না। ৬৮তম রাউণ্ডের হিসেবে গ্রামীণ মেয়েরা কাজ করছেন মূলত কৃষি (৭৫ শতাংশ), উৎপাদনশিল্প (৯.৫ শতাংশ), গৃহনির্মাণ (৫ শতাংশ) ব্যবসা-হোটেল-অন্যান্য পরিষেবায় (৯ শতাংশ)। কৃষির গুরুত্ব কমছে, বাকি ক্ষেত্রগুলি গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য এখনো যথেষ্ট আকর্ষক হয়ে উঠতে পারেনি। তাই আয় বা শিক্ষা বাড়লে মেয়েরা কাজের থেকে ঘরে বেশি থাকাই বেছে নিচ্ছেন।

ষড়যন্ত্র নয়

তাই মেয়েরা আরো বেশি করে সাক্ষর হলেও, ইস্কুলের গণ্ডি পেরোলেও, আরো বেশি পড়াশুনা করলেও গ্রামাঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে কাজে যোগদানের হার। গ্রামের মেয়েরা যে খুব পেশাদারি পড়ায় যাচ্ছেন তা নয়, সাধারণ ডিগ্রি কোর্সের পড়াতেই তাঁরা আবদ্ধ থাকছেন, যার দাম বিয়ের বাজারে, কাজের বাজারে নয়। অথচ পরিবারের আয় বাড়া, পুরুষদের অনুপাতে কম হলেও— মজুরি বাড়া, সন্তানসংখ্যা কমা এগুলোই মেয়েদের আরো বেশি করে শ্রমশক্তিতে যোগদানের ভিত্তি তৈরি করবে— অর্থনীতির পাঠ্যবই সেরকমই বলেছিল। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা সেই ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, কাজের বাজারে সবচেয়ে খারাপ কাজ আর সবচেয়ে কম মজুরিতে আটকে থাকা, আইনের চোখে, সমাজের চোখে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন— এসবের থেকে মেয়েরা ঘরের কাজে মন

সারণি ৫

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীশ্রমিকদের শতকরা বিন্যাস

	১৯৮৩	১৯৮৭-৮৮	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৯-২০০০	২০০৪-০৫	২০০৯-১০	২০১১-১২
গ্রাম							
কৃষি	৮৬.২	৮২.৫	৮৪.৭	৮৪.১	৮১.৪	৭৮.৯	৭৪.৫
খনি ও খাদান	০.৪	০.৫	০.৫	০.৪	০.৪	০.৩	০.৩
ম্যানুফ্যাকচারিং	৬.৫	৭.৫	৭.৫	৭.৭	৮.৭	৭.৬	৯.৫
বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল	-	-	-	-	০	০	১
নির্মাণ শিল্প	০.৯	৩.২	১.১	১.২	১.৭	৪.২	৫.১
বাণিজ্য (হোটেল)	২.২	২.৪	২.২	২.৩	২.৮	৩.১	৩.৬
পরিবহন ইত্যাদি	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২	০.৩	০.১
অন্যান্য পরিষেবা	৩.৪	৩.৭	৪	৪.৩	৪.৬	৫.৭	৫.৯
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
শহর							
কৃষি	২৫.৫	২১.৮	১৯.৩	১৪.৬	১৪.৭	১১.৮	৮.৭
খনি ও খাদান	০.৮	০.৯	০.৭	০.৪	০.২	০.৩	০.৩
ম্যানুফ্যাকচারিং	২৬	২৬.৯	২৩.৬	২৩.২	২৫.৪	২৫.৮	২৬.৬
বিদ্যুৎ, গ্যাস,জল	০.২	০.৩	০.৩	০.২	০.২	০.৪	১.১
নির্মাণ শিল্প	৩.৭	৪.৩	৪.৯	৫.৫	৪.৫	৫.১	৪.৩
বাণিজ্য (হোটেল)	৯.৯	১০.৯	১০.৭	১৬.৪	১৩.১	১২.৪	১৩.০
পরিবহন ইত্যাদি	১.৭	১.২	১.৫	২	১.৬	১.৫	২.৭
অন্যান্য পরিষেবা	৩১.৪	৩৩.৬	৩৮.৮	৩৭.৮	৪০.২	৪২.৭	৪৩.৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র : এনএসএস রিপোর্ট

দেওয়াকেই হয়তো নিজেদের মূল্য বাড়ানোর পথ বলে মনে করতে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরিবারের আয় বাড়লেও বাড়েনা মেয়েদের জন্য পরিবারের সুযোগ-সুবিধে— যাতে অর্থব্যয় হয়। তাই শ্রম কমায় এমন যন্ত্র, রান্নাঘরের আবহাওয়া, শৌচাগার—যেগুলি মেয়েদের একটু ভালো থাকার জন্য অত্যাবশ্যক— সেগুলিতে কিন্তু পরিবারের খরচ বাড়ে না। এলা রঙের অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর রান্নাঘর বা শৌচালয়ের কথা আমাদের প্রায় সকলের পরিচিত। কারণ পরিবার সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। অন্যদিকে মেয়েরা কাজে গেলেও তার আয় কিন্তু মেয়েরা খরচ করার স্বাধীনতা প্রায়শ পাননা— এমনকি কী রান্না হবে, সেটাও তাঁরা পরিবারের বর্ষীয়ান সদস্যদের আদেশেই করেন। অনেক সময় সে আলোচনায় তাঁর মতামত উপেক্ষিত থাকে। এই গুরুত্ব শুধু পুরুষরা দেননা তা নয়, মেয়েরা নিজেরাও দেননা।

পরিবারের আয় বাড়া, এককথায় আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কাজে যোগদানের সম্পর্কটা সরলরেখায় আঁকা যায় না, সেটা অনেকটা নাকি ইংরেজি 'ইউ' আকৃতির, প্রথমে কমে, কারণ বৈষম্য বাড়ে, মেয়েরা ঘরে চলে যাওয়াকেই সুবিধে বলে মনে করেন; তারপর আয় অনেকটা বাড়লে, আইন আর সমাজ মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে সহায়ক মনোভাব নিলে আবার মেয়েরা বাইরের কাজে যোগ দিতে শুরু করেন। মেয়েদের কাজ নিয়ে এইরকম 'ইউ' আকৃতির রেখা বহু দেশে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে দেখা গেছে। ভারতেও গ্রামের মেয়েরা এখন হয়তো সেই 'ইউ' আকৃতির নামার অংশে রয়েছেন, সুযোগ আরো ভালো হলে অংশগ্রহণ বাড়বে, 'ইউ'য়ের উঠতি অংশে যেতে পারবেন। অবশ্য অনেকের মতে শ্রমশক্তিতে মেয়েদের যোগদানের হারের চেহারা 'ইউ' আকৃতির নয়, ইংরেজি 'এস' আকৃতির, প্রথমে বেড়ে তারপর নামবে, পরে আবার উঠবে। তবে এসবই অভিমত, পরিষ্কার বুঝতে আরো গবেষণা প্রয়োজন, প্রয়োজন আরো তথ্যের।

কাজ = মজুরি; না-কাজ = বিনা মজুরি?

এদেশে বৌ-দের দিন শুরু হয় সাধারণত পরিবারের সব সদস্যদের আগে, শেষ হয় সবার পরে। কৃষিজীবী, শ্রমিক চাকুরে— সবার বাড়ির বৌ-কেই উঠতে হয় সবার আগে, উঠেই শুরু করে দিতে হয় পরিবারকে সচল করার প্রাথমিক কাজগুলি। কেউ সাত সকালে স্বামীর কারখানার টিফিন বানাচ্ছেন, কেউ গোবর কুড়িয়ে ঘর লেপছেন, কেউ ইস্কুলে যাবার জন্য ছেলেমেয়েদের পরিপাটি করছেন এবং সকালের প্রাথমিক কাজের ধাক্কা সামলে সারাদিন ধরে রান্নাবান্না, খাবার জল ধরা, পুকুরে কাপড় কাচা, বাছুরটাকে খাইয়ে আনা, ঘর পরিষ্কার— আরো কত কি! এবং মনোরঞ্জন। একই রুটিন, দিনের পর দিন। আজ অনেকে নতুন শব্দ ব্যবহার করছেন— গৃহবধূ নয়, গৃহনির্মাত্রী। কিন্তু ঘরের কাজের এই আবহমান ছকের বাইরে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী কৃষ্ণা তিরথ যখন মেয়েদের আখ্যা দেন গৃহপ্রযুক্তিবিদ, আর বলেন স্বামীদের মাইনের ১০-২০ শতাংশ বাধ্যতামূলকভাবে গৃহনির্মাত্রীদের দেবেন স্বামীরা, সেই মর্মে তাঁর দপ্তর আইন বানাবার কথা ভাবছে, তখন নড়েচড়ে বসতে হয় বৈকি। এই সিদ্ধান্ত আইন হলেও কার্যকর হবে কী করে, নজরদারি চালাবে কে— এই প্রশ্ন থাকবেই। কিন্তু 'ঘরের কাজ মেয়েরা ভালোবেসে করেন, মূল্যের হিসেব তাই তাঁদের অপমান'— অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ের একেবারে গোড়ায়, জাতীয় আয় পরিমাপের প্রশ্নে যা আমরা শিখি, সমাজেও যেটা চালু ভাবনা, সেই মিথটাকেও ভাঙা আবশ্যক।

১৯৭২ সালে বামপন্থী ভাবনার ইতালির মারিয়া রোসা ডেলা কস্টা আর মার্কিন সেলমা জেমস 'দ্য পাওয়ার অফ উইমেন অ্যানড সাবভার্সান অফ দ্য কম্যুনিটি' পুস্তিকায় জোরালোভাবে এই দাবি তুললেন। বললেন, মেয়েরা ঘরে বিনিপয়সায় কাজ করে বলেই সুবিধা পায় মালিকপক্ষ, কারণ না হলে ঘরের কাজের জন্য হয় তাদের বাজারি বিকল্প তৈরি করতে হত নয়তো শ্রমিকদের বেশি মজুরি দিতে হত। রাষ্ট্র যদি বাজারি বিকল্প তৈরি করে, তবে সস্তায় খাবার, জামাকাপড় ধোয়া, বাচ্চাদের দেখাশুনা করা, বয়স্ক লোকেদের দেখভাল আর চিকিৎসা ইত্যাদি নানা ধরনের পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে, বাচ্চা থাকলে পরিবারের কর কমাতে হবে, একলা মায়েদের ভাতা দিতে হবে। সরকার কেন মেয়েদের জন্য এত খরচা করতে চাইবে? তাঁদের জবাব, মেয়েরা এই কাজটা ভালোভাবে করলে দেশ ভবিষ্যতের সুনাগরিক পাবে, পাবে ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার-গবেষক-উদ্ভাবক-শিক্ষক-শিল্পপতি এবং শ্রমিক। তাহলে সরকার এটাকে সামাজিক শ্রম হিসাবে দেখবে না কেন? কেন এ জন্য বাজেটেই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে না? পুঁজিমালিকদের কেন বাধ্য করবে না সেই ব্যবস্থাগুলো রাখতে?

মালিকের মুনাফা বাড়ানোতে সাহায্য করেও মেয়েরা না পাচ্ছে তাদের ঘরের কাজের জন্য স্বীকৃতি, না মজুরি। গোল বাঁধলো, কার কাছে সেই মজুরি চাওয়া হবে? স্বামীদের কাছে? পুঁজিমালিকদের কাছে? নাকি রাষ্ট্রের কাছ? এই বক্তব্য নিয়ে, বলাই বাহুল্য, শুরু হল আর দীর্ঘদিন ধরে চলল বহু বিতর্ক। নারীবাদীদের একদল যদিও স্বামীদের থেকে মজুরি আদায়ের পক্ষপাতী, কিন্তু অন্য বড়ো অংশ বলল সরকারকেই ব্যবস্থা করতে হবে, মজুরি নয়, বরং মেয়েদের কাজ হালকা করার নানা পরিকাঠামোর ব্যবস্থা। বিতর্ক শুরুর দুজনেও কিন্তু গৃহবধূদের মজুরির দাবি তুলে পরে তা থেকে সরে এসে মেয়েদের ঘরের কাজেরও হিসেব রাখতে হবে বলে ভাবনা বদলান।

শ্রমশক্তিতে মেয়েদের যোগদান এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা হবে কেন? কেন অর্থকরী কাজকেই শুধু দেওয়া হবে, গেরস্থালির কাজকে কেন নয়? কেন শ্রমশক্তিতে যোগদানের হার কমা এত গবেষণার জন্ম দেবে? সমাজের জন্য দুধরনের কাজই কি সমান

গুরুত্বপূর্ণ নয়? মেয়েরা যদি বাইরের কাজে 'যথেষ্ট' সুবিধে, সে মজুরি হোক বা কাজের সুযোগ— পাচ্ছেন না বলে মনে করেন, ঘরের কাজ করে পরিবারের কাছে নিজেদের দাম বাড়ান, সেটাকে আমরা শুধু মেয়েদের উপর সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য বলেই দেখবো? কেন সেটা মেয়েটির সচেতন নির্বাচন ভাববো না? স্ট্যাটাস উৎপাদন তো একভাবে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নেরও সূচক! বাচ্চা যদি বেশি পুষ্টিকর খাবার পায়, তাহলে তো পরিবারের ভবিষ্যতের সম্পদ-ই তৈরি হবে! একসময় পারিবারিক মজুরির নামে মেয়েদের ঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল পশ্চিমি দেশগুলিতে— তা শুধু মালিক, পুরুষ শ্রমিক আর ট্রেড ইউনিয়নের পুরুষ নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র ছিল না— অমানবিক কাজের পরিবেশ, অরক্ষিত যৌনসংসর্গ, অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুদের প্রতিপালন, এসব থেকে মুক্তি পেতে অনেক মেয়ে তা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরীরাই কিন্তু আজ শ্রমশক্তির সিংহভাগ। এদেশের গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন, তফশিলি জাতি বা উপজাতি পরিবারের মেয়েরা এখনো শ্রমশক্তিতে উল্লেখযোগ্য অংশীদার। কতটা স্বাধীনতায় আর কতটা বাধ্যতায়?

মজুরি নয়, সমান অংশীদারি

বিতর্ক সত্ত্বেও ঘরের কাজের জন্য মজুরির দাবি ওঠার চল্লিশ বছর পরে আজও দেশে এবং বিদেশে, ঘরের কাজ, বাচ্চার দেখাশুনা, বয়স্ক আর অসুস্থদের দেখাশোনা, রান্নাবান্না-ঘরকন্না মূলত মেয়েদের কাজ। স্ত্রী বাইরে কাজ করলে ঘরের কাজ এখন কিছুটা ভাগাভাগি হয়। কিন্তু স্ত্রী পুরোপুরি গৃহনির্মাত্রী হলে তা সাধারণত হয় না। ঘরের কাজকে 'কাজ' বলে মনে করা হয় না, কিন্তু সেটি বেশ সময় ও শ্রমসাপেক্ষ কাজ, নিজে সরাসরি কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কারো কারো থাকে বাড়ির অন্যান্য মজুরি-শ্রমিকের দেখাশোনা করা, এককথায় লোকচরানো— পরিচারিকা, রাঁধুনি, আয়া, মালি, ড্রাইভার ইত্যাদি। সেই লোকচরানো শিখতেই কিন্তু আজকাল ছাত্ররা পয়সা দিয়ে ম্যানেজমেন্ট পড়ে! এছাড়া কৃষক শ্রমজীবী দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ঘরের কাজের সীমানাটা কোথায় টানা যাবে? যাঁরা পর্দার কারণে বাড়ির বাইরে যাননা, তাঁরাও কিন্তু ধানসেদ্ধ, সুতোপাকানো, জাল সারাই এরকম হাজারো কাজ করে পরিবারে অর্থ সাশ্রয় করেন, সেটাও তো ঘরের কাজ। অনেক পরিবারে সামর্থ্য থাকলেও শ্রমসাশ্রয়কারী উপকরণ কেনা হয়না, ধরে নেওয়া হয় ঘরের মেয়েরা সময় বেশি পেলে উচ্ছন্নে যাবে। তাই গৃহবধূরা ঘরের কাজের এই অবমূল্যায়নের জন্য-ই অনিশ্চয়তা আর বেকারত্বের গ্লানিতে ভোগেন— 'আমি তো কিছু করি না'।

তাই এখন দাবি উঠছে মেয়েদের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে তার হিসেব-নিকেশ শুরু হোক, সরকার তাদের শ্রম লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করুক। মেয়েদের সময় সবচেয়ে বেশি যায় জল আর জ্বালানির ব্যবস্থায়, রান্না-বান্নায় আর পরিবারের বয়স্ক মানুষের সেবায়। সরকার সেগুলির বিকল্প তৈরি করুক। হিমাচলে সব দারিদ্র্যসীমার নীচে পরিবারদের সরকার নামমাত্র মূল্যে রান্নার গ্যাস দিচ্ছে, দিচ্ছে পাইপে আসা পরিশ্রুত জল। সব রাজ্য কেন তা দেবে না? বিশেষত, উদারিকরণের ফলে সর্বত্র সরকারি পরিষেবা বিনি পয়সা থেকে মূল্য-নির্ভর হয়ে ওঠার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসে আরো কম দরিদ্র পরিবার, ফলে অসুস্থদের দেখাশোনার ভার আরো বেশি করে চাপছে, যেমন অন্যান্য মূল্যবৃদ্ধিও তাঁদের ঘরের কাজকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে— কমদামি চাল কিনে কাঁকর বাছতে চলে যাচ্ছে আরো সময়, কাজে যেতে বাস নেই বলে অটোতে ভাড়া লাগছে তিনগুণ। আয় বাড়ছে না সেই অনুপাতে, তাই আরো বেশি করে সাশ্রয় করতে সংসারে আরো বেশি করে সময় দিতে হচ্ছে। কমছে বিশ্রাম, বাড়ছে অসুখ।

তাই সরকারের কাছে এই দাবিগুলি তোলা হতে থাকুক। কিন্তু সেইসঙ্গে রাজনীতিও বদলাক, মেয়েদের অধিকারের জন্য যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মূল ধারার, প্রান্তিক ধারার সব রাজনীতিই বলুক, ঘরের কাজ একা মেয়েদের নয়, সংসারের, সমাজের— তাই এর দায়িত্ব সবার। তবেই মেয়েরা বাইরে-ঘরে সমান তালে অংশ নিতে পারবেন, বেছে নিতে পারবেন নিজেকে পরিপূর্ণ করতে কোন্ শ্রম তিনি চান।

আমাদের গ্রামের মেয়েরা কি শিক্ষা আর পারিবারিক আয় যথেষ্ট থাকলে কাজে যোগদানের 'ইউ' রেখায় চেপে স্বেচ্ছায় নিচে নেমে আসছেন? মেয়েরা ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে গেলে সমাজে পুরুষ আধিপত্যের দাপট যে বাড়ে তা অনস্বীকার্য, আরো বাড়তে পারে জাতপাত ধর্মীয় সংকীর্ণতার পরিবেশ। মায়েরাই শিশুর শিক্ষক, ফলে আশঙ্কার ক্ষেত্রটি বিস্তৃতও হয়। আপাতত এই সমস্যাকে মেনে নিয়েই কি আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

তথ্যসূত্র :

1. Neff, D.K. Senand V Kling (2012) : "The Puzzling Decline in Rural Women's Labour Force Participation in Indian : A Re-Examination", Working Paper No. 196, German Institute of Global and Area Studies
2. Missing Labour or Consistent "De-Feminisation"? Vinoj Abraham; August 3, 2013, Economic and Political Weekly
3. Goldin, C (1995): "The U-shaped Female Labour Force Function in Economic Development and Economic History" in T P Shultz (ed), *Investment in Women's Human Capital and Economic Develpoment* (Chicago : University of Chicago Press), 61-90
4. Report of the International Seminar on "TOWARDS MAINSTREAMING TIME USE SURVEYS IN NATIONAL STATISTICAL SYSTEM IN INDIA, 24-25 MAY, 2007, Ministry of Women and Child Development, Govt of India

প্রবন্ধ

অসংগঠিত ক্ষেত্রের নারী শ্রমিক

তপতী চ্যাটার্জী

ভারতের শ্রমজীবী জনতার অধিকাংশটাই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে (৯৪%)। নারীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশই কাজ করেন ঘরের মধ্যে— গৃহশ্রম, যা থেকে অর্থ উপার্জন করা যায় না। গ্রামের সাবালিকা মেয়েদের অর্ধেক আর শহরের এক-পঞ্চমাংশ ঘরের বাইরে কাজ করেন। তাদের বিপুল অংশই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

২০০৭ সালের এনএসএসও রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে কাজ করেন কর্মরত নারীদের ৭৩ শতাংশ, অকৃষি ক্ষেত্রে কাজ করেন এই নারীদের ২৭ শতাংশ।

কৃষি ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক

প্রথমে আমরা শুরু করব কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত নারীদের নিয়ে।

ভারতের কৃষিক্ষেত্রের সাথে যুক্ত প্রায় ১০ কোটি নারী শ্রমিক। এই নারী শ্রমিকরা দারুন মজুরি-বৈষম্যের শিকার। পুরুষেরা নারীদের তুলনায় ১.৪ গুণ বেশি মজুরি পায়। অবশ্য অঞ্চল হিসাবে মজুরির পার্থক্য হয়, এই অনুপাতও পাল্টে যায়। এই মজুরি কোথাও অর্থ হিসেবে, কোথাও অর্থ ও শস্য হিসাবে দেওয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে অসংগঠিত নারী শ্রমিকরা বপন, রোপন, নিড়ানি, ফসল কাটার কাজ করেন। লাঙ্গল দেওয়ার কাজটায় পুরুষদের একাধিপত্য। আধুনিক যন্ত্র যেমন ট্রাক্টর ইত্যাদি চালানোর কাজেও পুরুষদের একাধিপত্য। লিঙ্গভিত্তিক এই শ্রমবিভাজন নারীদের বিরুদ্ধে যায়। কারণ লাঙল দেওয়া বা ট্রাক্টর চালানোর চেয়ে রোপন বা নিড়ানির কাজে পিঠ বেঁকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়। অথচ মজুরি শুধু নয়, সম্মানও এসব কাজে অনেক কম। এছাড়াও মাছ ধরা ও প্রক্রিয়াকরণ, পশুপালনেও নারী শ্রমিকের শ্রম ব্যবহার হয়।

এই নারী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা মর্মান্তিক। গ্রামের গরিব ও পশ্চাৎপদ অংশের নারীরা কৃষিমজুরের কাজ করে থাকেন। এদের বেশির ভাগেরই অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। বেশির ভাগই তফসিলি জাতি, উপজাতির মানুষ। নিদারুন দারিদ্র্য ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে এই নারীদের কাজ করতে হয়। খরাপ্রবণ অঞ্চলে, অতি-বৃষ্টির অঞ্চলে কম মজুরিতে কাজ করতে হয় পুরুষদেরই মতো। কৃষিতে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে কৃষিশ্রমিকদের মজুরি কমছে। ফলে বহু শ্রমিক (নারী ও পুরুষ) কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করতে চলে গেছে। এইভাবে সঙ্কোচন ঘটে চলেছে কৃষিক্ষেত্রে।

কৃষিক্ষেত্রে কাজ কত দিন পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশের কৃষি মূলত প্রকৃতি-নির্ভর। ভালো আবহাওয়া পাওয়া গেলে ভালো কাজ পাওয়া যায়, নয়তো নয়। স্বাভাবিকভাবে, নারী শ্রমিককেও এই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা আরো বেশি। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৩-৯৪ সালে পুরুষরা গড়ে ২২৪ দিনের কাজ পেয়েছে, আর মেয়েরা পেয়েছে ১৯৬ দিনের কাজ। এই সংখ্যাটা আরো কমে ২০০৪-০৫-এ দাঁড়িয়েছে পুরুষদের ক্ষেত্রে ২০৯ দিন, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮৪ দিন। এ রাজ্যের ২৪ পরগনার আদিবাসী সাঁওতাল মেয়েরা অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের কাছে বলেন যে, অনেক সময় ২৫ টাকা মজুরিতে তাঁদের অর্ধেক দিন কাজ করতে হয়েছে। ১০০ দিন কাজের সরকারি প্রকল্পে এই অবস্থার সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে।

এই অদৃশ্য বেকারির হাত থেকে মুক্তি পেতে এই নারী শ্রমিকরা দূরে দূরে কাজ করতে যেতে বাধ্য হন। মহাজনের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। অনেক সময় বাঁধা শ্রমিকে পরিণত হন। নারী পাচারের ভিত্তিও এই বেকারি। কাজের লোভ দেখিয়ে মেয়েদের শহরে নিয়ে গিয়ে গণিকাপল্লীতে বেচে দেওয়া হয়।

কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অধিক প্রচলন ও অধিক যান্ত্রিকীকরণের ফল নানা স্বাস্থ্যগত ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিতে বাধ্য হন এই শ্রমিকরা। প্রতি এক লক্ষ কৃষিশ্রমিকের (নারী ও পুরুষ) মধ্যে প্রতি ২২ জন এমনভাবে আহত/অসুস্থ হচ্ছেন, যাতে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে।

এই যে নারী শ্রমিকদের কথা বলছি তাদের মধ্যে আছে নাবালিকারাও, যাদের বয়স ৫-১৪। এই নাবালিকাদের মধ্যে নিজেদের জমিতে কাজ করেন ৬৫.৮ শতাংশ, আর বাকি ৩৪.২ শতাংশ হলেন মজুরি-শ্রমিক। তাদের মধ্যে আবার সম্পূর্ণ শ্রমজীবীর কাজ করছেন ৬৫.৬ শতাংশ, আর বাকিরা সহায়কের ভূমিকায়।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমায় সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালাতে আমরা নারী কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছি সেগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরছি।

চাষি পরিবারের মেয়েরা বাড়ির পুরুষদের সাথে চাষের সমস্ত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আর যেখানে খেত মজুর হিসাবে কাজ করেন সেখানে তাঁরা পান দৈনিক ১৫০ টাকা, যদিও পুরুষদের ক্ষেত্রে মজুরি ১৭০ টাকা। যে চাষি পরিবারের জমির পরিমাণ খানিক বেশি, তারা কাছাকাছি ইটভাটায় কাজ করা আদিবাসী নারী-পুরুষদের দিয়ে ফুরনে কিছু কিছু কাজ

করিয়ে নেয়। এই অঞ্চলের নারী শ্রমিকরা যখন চাষের কাজ পান না তখন তাঁরা জরির কাজ, বাজারে শাকপাতা বিক্রির কাজ করে কিছু রোজগার করে থাকেন। পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও এই সময় প্রায়ই বাইরে অন্য কাজ করেন, অনেকে আবার দিল্লী-বোম্বে চলে যান রোজগারের চেষ্টায়। নারীদের আর একটি কাজ, গরু-ছাগল পোষা আজকের দিনে চারণভূমির অভাবে ও কীটনাশকের কারণে অলাভজনক হয়ে পড়ছে। একটি গ্রামে ২০০টি পরিবারের ওপর সমীক্ষা করে দেখা গেল, মাত্র ৪টি পরিবারের গরু আছে। গরু না থাকার ফলে দুধ, জৈব সার, ঘুঁটে ইত্যাদি পাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে সমস্যার মোকাবিলা করতে জেরবার হয়ে যাচ্ছেন পরিবারের মেয়েরা।

কৃষকদের জন্য চালু করা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা নারীরা পান না, কারণ জমির মালিকানা সাধারণত তাদের হাতে নেই। ফলে প্রয়োজনে তাঁদের মহাজনের কাছেই হাত পাততে হয়।

গ্রামের যে নারীরা উপার্জনশীল 'শ্রমিক' নন, তাঁরাও কিন্তু অনেক কৃষিকাজ করে থাকেন। নিজের ছোট্ট জমিতে চাষ করার পাশাপাশি পশুপালন করে, কাঠকুটো শাকপাতা এনে সংসার প্রতিপালন করেন তাঁরা। এইসব কাজের বিনিময়ে কোনো মজুরি পান না এঁরা। পান না কোনো স্বীকৃতিও।

কৃষিতে নারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে বছরে একজন পুরুষ কাজ করেন ১২১২ ঘণ্টা, সেখানে সাধারণত সহায়ক ভূমিকায় কাজ করলেও একজন নারী কাজ করেছেন ৩৪৮৫ ঘণ্টা (যোজনা, জুন, ২০১২)।

অকৃষি ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক

এবার আসি অ-কৃষি ক্ষেত্রের নারী শ্রমিকদের কথায়। এদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, মজুরি-শ্রমিক। দুই, স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী। তিন, ঘরে বসে যারা কাজ করেন।

অসংগঠিত অ-কৃষিক্ষেত্রের মোট নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২.২ কোটি। তাদের মধ্যে স্বনিযুক্ত হিসাবে কাজ করেন ১.১ কোটি । নারী মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা ৬৬ লক্ষ। ঘরে বসে কাজ করেন ৪৮ লক্ষ। (১৯৯৯-২০০০, অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট)

এই শ্রমিকদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। নিয়মিত ও অনিয়মিত। নারী মজুরি-শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক অনিয়মিত। নিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে তফশিলি জাতি ও উপজাতির নারীদের উপস্থিতি কম।

এই নারী শ্রমিকরা কোন্ কোন্ শিল্পে বেশি নিযুক্ত? মজুরি-শ্রমিক হিসাবে নারী শ্রমিকরা বেশি নিযুক্ত হন নির্মাণ শিল্পে, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ও গৃহ-পরিচারিকা হিসাবে। এদের প্রায় সবাই কায়িক শ্রম দিয়ে থাকেন। নিয়মিত নারী মজুরি-শ্রমিকদের অর্ধেকেই নিয়োজিত গৃহ-পরিচারিকা হিসাবে।

কী ধরনের জায়গায় কাজ করেন এই সব মেয়েরা?

শ্রমিক নারীদেরও যেহেতু গৃহস্থালির দায়িত্ব থাকে, বাচ্চাদের দেখাশোনার সমস্যা থাকে, তাই তাদের বাইরের কাজ করা অসুবিধাজনক, দূরে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। অনেক নারীই তাই কাজ করেন নিজের বা মালিকের ঘরে। গ্রাম-শহর মিলিয়ে নিজের ঘরের সীমানার মধ্যে কাজ করেন ৫৪ শতাংশ নারী শ্রমিক।

ঘরে কাজ করার সমস্যা হলো, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয় না। ফলে কাজের সুরক্ষা থাকে না। ন্যূনতম মজুরি আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কাজের জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়, অথচ ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না। আবার পরস্পরের থেকে বিযুক্ত থাকার কারণে এরা সংগঠিত হতেও পারেন না।

কতখানি কাজ করেন এই শ্রমিক-নারীরা?

ঘরে বসে যারা কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে কাজের সময় নির্ভর করে মরসুমের ওপর। পুজো বা ঈদের আগে যেমন কাজ বেড়ে যায়, অন্য অনেক সময় কমে যায়, বা আদৌ কাজ পাওয়া যায় না। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে, ঘরে বসে যে নারীরা কাজ করেন তাঁদের দৈনিক কাজের গড় সময় হলো ৭ ঘণ্টা, মরসুমের বাইরে সময়টা কমে যায়। বলা বাহুল্য, এই কাজের পাশাপাশি গৃহস্থালি কাজও করে যেতে পারে।

ঘরে কাজ করলে কাজ হয় পিস-রেটে। তাতে শোষণের হার বেশি থাকে। মরসুমের সময় অতিরিক্ত ঘণ্টা কাজ করলেও ওভারটাইম মেলে না। আবার কাজে ভাটা চললে শ্রমিকের আয় কমে যায়, কখনো তা শূন্যে এসে নামে। কাজের জায়গা, বিদ্যুত, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি জনিত খরচ করতে হয় শ্রমিককেই। কখনো কখনো প্রযুক্তির পরিবর্তন হলে তার জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়ার দায়িত্ব ও খরচও শ্রমিককেই বহন করতে হয়। এসবের ফলে প্রকৃত মজুরি কমে যায়। তার ওপর, অনেকটাই যায় কনট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টরের পকেটে। এই মেয়েদের ৭৯ শতাংশই এভাবে অতিরিক্ত শোষিত হন। সাধারণত এই কাজে আবার অগ্রিম দেওয়ার চলন নেই। বরং টাকা বাকি ফেলে রাখাটাই দস্তুর।

নারীদের মজুরি কেন পুরুষদের সমান হবে না? এর উত্তরে বলা হয়, নারীদের দক্ষতা কম। বিভিন্ন শিল্পকাঠামোতে দেখা যায়, মেয়েদের স্থান সবচেয়ে নিচে। ফলে তাদের মজুরিও সবার নিচে। নারীদের যতই অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, যোগ্যতা থাকুক না কেন, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না। বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য পোষাকশিল্প নারীশ্রমের ওপর নির্ভরশীল, একথা সবাই জানি। কিন্তু সেই শিল্পে নারীরা মেশিনে যন্ত্রের মতো সেলাই করে যান, সুপারভাইজারের কাজ পুরুষদের। আর যদি বা কখনো নারী সুপারভাইজার থাকেও, সেখানে শ্রমিকরা অবশ্যই হবে নারী-শ্রমিক। পোষাকে সূচিশিল্প বা বিড়িশিল্পে দেখা যায় যে

পুরুষ ও নারীর কাজ একই দামে বিক্রি হয়, কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে নারী পান কম মজুরি। ইটভাটায় মাটি ছানার কাজটা করেন মেয়েরা, এর ওপরই নির্ভর করে ইটের গুণমান। কিন্তু এই নারী শ্রমিকরা মজুরি পান ন্যূনতম মজুরিরও কম।

এবার স্বনিযুক্ত নারীদের কথা বলি। এদের মধ্যে দুটি ভাগ। একদল নিজের শ্রম বা তার সাথে পরিবারের অন্যদের সাহায্য নিয়ে কাজ করেন। স্বনিযুক্ত নারীদের ৫৩ শতাংশ এই দলের। আর এক অংশ স্বনিযুক্ত নারী মজুরি-শ্রম নিয়োগ করে কাজ করেন।

এই নারীরা মূলত নিজেদের সামান্য মূলধনের ভিত্তিতে কিছু অর্ডার নিয়ে এসে কাজ করেন— নিজে ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে, অথবা মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করে। পুঁজি কম বলে এদের আয়ও কম। গ্রামের ক্ষেত্রে পুঁজির পরিমাণ সাধারণত আরও কম।

এবার আমরা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করব।

বিড়ি শ্রমিক

সংখ্যার দিক দিয়ে দেখলে এ রাজ্যে অ-কৃষি ক্ষেত্রে অসংগঠিত নারী শ্রমিকদের মধ্যে বিড়ি শ্রমিকরা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

এ রাজ্যের মোট ১৯টি জেলায় বিড়ি শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী— ৭০ শতাংশ। এদের সংখ্যা ১৫ লক্ষাধিক। সবচেয়ে বেশি নারী বিড়ি শ্রমিক মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রায় ৭ লক্ষ। মালদহে প্রায় আড়াই লক্ষ। মজুরি সাধারণত পিস-রেটে। কোথাও হাজার বিড়ি বেঁধে ৮০ টাকা, কোথাও ৬০ টাকা। সর্বত্রই পুরুষদের মজুরি মেয়েদের তুলনায় বেশি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিড়ি শ্রমিকদের মান উন্নয়নের জন্য ২০০৭ সালে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প চালু করেছেন। বিদ্যুতায়নের জন্য ২৫০০ টাকা। গৃহনির্মাণের জন্য কেন্দ্রের ৪০০০০ টাকার পাশাপাশি রাজ্যের অনুদান ১০০০০ টাকা। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য শ্রমিক প্রতি ১০০০০ টাকা। কিন্তু বাস্তব কী বলছে? মুর্শিদাবাদ জেলার ৭ লক্ষ নারী বিড়ি শ্রমিকদের কয়েকজনের কথা তুলে ধরলে প্রকৃত অবস্থার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

বসুমতী দে। বয়স ৪৬। গ্রাম মাসলা। থানা ভরতপুর। কাজ করছেন ১৪ বছর বয়স থেকে। দৈনিক ৫০০ বিড়ি বেঁধে ৪০ টাকা পান। বর খেতমজুর। কাজ অনিয়মিত হওয়ায় মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বিড়ি বাঁধায় সাহায্য করেন। বসুমতী নিরক্ষর। মেয়েদের ৫-৬ ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছেন। ''বসে বসে কাজ করে শরীর জমে গেছে। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। হাঁফের টান শুরু হয়েছে।'' ২-৩ দিন অন্তর ৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে কাজ দিয়ে ও নিয়ে আসতে হয়। সরকারি সুযোগসুবিধা তেমন কিছু পান নি। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের কার্ড অবশ্য হয়েছে।

কোহিনূর বিবি। বয়স ৪৮। গ্রাম পাঁচথুপি। থানা বড়এঞা। ৩০ বছর ধরে এই কাজে যুক্ত। দৈনিক ৪০০-৫০০ বিড়ি বেঁধে ৩০ টাকা মতো রোজগার। একটু-আধটু পড়তে পারেন। ভবিষ্যনিধি কার্ড আছে। স্থানীয় নারী বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন করছেন।

জমিরুল বিবি। বয়স ৫৮। বিড়ি বেঁধে দৈনিক ৪০-৪৫ টাকা রোজগার করেন। সরকারি কার্ড আছে। সুযোগসুবিধা কিছুই পান নি। উপরোক্ত সংগঠনে ইনিও যুক্ত হয়েছেন। একটু বয়স হতেই হাঁফানির টান শুরু হয়ে গেছে। মাটির বাড়ি। বৃষ্টি হলে বাইরের থেকে ঘরেই বেশি জল পড়ে।

এই জেলার নারী বিড়ি শ্রমিকদের অধিকাংশেরই চিত্র একইরকম। অধিকাংশই ধর্মে মুসলমান।

তবে কান্দী ব্লকে মোট ৭০ জন বাড়ি তৈরির জন্য ২৫০০০ টাকা পেয়েছেন। অনেকেই চেষ্টা করছেন। তবে সরকারি স্তরে জটিলতার জন্য টাকা পাচ্ছেন না।

উত্তর ২৪ পরগনায় হাসনাবাদ থানার বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, সংগঠন শুরু হয় পুরুষ শ্রমিকদের নিয়ে। পরে কিন্তু নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে ৭০ শতাংশ। এখানে নারী শ্রমিকদের মজুরি হাজারে ৮২ টাকা, যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি ১০২ টাকা— যেখানে সরকারি ন্যূনতম মজুরি ১৭৫.৩০ টাকা। গ্রামের দিকে কিছু বড় বড় কোম্পানির মজুরি আরো কম, কিন্তু তারা ইএসআই-পিএফ-পেনসন-এর সুবিধা পায়। যাদের হাত খুব দ্রুত চলে তারা দিনে দেড় হাজার পর্যন্ত বিড়ি বাঁধতে পারেন। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিড়ি বাঁধার গতি কমে যায়। পাতা ভালো হলে বিড়ি তৈরির হার বেড়ে যায়। রাতের বেলা পাতা কেটে জল ছিটিয়ে ভাঁক দিয়ে রাখে, যাতে পাতা নরম হয়- বিড়ি বাঁধার হার বাড়ে। এ কাজটা প্রায়শ পুরুষরা করে থাকেন। অনেক বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েরা সুতো বেঁধে সাহায্য করে। তবে মূল কাজটা করেন বাড়ির মেয়েরা।

এই কাজ যাঁরা করেন তাদের মধ্যে হাঁপানি ও টিবি রোগ বেশি দেখা যায়।

ভূমিহীন ঘরের গরিব মেয়েরা সাধারণত বিড়ি বাঁধেন। তাঁদের এই উপার্জনটুকু সংসারে অপরিহার্য। পুরুষরা খেতের কাজ না থাকলে সাধারণত দূর দূর চলে যান কাজ করতে।

২৪ পরগনার নারী বিড়ি শ্রমিকরা সরকারি বাড়ি তৈরির প্রকল্পের টাকা দু-চারজন ছাড়া অন্যরা পান নি।

জরি শ্রমিক

হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম একটি কুটির শিল্প হলো জরি শিল্প। এ রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জরি শ্রমিক রয়েছেন। গোটা দেশে

২ কোটির বেশি। এই শ্রমিকদের একটা বড় অংশ হলেন নারী ও শিশু শ্রমিক।

আমাদের দেশে মুসলমান আমলে জরি শিল্পের জোয়ার আসে। তবে কলকাতায় জরি শিল্পের প্রসার হয় ১৯৫৭ সাল নাগাদ। ঐ বছরে লক্ষ্ণৌয়ের এক ব্যবসায়ী কলকাতায় জরির কাজ প্রথম শুরু করেন। হাওড়া জেলার কিছু মানুষ এই কাজ প্রথম শেখেন। এরা আবার নিজেদের গ্রামের কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কারিগর বানান, আর তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে মুনাফা লুটতে থাকেন। ১৯৭০ সাল নাগাদ সোনা রূপার বদলে প্লাস্টিকের ওপর রঙ করে জরির কাজের জিনিস তৈরি হলো। এই সস্তার জরির কাজ দারুন জনপ্রিয়তা পেল। উত্তরপ্রদেশে আবার রঙিন ভাঙা চুড়িকে ফুটো করে জরির কাজে ব্যবহার করা হতে লাগলো। এখন তাই জরির কাজ অনেক সস্তা। সব ধরনের কাপড়েই এ কাজ হয়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যেও এর ব্যবহার হচ্ছে। আবার অন্যদিকে গ্রামের কারিগরের কাজ কলকাতা হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বিদেশেও। এ নিয়ে যারা ব্যবসা করেন তাদের মুনাফা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু জরিশ্রমিকরা? তাদের জীবন কীরকম?

জরিশিল্পীদের জীবন শুরু হয় সকাল ৭টা নাগাদ। শেষ হয় রাত ১১টায়। মাঝে খাবারের আর চা খাবার ফাঁক থাকে। শ্রমিকের বাসগৃহের একটিমাত্র ঘরেই খাওয়া শোওয়ার পাশাপাশি চলে কাজ। অবশ্য পুরুষ শ্রমিকরা কেউ কেউ কারখানায়ও কাজ করেন।

জরি শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক। এদের প্রায় সবাই-ই ঘরে কাজ করেন। নারী জরি শ্রমিকদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত, যদিও অল্পবয়সী মেয়েরা কিছুটা পড়াশোনা করেছে। কেউ কেউ আবার জরির কাজ করে পড়াশোনা করছে, বা ছোট ভাইবোনদের পড়াচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গরিব পরিবারের নারী শ্রমিকদের রোজগারের টাকা সংসারের অভাব অনটন মেটাতেই খরচ হয়ে যায়।

গর্ভবতী মেয়েরাও কাজ করে চলেন, নইলে সংসার চলবে না। যে সব নারীশ্রমিক বহুদিন ধরে জরির কাজ করছেন তাদের শারীরিক সমস্যাও দেখা যায়। চোখ, ঘাড় ও কোমরে খুব চাপ পড়ে। তার ওপর দুশ্চিন্তা, সারাবছর কাজ থাকেনা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, অনেক জায়গায় নারীশ্রমিকই জরির কাজ বেশি করেন। পুরুষরা হয়ত চাষবাস করেন, বা কাজ না থাকলে দিল্লী-মুম্বাই চলে যায়। নারীরা ঘরে বসে জরির কাজ করে চলেন। সারাদিন কাজ করে এঁরা সপ্তাহে ২৫০-৩০০ টাকা রোজগার করেন। যাদের নিজেদের ঢাড্ডা (জরির কাজ করার জন্য কাঠামো) থাকে না তারা আবার মাসে ৩০-৫০ টাকা ভাড়ায় বাঁশের ঢাড্ডা নিয়ে নেন। সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে চলে কঠোর পরিশ্রম।

জরি শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে মূলত মহাজন বা গদিওয়ালা। তার নিচে ওস্তাগর। মহাজনরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কাজ দেয় না বা মন্দার অজুহাতে কম মজুরি দেয়। শক্তিশালী ও শ্রমিকস্বার্থবাহী ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় মহাজনদের খুব সুবিধে।

এখন জরি শিল্পে এসে গেছে মেশিন। তার ফলে যারা হাতে কাজ করেন তাদের ওপর প্রতিযোগিতার চাপ পড়ছে। জরি শিল্পের উপাদানগুলিতেও এখন বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি ঢুকে পড়েছে।

গৃহ পরিচারিকা

গৃহ পরিচারিকারা দুধরনের। একদল নিজের ঘরে থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মজুরির বিনিময়ে অন্যের বাড়িতে গিয়ে গৃহকর্ম করে দেন। অন্য অংশটি অন্যের গৃহে থেকে কাজ করেন। এই দ্বিতীয় ধরনের নারী ও শিশু গৃহ পরিচারিকারা গৃহছাড়া জনতার একটা বড় অংশ। এই শ্রমিকরা ভীষণভাবে শোষিত হয়। এঁদের কোনো নিজস্ব ঘর নেই, নিজস্ব সময় নেই, নেই নিজের সংসারে থাকার সুযোগ। শ্রম আইনের কোনো সুযোগ এরা পান না। অন্যের গৃহে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই অন্যায় ব্যবহার, এমনকি মারধোর ও ধর্ষণেরও শিকার হন।

অনেকসময় এঁদের অনেক দূরে গিয়ে কাজ করতে হয়। ক্যানিং বা গোবরডাঙা থেকে কয়েক ঘণ্টার ট্রেনজার্নি, তারপর হাঁটা। এইভাবে কাজের জায়গায় পৌঁছানো। প্রতিদিন। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। কোনো ছুটি নেই। কামাই করলে গালাগাল তো আছেই, মাইনেও কাটা যেতে পারে। কাজের স্থায়ীত্ব নেই, মর্যাদা তো নেই-ই। সমীক্ষায় দেখা গেছে ১২টি বড় বড় শহরে ৭৮ শতাংশ গৃহশ্রমিকই নারী। প্রতিটি বড় শহরে গৃহপরিচারিকার চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী শ্রমিকরা ঘর ছাড়ছেন। এদের বেশির ভাগ দরিদ্র ও নিরক্ষর। নিরক্ষরতা ও অদক্ষতার কারণে এরা সহজেই শোষণের শিকার হন। এই পরিচারিকাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতিই নেই। তাই শ্রমিকদের যে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, ন্যূনতম মজুরি, কাজের সুরক্ষা, সাপ্তাহিক ছুটি, ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, বার্ধক্য ভাতা, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি, কাজের মধ্যে দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ— এসবের কিছুই মেলে না এদের। সম্প্রতি যদিও সরকারিভাবে এদের শ্রমিক বলে স্বীকৃতি মিলেছে, তাতে বাস্তব অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন নির্মাণ শিল্প, পরিবহন, কৃষি ক্ষেত্র, বিড়ি শিল্পে কিছু কিছু বিশেষ প্রকল্প নিয়েছেন, গৃহ পরিচারিকারা তা থেকে বঞ্চিত।

গৃহশ্রমিকদের জন্য একটা বিল ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালে এলেও তা আটকে গেছে। ভারতে গৃহ পরিচারিকার সংখ্যা ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে ২০ শতাংশের বয়স ১৪-র কম। কোনো কোনো রাজ্যে, যেমন মহারাষ্ট্র বা কর্নাটকে, আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ন্যূনতম মজুরি

নির্ধারণ হয়েছে। যদিও সেই মজুরিতে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন, যেমন পরিবারের খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের সমস্যা মেটে না। মনে রাখতে হবে, নারী হলেই তার আয় পরিবারের বাড়তি আয় হবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে গৃহ পরিচারিকাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই তার আয়ই সংসারের একমাত্র বা প্রধান আয়ের উৎস।

বৃহৎ এই কর্মক্ষেত্রটির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মর্যাদা ও কাজের অধিকারকে স্বীকৃতির দাবিতে সম্প্রতি কোথাও কোথাও ইউনিয়ন গড়ে উঠছে।

নোনাডাঙার ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, বড় বড় শহরের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের সেবার জন্য ভিটে ছেড়ে আসা এই মানুষগুলির এই লন্ডন হতে চলা শহরে কোথাও ঠাঁই নেই। তুলে দেওয়ার হুমকি সহ তাদের বাস কোথাও কোনো বস্তিতে, কোথাও ঝুপড়িতে। সর্বদাই অসুরক্ষিত তাদের বাঁচা।

এক পরিচারিকার জীবনের কাহিনী শোনাই।

নাম অনিতা মাঝি। বয়স ৪২ বছর। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার এক গ্রামে। আগে কাজ করত গ্রামেরই এক স্বচ্ছল পরিবারে। ওর বর যখন দুই সন্তান ও শাশুড়িকে অনিতার ঘাড়ে চাপিয়ে অন্য সংসার পাতে তখন পরিবারের মুখে খাদ্য যোগাতে প্রতিদিন কলকাতায় এসে কাজ করার শুরু। রাত ৪টায় বেরিয়ে হেঁটে ট্রেন ধরে ৬টার পর পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কাজ শুরু। বিকেলবেলা ফিরতি ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরা। রোজগার মাসে হাজার চারেক টাকা। সমীক্ষক জানতে চান, এই কষ্ট না করে শহরে বাসা নিচ্ছে না কেন? গ্রামেও তো ওর ভাড়ার ঘরেই থাকা। অনিতা বলে, ওখান থেকে আসতে পারবে না। যদি ওর বর কখনও ফিরে আসে!

ইট ভাটা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫ হাজার ইটভাটা। শ্রমিকের সংখ্যা ১০ লক্ষ। এক বসিরহাটেই ইটভাটার সংখ্যা ২৫০, আর শ্রমিক ৫০ হাজার।

এইসব ইটভাটায় কাজ করতে আসেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে নয়, বিহার, ঝাড়খন্ড, এমনকি বাংলাদেশ থেকে। কাজ করতে আসেন পুরো পরিবারটাই। নারী-পুরুষ, এমনকি শিশুরাও। টাকা পায় পরিবারের প্রধান। এদের জমি নেই। দালাল বা ঠিকাদাররা ইটভাটার মালিকের কাছে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। সপ্তাহ শেষে টাকা নিতে গিয়ে হয়ত জানতে পারে দালালরা আগাম টাকা নিয়ে গেছে। মজুরি না পেয়ে শ্রমিকরা যাতে চলে যেতে না পারে তার জন্য মালিকের গুন্ডা আছে। সপ্তাহশেষে ১০০-১২০ টাকা দেওয়া হয় কোনোরকমে পেট ভরানোর জন্য। কাজ দিনে ১২ ঘণ্টা, শিশুদের ম্যানেজারের ঘরে বেগার খাটতে হয়। থাকার জায়গা বলতে আলোবাতাসহীন ঘর, তাতে দরজা নেই, খাবার জলের ব্যবস্থাও নেই। দরজাহীন ঘরে মালিকের লোকেরা যখন-তখন ঢুকতে পারে। মেয়েদের ওপর যৌন আক্রমণ হানতে পারে। অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এদের অবশ্য দাস শ্রমিক বলা যাবে না, কারণ তা বিলোপের আইন অনেক দিন পাশ হয়ে গেছে।

আবার এমন ইটভাটাও আছে যেখানে ইউনিয়ন আছে। এখানে দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে কাজ করে। বাংলাদেশের লোকদের এখানে কাজ করতে দেওয়া হয় না। কারণ বাংলাদেশের লোকদের দুর্বল অবস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রচণ্ড কম মজুরিতে কাজ করায়। মেয়েরা সাধারণত কাঁচা ইট তৈরি করা ও বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। পুরুষরা ইট বয় ভ্যানে (মালিকের)— এক-একবারে তারা ১০০ ইট বয়ে আনতে পারে- আর পায় হাজার ইটে ১২৭ টাকা। মেয়েরা ইট বয় মাথায় করে— প্রতিবারে মাত্র ১০টা ইট আনতে পারে— এরা পায় হাজারে ১৪৫ টাকা। ফলে তারা সারা দিনে অনেক কম রোজগার করতে সক্ষম হয়।

মেয়েরা জানালেন, ইউনিয়ন হওয়ার পর থেকে তাদের এলাকা যৌন নির্যাতন বন্ধ হয়েছে। তবে তাদের আক্ষেপ, পুরো পরিবার ইটভাটায় এসে কাজ করার ফলে তাদের সন্তানদের পড়াশোনা হচ্ছে না।

উপসংহার

সরকারি তথ্য বলছে, জাতীয় উৎপাদনের ৬২ শতাংশ, মোট রপ্তানির ৩৯.৩ শতাংশ আর সম্মিলিত জাতীয় সঞ্চয়ের ৫০ শতাংশ আসে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। আর এই অসংগঠিত শ্রমিকদের কমবেশি এক-তৃতীয়াংশই নারী-শ্রমিক। সংখ্যায় তারা ১৩ কোটির বেশি। প্রতিটি কাজেই তাদের মেলে কম মজুরি। ঘরে ও ঘরের বাইরে ভয়ংকর পরিশ্রম, অপুষ্টি, চিকিৎসার অভাব, নিরক্ষরতার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্যদের জন্য, বিশেষ করে সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা আর কখনও বা পরিবারের নিকটজনদের কাছ থেকে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন জোটে উপরি-পাওনা হিসেবে। এ সব কিছুই তাঁদের উপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করে।

সুতরাং দেশের শ্রমজীবীদের উন্নতির কথা ভাবলে এই নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করা আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই শ্রমিকদের সংগঠিত করাটা একটা বড় রাজনৈতিক কাজ। নারী শ্রমিকরা ইউনিয়ন গড়ার ক্ষেত্রে তাদের যেসব প্রধান সমস্যা তুলে আনেন তার সমাধানকল্পে প্রথমত দরকার শিশুদের রাখার জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত দাবি ওঠে যৌথ রান্নাঘরের। সমান মজুরির পাশাপাশি দাবি ওঠে পরিবারের মধ্যে নারীপুরুষের সমতার, কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়ার।

নারীশ্রমিকরা যেহেতু দ্বিগুণ শোষিত হন তাই তাদের এই সব দাবির মধ্যেই থাকে নতুন সমাজের ভাবনা, সাম্যের ভাবনা। তাদের এক পা এগিয়ে যাওয়ার মানে দাঁড়ায় এই ব্যবস্থার কিছুটা বদল, আর অনেকটা বদলের দিকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া।

প্রবন্ধ

নারী ও স্বাস্থ্য

চন্দনা মিত্র

১৯৭৮ সাল। প্রথম চাকরি পেয়েছি রাণাঘাটের নামকরা 'কুপার্স ক্যাম্প' সংলগ্ন 'উইমেন্‌স হোমে'। চিঠি পেয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলাম কুপার্স ক্যাম্পের কর্মরত তরুণ ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, এখানে আসতে গেলে ডাক্তারি ভুলে আসতে হবে, আর রোজ না এলেও চলে। আর তিনি তো থাকছেনই না, মধ্য প্রাচ্যের একটা লোভনীয় মাইনের চাকরি তার প্রায় পাকা।

কাজে যোগ দিলাম। দুই ক্যাম্পের মাঝে এক রেললাইন— দরজাহীন ফটক দিয়ে ঢুকে যেন এসে পড়লাম এক জঙ্গলে। সামনেই একটা টিনের ঘর, জানলাম সেটাই রোগী দেখার বহির্বিভাগ। তারপরেই আগাছা আর বড় বড় গাছের মাঝখানে ছোট ছোট টিনের ঘর— দেশভাগের বলি অনাথাদের মতই হতদরিদ্র অবস্থা তাদের। ছাগলের নাদি বিছোনো বহির্বিভাগে ডাক্তারদের বসার একটি টিনের চেয়ার, একটি টেবিল ছাড়া রোগী দেখার মত কোন পরিকাঠামো নেই। পার্টিশানের ওদিকে কম্পাউন্ডারের ঘর একইরকম, বাড়তি একটা ওষধের আলমারি। শিবিরের সুপার দিদিকে বলে অনেক কষ্টে একটা এক পা ভাঙ্গা বেঞ্চ যোগাড় হল— ইট দিয়ে তাকে খাড়া করে তাতে রোগী পরীক্ষা শুরু করলাম। ডাক্তারদের জন্য বরাদ্দ আবাসনটি একটি অমনই কুঁড়েঘর— তাও আবার হোমের একমাত্র শিক্ষিকা দিদিমণি তাতে বাস করছেন। অগত্যা আমার নিত্য যাতায়াত, মেটিয়াবুরুজ থেকে রাণাঘাট।

এহ্ বাহ্য। চিকিৎসালয়ের জন্য বরাদ্দ ওষুধ তিনমাস ছাড়া যা পাওয়া যায়— একদলা ফাটাছেঁড়া অ্যান্টিবায়োটিক আর জ্বর-পেটখারাপের ট্যাবলেট, কার্মোজাইম মিক্সচার আর আয়রন বড়ি। বুঝলাম ওই ডাক্তার কেন ও কথা বলেছিল।

শিবিরবাসিনীরা প্রায় সবাই কালো কাপড় পরতেন। পরে জেনেছিলাম সাদা থান যা ডোলে দেয় তা কাচবার সামর্থ্য কোথায়— তাই কালো রং করে নেন। শীতে চাদর নেই, বর্ষায় কচুপাতা ভরসা আর গরমে গাছতলা। পেটখারাপ-জ্বর-বদহজম নিত্যসঙ্গী, জন্ডিসও হত। বুড়ি মানুষরা আবার রানাঘাট হাসপাতালে যেতে চাইত না কারণ কষ্ট করে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়েও তারা সেখানে তেমন পাত্তা পেত না। এমন অবস্থায় কারো হাত ভাঙলে যে একটা কাস্ট করেও দেব এমন প্লাস্টার অফ প্যারিসের ডিবে চার বছর ধরে চেয়ে চেয়েও পাইনি সরকারি মেডিক্যাল স্টোরে। গোটা গোটা পুরো কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিকের সরবরাহও পাইনি।

চার বছর ছিলাম, ভরসা ছিল গাছগাছড়ার পাচন আর আকুপাংচার, ধৈর্য্য ধরে তাদের কষ্ট শোনা আর যত্ন করে পরীক্ষা করা। আগে নাকি কোন ডাক্তার কখনও গায়ে হাত দিয়ে দেখেনি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বদলির অর্ডার হাতে নিয়ে এক তরুণ ডাক্তার এসে হাজির, সে অবশ্য কুপার্সের সেই ডাক্তারের পরামর্শই সার বুঝেছিল।

প্রথমে ভাবতাম এসব ঘটছে স্রেফ গাফিলতির কারণে, কিন্তু যত দিন গেছে বুঝেছি এর পেছনে কাজ করছে একটা ধারণা, একে উদ্বাস্তু তায় নারী— সমাজের চোখে যাদের কোনমতে বেঁচে থাকার যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিলেই যথেষ্ট, আর তারাও ওর বেশি পাওয়ার সাহস করে না, তাই এত হেনস্থা। আরও অনেক অবহেলা-বঞ্চনার ঘটনা দেখতে দেখতে ভাবতে শুরু করেছি, একটা জাতি, একটা রাজ্য কিংবা একটা অঞ্চলেরও মানুষের উন্নতির একটা মাপকাঠি নিশ্চিতভাবে তাদের স্বাস্থ্য। বেশিরভাগ নারীপুরুষ কর্মঠ, রোগবালাই কম, যক্ষ্মা, এইড্‌স, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক রোগের প্রকোপ কম, প্রসূতি মৃত্যু, শিশু মৃত্যুর হার কম— এমনটা কোন দেশে হলে বুঝতে অসুবিধা হয় না তারা যথেষ্ট শ্রম দিয়ে কৃষি বা শিল্প গড়ে তুলতে এবং ক্রমান্বয়ে তার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম, এবং এর দ্বারা তাদের উৎপাদন ভাল, তাই মাথাপিছু অর্থ-উপার্জন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য-চিকিৎসাও পর্যাপ্ত জুটবে।

এখন এই স্বাস্থ্যের মাপকাঠি কী? আমার অভিজ্ঞতা বলে, কোনও এলাকার সাধারণ খেটে খাওয়া মেয়েদের চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা। মেয়েরাই মাপকাঠি, কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা, মেয়েরা হলো সব থেকে কম যত্ন পাওয়া মানুষ, যাদের খাদ্য থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শ্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খাদ্য, বিশ্রাম, রোগ হলে অসুস্থতার চিকিৎসা সবই তুলনায় কম, তাই তাদের স্বাস্থ্য সবচেয়ে ভঙ্গুর। কেন বলছি এ কথা? বলছি কারণ চিকিৎসক হিসেবে বাংলার গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের সরকারি হাসপাতাল, শ্রমজীবী বাসিন্দাদের বস্তি, উদ্বাস্তু কলোনি-খালপাড়ে রেললাইন ধারের ঝুপড়িতে রোগী দেখা, আপৎকালীন বিভিন্ন চিকিৎসা শিবির, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির আর ট্রেনে শহরতলি থেকে কলকাতা নিত্যযাত্রী অসংখ্য নিম্নবিত্ত মেয়েকে আমি দেখছি। দেখেছি তাদের হাড়সর্বস্ব শরীরকে পেলবতা দেওয়ার মত মাংসপেশির বড় অভাব, ওজন বড়জোর ৪০ কেজি, চোখের কোল ফ্যাকাশে, কণ্ঠা-চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে, শিরা ওঠা হাত দু'খানি অবিরাম ব্যস্ত—ঘরে বাইরে সংসার সামলানো, মাঠেঘাটে লোকের বাড়ি থেকে শুরু করে অল্প মজুরির হাজার রকমের উপার্জনের

কাজে। সারাদিন কাজের পরে ঘরে ফিরে রান্না করে দুটি মুখে তুলতে গিয়ে সামনে বসে থাকা ক্ষুধাতুর সন্তানদের মুখে আগে তুলে দিয়ে যা রইল তাতেই তাদের ক্ষুধানিবৃত্তি করা। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে-বৌরা অফিস, হাসপাতাল, স্কুলের কাজের পর সংসার সামলে নিজের শরীরপাত করে, অম্বল-রক্তাল্পতা-কোমরের ব্যথায় ভোগে। আমার কথার সমর্থন মিলবে সরকারি কিছু পরিসংখ্যানে। যথা—

* নারীর গড় আয়ু ১৯৫১ সালে ছিল ৩৬ বছর, ২০০৬-এ হয়েছে ৬৬.৯১ বছর

* নিম্নআয়ের নারীর খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ প্রয়োজনের থেকে ৫০০-৬০০ ক্যালোরি কম

* পশ্চিমবঙ্গে নিজ/পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ৫৯.৬৭ শতাংশ নারী, সর্বোচ্চ নাগাল্যান্ড— ৯১ শতাংশ

* বডি-মাস-ইনডেক্স স্বাভাবিকের নীচে (পশ্চিমবঙ্গে) : স্ত্রী-৩৯ শতাংশ, পুং-৩৫.২ শতাংশ

* রক্তাল্পতা ১৫-৪৯ বছর ও গর্ভবতীদের মধ্যে : পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে যথাক্রমে ৬৩.২ শতাংশ ও ৬২.৬ শতাংশ, কেরালায় যথাক্রমে ৩২.৭ ও ৩৩.৭ শতাংশ

খেটে খাওয়া পরিবারগুলোতে এর এক বড় কারণ হল মদ্যপ স্বামী এবং প্রায়শই ছেলের অত্যাচার, যা ক্রমশ শিক্ষিত পরিবারেও ছড়াচ্ছে।

আমি দেখেছি যারা বাইরের কাজে বেরোচ্ছে তাদের সন্তান প্রসবের হার কমেছে নিশ্চিতভাবে— সেটা পরিবার-পরিকল্পনার প্রচারের দ্বারা যত না তার থেকেও কাজ টিকিয়ে রাখার বাস্তব চাহিদা এসব মেয়েদের ঘুরে দাঁড়াবার জোর দিয়েছে, নয়ত ঘরে থাকা মেয়েদের সন্তানের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট বেশি, শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতেই নয়, মায়েদের স্বাস্থ্যের প্রেক্ষিতেও। তাই তো প্রসূতি-মৃত্যুহার এখনও এত বেশি। ইউএনএফপিএ-র সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি ১০ মিনিটে এক গর্ভবতী মা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতায় মারা যায়, প্রতি ১০০,০০০ প্রসবে ২০০ জন মায়ের মৃত্যু হয় (২০১১)— প্রসূতি, প্রসবকালীন অথবা প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে, দুর্ঘটনা বাদে। সমীক্ষা বলছে, যদিও প্রসূতি মৃত্যুর হার কমছে, তথাপি ২০১৫-র 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল'-এর তুলনায় যথেষ্ট ধীর গতিতে। এ বিষয়ে কোন কোন দেশের দ্রুত উন্নতি দেখাচ্ছে যে, 'নিরাপদ মাতৃত্ব' নিশ্চিত করার মোকাবিলায় যখন সরকার একটা নীতিগত ভূমিকা নিচ্ছে— সেটা হল যথেষ্ট সংখ্যায় প্রশিক্ষিত দাই, যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ বজায় রাখা, যথাযথ পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা এবং পরিবারে প্রসূতির যত্ন নিশ্চিত করা— বিশেযত যেখানে গর্ভের জটিলতা আছে— সেখানে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রসূতি মৃত্যুর ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের (১৫ বছরর নীচে) ঝুঁকি বেশি— প্রতি ১৫০ জনে ১ জন। আরও দেখা যায়, যত দারিদ্র্য, সন্তান প্রসবের সংখ্যাও তত বেশি। অর্থাৎ ইউএনএফপিএ-র এই সমীক্ষার পাত্রপাত্রীরা হলো ব্যক্তি নারী/কিশোরী, পরিবার তথা সমাজ, রাজনীতি এবং সরকার, তাদের চেতনা ও জ্ঞান, গণতান্ত্রিক নীতি ও প্রয়োগের সদিচ্ছা।

এদেশে লিঙ্গগত দিক থেকে একটা চার-পাঁচ বছরের মেয়েও নারী এবং আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির কথা মাথায় রেখে তাদেরকে আর 'ফুলের মত আদরণীয় শিশু' বলে হিসেবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কী পরিসংখ্যান আমরা পাই দেখা যাক—

ভারতে—

* প্রতি ২ জনে ১ জন মেয়ে অপুষ্টি বা কম পুষ্টিতে ভোগে

* প্রতি ৬ জনের ১ জন মেয়ে ১৫ বছরের জন্মদিন দেখে না

* ১-৫ বছরের মেয়ের ৭৫ শতাংশ ঐ বয়সের ছেলের থেকে আগে মরে

* প্রতি ৬ জনে একটি মেয়ের মৃত্যু হয় লিঙ্গবৈষম্যের কারণে, ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা থেকে পার পেয়ে গেলেও বিধিবদ্ধ টীকাকরণ করানো হয় না বা অসুখে চিকিৎসা পায় না—ছেলেদের তুলনায়

* ৪ বছরের মেয়ের প্রতি ৪ জনে ১ জনের ওপর যৌন নির্যাতন হয়

* ৫-১৫ বছরের মেয়ে যৌনকর্মীর সংখ্যা ২০ লক্ষ

(সূত্র—ইউএনক্রাই, আমেরিকা)

এ পরিসংখ্যানে বিশ্বাস না করে উপায় নেই কারণ, পথশিশুদের কথা বাদই যদি দিই, সাধারণ বস্তিবাসী থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত পরিবারে শিশুকন্যাদের খসখসে চামড়া, পেটে কৃমি, ঠোঁটের কোণে ঘা, উচ্চতা আর ওজন দুই-ই কম এবং বুদ্ধিবৃত্তি আর স্মরণশক্তির ঘাটতি আমাদের প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা।

কিশোরীদের জীবন তো আরও জটিল আর সংকটপূর্ণ, এবং তাদের স্বাস্থ্যে তার প্রতিফলনও পূর্ণমাত্রায় দেখতে পাই। একদিকে তার বয়ঃসন্ধি, ঋতুচক্র দাবি করে শারীরিক-মানসিক যত্ন আর পুষ্টি, অন্যদিকে বেশিরভাগ পরিবারে তখন তার স্থান নিশ্চিতভাবে দাদা-ভাইদের নিচেই শুধু নয়, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কাজ থেকে শুরু করে খাদ্যবণ্টন, সেবাযত্ন এসবের দায়দায়িত্বও তাকে বইতে হয়। তাই তো আমরা সাধারণভাবে স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েদের (উচ্চমধ্যবিত্ত বা ধনী বাদে) দেখি রোগা পাতলা, ফ্যাকাশে চেহারার, একটু পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়তে, অম্বল-মাথাধরা, মূত্রাশয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা, মাসিকের যন্ত্রণা এবং মানসিক উদ্বেগে ভুগতে।

আজ গোটা দেশজুড়ে এই বয়সের মেয়েদের একটা বড় সমস্যা হল অল্পবয়সে বিয়ে। পরিসংখ্যান বলছে ৪৮ শতাংশ

বিবাহিত নারীর ১৮ বছরের নীচে সঙ্গমের অভিজ্ঞতা আর প্রতি ৫ জনে ১ জন মেয়ের ১৫ বছরের নীচে বিয়ে হয়ে থাকে। নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে মানে এ দেশের সংস্কার অনুযায়ী রাতারাতি একটি কিশোরী মেয়ের শ্বশুরবাড়ির বয়স্কা মহিলাদের গোত্রভুক্ত হয়ে পড়া এবং যথারীতি সকলের শেষে ঝড়তি-পড়তি খাবার দিয়ে খাওয়া সারতে বাধ্য থাকা। এর অব্যবহিত পরেই গর্ভধারণের পালা এবং অপুষ্ট শরীরের অপুষ্ট অঙ্গে একটি প্রাণকে লালন করতে গিয়ে সব থেকে বড় ঝুঁকি বহন করা। গ্রামাঞ্চলে আর শহরের বস্তি অঞ্চলে রোগা পাতলা, ফ্যাকাশে চেহারার কিশোরী, মাথায় সিঁদুর, কোলে বাচ্চা এখন খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। অপুষ্ট মায়ের কোলে অপুষ্ট শিশু। শিগগিরই তাদের মুখের সে উচ্ছলতার জায়গা নেয় খাবারে-যত্নে টান পড়ার দুশ্চিন্তা। কচি মায়ের শরীর ভাঙতে দেরি হয় না।

এই বয়সের অবিবাহিতা মেয়ে বাবা-মার জীবনের কাঁটা, তাকে বসিয়ে খাওয়াতে বড়ই অশান্তি, যতই সে সংসারে শ্রম দিক, সে তো আর ছেলে নয়। এই বয়সের কত যে মেয়ে কাজ পাবার ঝুঁকি নিতে গিয়ে পাচার হচ্ছে বেশ্যালয়ে তার ঠিক নেই। সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রতি বছর ৫০০,০০০ শিশু-কিশোরীকে ছলে বলে এই কাজে ঢুকতে বাধ্য করা হচ্ছে। সংখ্যাটা এতই বেশি যে তাদের বঞ্চনা জনিত স্বাস্থ্যের করুণ অবস্থাটা গোটা দেশের হিসেবের মধ্যে ধরতেই হয়।

এখন দেশের বিরাট সংখ্যক মেয়ে যদি এভাবে অপুষ্টি অযত্নের মধ্যে দিয়ে বড় হতে থাকে তাহলে তার পরবর্তী জীবনে এর ছাপ পড়বেই এবং তারা অসুস্থ, অশক্তদের তালিকায় নাম লেখাবে এবং দেশের নারীসমাজের একটা বড় অংশ দুর্বল এবং রোগপ্রবণ হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতের মত একটা বিশাল এবং সমৃদ্ধ দেশে নারীর স্বাস্থ্যের কেন এত করুণ ছবি? এর কি কোন প্রতিকার করা যায় না? ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে, বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ যার ২১.৯ শতাংশ দারিদ্র্য সীমারও নীচে (২০১১-১২-র যোজনা কমিশন এর মতে আগের বছরগুলি থেকে এই সংখ্যা যথেষ্ট কম, যদিও গ্রামের মেয়েদের অভিযোগ, প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি, এবং সমীক্ষার প্রশ্নগুলি ইচ্ছাকৃত এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সংখ্যাটা কমই দেখায়, যেমন যদি পরিবারে কারও মোবাইল থাকে তাহলেই সে পরিবার দারিদ্রসীমার উর্ধ্বে বলে নম্বর বসানো হচ্ছে) সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর হীনস্বাস্থ্যের একটা বড় কারণ দারিদ্র্য, যার মূলে আছে অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন বা চাহিদাগুলির মেটানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত অসাম্য।

অন্যদিকে মেয়েদের হীন স্বাস্থ্যের বিষয়টা এত ব্যাপক, এত চোখ-সওয়া যে এ নিয়ে কারও মনে, খোদ মেয়েদের মনেই কোন প্রশ্ন জাগে না। অসুখ করলে তারা হয়ত কপালের দোষ দেয়, কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে খুঁজলে কারণগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াইও করা যায়।

শুধু দারিদ্র্য যদি কারণ হতো তাহলে সমানভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরষদেরও একইরকম হীনস্বাস্থ্য হত। কিন্তু তা নয়। শুধু দারিদ্রের কারণে নারীর স্বাস্থ্য এত দুর্বল নয়। নারীর দুর্বল স্বাস্থ্যের পিছনে আর একটি বিশেষ কারণ হলো *পুরুষতন্ত্র, লিঙ্গবৈষম্য*।

ভাবছেন, ধান ভানতে শিবের গীত— নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুরুষতন্ত্রকে টেনে নিয়ে আসা নিছকই নারীবাদী ঝোঁক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ ভাবনা ঠিক নয়। এই ভুল ভাঙ্গাবার জন্য দু-একটা ছবি তুলে ধরি। আমার পরিচিত এক শ্রমিক পরিবারে প্রথম সন্তান জন্ম নিতে চলেছে। বাবা যেই খবর পেলেন মেয়ে হয়েছে আর গিয়ে দেখলেন না তাকে। দাদু ঠাকুমাও তাই। গরুর বা কৌটোর কোন দুধই খেতে দেয়া হয়নি তাকে, গরম জলে রুটি ভিজিয়ে মা তাকে খাইয়েছে দিনের পর দিন। যদিও পরের ছেলেটি দুধ পেয়েছে। সেই মেয়ে চার ভাইকে আগলেছে, তাদের দুষ্টুমির জন্য চড়-লাথি খেয়েছে বাবা-মার কাছে, বাবা নেশায় ঢেলেছে উপার্জনের পয়সা। আজও মেয়েটিকে নিজের সংসার চালাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় নিজের স্বাস্থ্যের দিকে না তাকিয়েই।

ভাবছেন সেকেল গল্প শোনাচ্ছি? তাহলে ১৯.৮.১৩-র আনন্দবাজার পত্রিকায় আর একবার চোখ বোলান— সম্প্রতি রাজ্য সরকার জেলার হাসপাতালগুলোতে সদ্যোজাত অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার জন্য যে বিভাগ খুলেছে তাতে ছেলের তুলনায় মেয়েদের কম আনা হচ্ছে বলে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যকর্তারা। রাজ্যে যে ২,৬১০০০ কন্যাশিশু উধাও তার একটা কারণ যদি হয় কন্যাভ্রূণ হত্যা তো অন্য কারণ অবহেলা, অনাদর এবং শৈশবে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত রাখা। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন ১৮৯১-র জনগণনা অনুযায়ী পুত্রকন্যাদের মৃত্যুহারে খুব তফাৎ নেই— হাজারে ১১৩ ও ১১৫, কিন্তু ৫ বছর বয়সের মধ্যে প্রতি হাজার শিশুমৃত্যুতে পুত্র ৬৮, কন্যা ৯১। পুরুলিয়ায় এ সংক্রান্ত বিভাগে সমগ্র ২০১২ সাল ধরে চিকিৎসার জন্য আনা ৩০৭টি অসুস্থ নবজাতকের মধ্যে কন্যা মাত্র ৫৬টি! কলকাতাতেও একই চিত্র, যমজ ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি বাবা-মায়ের। মেয়ের জন্য পয়সা, সময় কিছুই ব্যয় করতে রাজি নয় তারা।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে আর তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মেয়েটিকে বা মহিলাদের যে অনাদর, বৈষম্য, পরাধীনতা— তার কারণ সে মেয়ে। কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর পরিচালিত জেলাস্তরের পরিবার-ভিত্তিক সমীক্ষা থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানগুলিও এই সত্যই তুলে ধরছে। এই বৈষম্যমূলক

দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ কম শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে যেমন ব্যাপক, তেমনি সরকার তথা সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক ও পরিচালকরাও তার থেকে মুক্ত নন, মুক্ত নন মহিলারাও। ক'বছর আগে মালদার গ্রামের একটি মেয়েদের স্কুলের অষ্টম শ্রেণী থেকে ওপরের ক্লাসের মেয়েরা আমাদের শিক্ষা দপ্তরের লোক ভেবে ঘিরে ধরে বলেছিল— তাদের স্কুলে একটিমাত্র শৌচালয় এবং সেখানে জলের ব্যবস্থা নেই, স্কুলের কোন বাউন্ডারি নেই, গরমে সিন্থেটিক শাড়ী পরে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে— তাদের স্কুলড্রেস শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ করা হোক। তাদের ঋতুকালে ব্যবহারের জন্য প্যাড দেওয়ার সরকারি প্রকল্প হয়েছে কিন্তু ব্যবহৃত প্যাড ফেলার ব্যবস্থা না থাকায় তা যথেষ্ট বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে, অগত্যা ছাত্রীরা ঐ কটা দিন স্কুল কামাই করে। শুধু ছাত্রীরা কেন, আমার জানা এক শিক্ষিকা বাসে করে অনেকটা পথ পেরিয়ে গ্রামের স্কুলে যেতেন, ছেলেদের স্কুলে শিক্ষিকাদের জন্য আলাদা শৌচালয় ছিল না, ফলে প্রস্রাব চেপে থেকে থেকে তিনি মূত্রাশয়ের অসুখে পড়ে গেছিলেন। শহরেও বিভিন্ন দোকানের সেলস্-গার্লদের একই অবস্থা। গ্রামের মানুষদের চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক ও সাবসিডিয়ারি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে প্রথমত সেগুলিতে ডাক্তার থেকে শুরু করে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধপত্র— কোন কিছুই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না, দ্বিতীয়ত জনসংখ্যার নিরিখে ঐ কেন্দ্রগুলি অনেকই কম, ফলত দূরত্ব আর দুর্গমতার কারণে তা মানুষের উপকার করতে পারে না। সুতরাং গ্রামীণ নারী আর শিশু যে ঐসব কেন্দ্র থেকে কতটা স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় বোঝাই যায়।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির এক চরম প্রকাশ পরিবারে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। একদিকে যেমন নারীর সন্তান ধারণ ও মাতৃদুগ্ধ দিয়ে তার প্রতিপালনের বিশেষ ক্ষমতাকে সামাজিক দিক থেকে মর্যাদা না দিয়ে তাকে অযত্ন করা হয়, অন্যদিকে গর্ভধারণ করার ব্যাপারে নারীর ইচ্ছা বা শারীরিক ক্ষমতা বা অসুস্থতাকে ধর্তব্যের মধ্যেই নেওয়া হয় না (পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত গর্ভধারণ করে যেতে হয়)। একই পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, দ্রুত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নরনারীর যৌথ সিদ্ধান্ত এবং প্রচলিত প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে নারীর ওপর হরমোন প্রয়োগ অথবা 'লাইগেশন' অপারেশন করে প্রজননক্ষমতাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। পুরুষদের ভ্যাসেকটমি ক'টা হয় লাইগেশনের তুলনায়? পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিকড় অনেক গভীরে, আর আজকের পুঁজিবাদী আগ্রাসনের যুগেও কিন্তু এই বৈষম্য দূর হয়নি, বলা যায় করা হয় নি। পুঁজিবাদ একদিকে দারিদ্র্য আর অন্যদিকে এই পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দুর্বলতাকে মূলধন করে মেয়েদের শরীরকে ব্যবহার করেছে বিভিন্ন গর্ভনিরোধক হরমোন-ওষুধ ইত্যাদির পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবার জন্য, ব্যবহার করেছে শ্রমক্ষমতা নিংড়ে নিয়ে পাহাড়প্রমাণ মুনাফা করার জন্য।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা ধাঁচা দিতে সরকার দেশের নিম্নআয়ের সাধারণ মানুষ আর গরীবদের জন্য কিছু স্বাস্থ্যপ্রকল্প খাড়া করেছে যার অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য হ'ল নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা। যেমন— কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করতে ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে ১০টি প্রকল্প আছে। যার মধ্যে প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচি, সুসংহত শিশুবিকাশ কর্মসূচি, প্রাথমিক ও জাতীয় পুষ্টি সহায়তা প্রকল্প, সবলা প্রকল্প (বয়ঃসন্ধি), আয়ুষ্মতী প্রকল্প, প্রসূতিদের নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য তৃণমূল স্তরে 'আশা' কর্মীদের নিয়োগ, প্রসূতিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'নিশ্চয়যান' প্রকল্প সরাসরি স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ঐ একই কারণে, মেয়েদের সার্বিক শারীরিক বিশেষত্ব ও প্রয়োজনকে যথাযথ গুরুত্ব না দিতে চাওয়ার মানসিকতার জন্যই এই প্রকল্পগুলি হয় ব্যর্থ, নয়ত অতি কম ফলপ্রসূ প্রমাণিত হচ্ছে।

এবার আসি নারীর নিজের কথায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী, দরিদ্র থেকে ধনী, পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা বহন করে মনের গহনে। তার উপর আছে প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং কুসংস্কারের গভীর প্রভাব। তাই তার নিজের সম্পর্কে শুধু উদাসীনতাই নয়, কুসংস্কারবশত বহু ভুল পদক্ষেপ নিয়েও সে নিজের ও শিশুদের স্বাস্থ্যের বড় ক্ষতি করে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপন আর ফেরিওয়ালারা নারীর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভরা চটকদার সব খাদ্য, প্রসাধনী, শিশুখাদ্য আর ওষুধ নিয়ে পৌঁছে যায় তাদের দোরগোড়ায়, অল্পখরচের পাতা বা পাউচ দিয়ে শুরু করে তাদের টেনে নিয়ে যায় রঙিন স্বপ্নের ফানুস ওড়ানো এক দুনিয়ায়, যেখানে সত্যি সত্যি তারা কোনদিন পৌঁছতে পারবেনা। তাই আজকের কোনো কিশোরী স্কুলে যোগাসন বা শরীরচর্চা শেখানো হলেও তার অভ্যাস করে না, সস্তার পুষ্টিকর খাবার ফেলে চিপস্ বা ম্যাগি (পেটভরা খেতে গেলে প্রচুর দাম) খায়, শাকসব্জি খেতে জানে না, আলু ছাড়া। নারীর স্বাস্থ্য এর সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আমরা জানি আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে এই দ্বিচারিতা আছে— একদিকে নারীর স্বাস্থ্যের কথা বলা অন্যদিকে ক্ষতিকারক সমস্ত পণ্যকে বাজার দখল করতে দেওয়া। তাই সচেতন মানুষদের, মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে ব্যাপকভাবে সচেতনতা তৈরির জন্য। আজ তাই এ বিষয়ে এক সার্বিক উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যার একদিকে থাকবে বিদ্যালয় স্তর থেকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সমাজ তথা মেয়েদের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনার বীজ বপন করা, অন্যদিকে নারীর বিরুদ্ধে পুরুষতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সকল ধ্বংসাত্মক ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠানো।

প্রবন্ধ

পুঁজিবাদ ও নারী

মুনমুন

পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদ

নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের বিষয়টি বহু আলোচিত; সমাজব্যবস্থা বদলের সাথে সাথে এই অবদমনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বদলায়, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক অবদমন বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে সেটা সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, একও নয়। তাই পিতৃতন্ত্র বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, তা প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো। বিতর্ক অবশ্য থাকবেই, আর সেটাই কাম্য।

সাধারণভাবে নারীকে প্রক্রিয়াগতভাবে (systematically) পুরুষের তুলনায় অবমূল্যায়ন এবং/অথবা অবদমন করার ব্যবস্থাকেই বলা হয় পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্রের শুরুর কারণ কী? নিঃসন্দেহে পিতৃতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাজনের মধ্যে দিয়েই, যে শ্রমবিভাজনের আবার প্রধান কারণ ছিল সেই সময়ে নারীর অনিয়ন্ত্রিত মাতৃত্ব ও তৎকালীন শারীরিক দুর্বলতা; সন্তান ধারণের আগের ও পরের কিছু আবশ্যিক কাজের দায়িত্ব। তবে এটা পিতৃতন্ত্র শুরু হওয়ার আবশ্যিক কারণ হলেও যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। কারণ: ১) সমস্ত নারী একসাথে গর্ভবতী হবে না; ২) নারীর সন্তান ধারণের সামাজিক মূল্য সব সমাজেই গ্রহণযোগ্য— শ্রমবিভাজন বড় জোর পুরুষকে এক ধরনের উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রক করে তুলতে পারে আর নারীকে অন্য ধরনের। আর হয়েছিলও তাই। যতদিন পর্যন্ত সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদিত হয়নি, নারীপুরুষের কাজ কিছুটা আলাদা হলেও উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে— সমাজে শ্রমবিভাজন কোন আধিপত্য কাঠামো তৈরি করতে পারেনি।

উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও সামাজিক সম্পদের ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে ওঠা মানুষকে এক শ্রেণী-বিভাজিত সমাজের দিকে নিয়ে যায়; পশুপালনের ও উন্নততর কৃষির উপর অধিকার অর্জনের ফলে সমাজে পুরুষের কাজ হয়ে ওঠে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে নারীর কাজ, অর্থাৎ সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালন এবং কৃষিতে নারীদের কাজ সেই অর্থে হয় গৌণ।

অর্থাৎ এ পর্যন্ত দেওয়া যুক্তিতে যা দাঁড়ায়— পিতৃতন্ত্র (অর্থাৎ নারীর পুরুষ অপেক্ষা 'গৌণ' সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া) স্থাপিত হওয়ার প্রাথমিক কারণ ছিল নারী-পুরুষের জৈবিক শ্রমবিভাজন (biological division of labour) ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল শ্রেণী বিভাজিত সমাজ। এঙ্গেলস-এর 'পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' তো সামাজিক একক হিসেবে পরিবার প্রথার বিবর্তনের বর্ণনায় সেইরকমই বলে। পুঁজিবাদ একটি শ্রেণী বিভাজিত উৎপাদন তথা সমাজ ব্যবস্থা, কিন্তু প্রথম শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা নয়। পিতৃতান্ত্রিত প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে পুঁজিবাদের জন্ম।

এখন, কোন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন ব্যবস্থাকে (তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন) তখনই ভাঙতে তৎপর হবে যখন তা নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাটির অস্তিত্ব বা পুনরুৎপাদনকে বাধা দেবে। পুঁজিবাদের পিতৃতন্ত্রকে ভাঙার স্বার্থ কতটা, আর কতটাই বা তার দায় পিতৃতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার— এটা বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এছাড়া বোঝার চেষ্টা করা হবে যে পুঁজিবাদে যদি পিতৃতন্ত্রের কোন রূপ টিকে থাকে তাহলে তার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কি প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে আলাদা? আর, পুঁজিবাদে পিতৃতন্ত্র কোন্ নির্দিষ্ট রূপেই বা টিকে আছে। বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলির গুরুত্ব নিহিত আছে আজকের সময়ে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাল্টা সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অভিমুখ বা বহুমুখ নির্ণয়ে।

পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক শর্তগুলো নিয়ে আলোচনার পরিসর বর্তমান প্রবন্ধে নেই, তাই দরকারি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়েই বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।

পুঁজির সঞ্চয়ন ও শ্রমিক নারী: নারীর মজুরি শ্রমের বিবর্তন

পুঁজিবাদী (শহুরে শিল্পাঞ্চল ভিত্তিক) উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবো, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বা উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পনগরগুলোতে তৈরি হয়েছিল শ্রমিকের চাহিদা। অন্যদিকে, সামন্ততান্ত্রিক বা প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে জীবনধারণের আবশ্যিক শর্তগুলো হারিয়ে, প্রথমে পুরুষ ও পরে নারী যোগ দেয় শিল্পশ্রমিক হিসেবে। পুঁজির প্রয়োজন ছিল নারীর শ্রম, তাই পুঁজি সেই সময় ছিল নারীর শ্রমশক্তির বিক্রয়ের পক্ষে। আবার নারী আন্দোলনের প্রথম ঢেউ-এর ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, এই সময় থেকেই নারী শ্রমিকেরা সোচ্চার হয়েছিল পুরুষের সমান মজুরি, কাজের সময় কমানো, কাজের উন্নত পরিবেশ ইত্যাদির দাবিতে। নারীকে পুরুষের চেয়ে কম মজুরিতে খাটিয়ে নিতে পারলে মুনাফা বাড়বে, তাই পুঁজি নারীকে সমান কাজে সমান মজুরি দেওয়ার বিপক্ষে, আর নারী শ্রমিক প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করেছেন। বিষয়টা আরো বিশদে বলার দাবি রাখে।

যেকোন সমাজেই সামাজিক উৎপাদনে নিঃসন্দেহে নারী শ্রমদাতার ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ

ঐতিহাসিক বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর শ্রমকে যে বিভিন্নতায় ব্যবহার করেছে তা বিশ্লেষণযোগ্য। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার বড় বড় শিল্প শহরগুলোতে দলে দলে কারখানায় কাজে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম হয় আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর, এই শ্রমিকদের কাজ করতে হতো একেবারে অপর্যাপ্ত মজুরি আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা। প্রথম বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্প; আর সেখানেই প্রয়োজন ছিল নারীর শ্রম। চরম অনটনে মেয়েরা সন্তান, পরিবার ছেড়ে কারখানায় যোগ দেয় সস্তা শ্রমিক হিসেবে। এই সময় ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের চরম শোষণ আর দারিদ্র্যের বর্ণনা পাওয়া যায় এঙ্গেলস-এর 'ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বা অগস্ট বেবেল-এর 'সমাজতন্ত্রে নারী'র মতো লেখাগুলিতে। সমাজে শিশুমৃত্যুর হার ভয়ানক ভাবে বেড়ে যায়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরিণতি নিদারুণ হয়।

ইতিহাসে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা এই সময় থেকেই। কাজের ঘণ্টা কমানো, মজুরি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। পুঁজিবাদের ইতিহাস আর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস তাই প্রায় সমবয়সী। নারী শ্রমিক নিয়োগ আর নারী শ্রমিকদের আন্দোলনও প্রায় সমবয়সী। নারী শ্রমিকদের মজুরি ছিল পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম। সমান মজুরি, কাজের ঘণ্টা কমানো, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদির দাবিতে বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকরা সংগঠিত প্রতিরোধ, ধর্মঘট শুরু করে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই। ১৮২০ সালে ইংল্যান্ডে, ১৮৩৪, ১৮৩৬-এ ম্যাসাচুসেট্সে, ১৮৫৭-এর ৮ই মার্চ নিউইয়র্কে নারী শ্রমিকদের আন্দোলনে সংগঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৫৭ সালেই নিউইয়র্কে ২০,০০০ নারী শ্রমিক শ্রম-সময় কমানো, মজুরি বৃদ্ধি ও ভোটাধিকারের দাবিতে মিছিল করে। ১৯০০ সালে প্রথম নারী শ্রমিকদের 'ইন্টারন্যাশনাল লেডিজ গারমেন্ট ওয়ার্কাস ইউনিয়ন' গড়ে ওঠে।

রাশিয়ায় নারীশ্রমিকরা কিন্তু প্রথম থেকেই শুধু নারী শ্রমিক আন্দোলন নয়, সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনেই অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থেকেছে। ১৮৭২ সালে মস্কোয়, ১৮৭৮-এ পেট্রোগ্রাডে, ১৮৭০ ও '৮০-র দশক জুড়ে গোটা রাশিয়ায় বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের প্রবাহ দেখা যায়। ১৮৯০-এর দশকে, ১৮৯৫ সালে ইয়ারস্লাভ কারখানায় এপ্রিল বিদ্রোহে, ১৮৯৪-৯৫ এ সেন্ট পিটার্সবুর্গের অর্থনৈতিক সংগ্রামে নারী শ্রমিকরা পুরুষের সমান সক্রিয় ছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শক্তি এই সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু শ্রমজীবী নারীর লড়াইয়ের ইতিহাস পৃথক প্রবন্ধের দাবি রাখে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী শোষণ আর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আসলে নারী আন্দোলনের সূচনা।

নারী শ্রমিকদের সম-মজুরির আন্দোলন ও সমাজ জুড়ে শ্রমিক পরিবারের দারিদ্র্য ও শিশু মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমশ পুঁজির অবাধ বিচরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের কম মজুরিতে খাটিয়ে নেওয়া মোটেও পুঁজির পক্ষে সহজ থাকছিল না। নারীর মজুরি-শ্রম শ্রমিক পরিবারগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছিল।

শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের প্রশ্নে, শিশুদের লালন পালনের প্রশ্নে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখাশোনার প্রশ্নে, খাদ্য প্রস্তুত সহ গৃহস্থালি কাজে, সর্বোপরি পুঁজিবাদী সমাজের সজ্জা (order) সুরক্ষিত করতে শ্রমিক পরিবারের বিকল্প কোন মডেল প্রণয়ন করতে পুঁজিবাদ ব্যর্থ হল। শ্রমিক পরিবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। মেয়েদের আবারও গৃহশ্রমে প্রাধান্যকারী ভূমিকা নিতে হল।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর আন্দোলনের চাপে ও সমাজের সমস্ত স্তর থেকে শ্রমিক পরিবারগুলোর এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থা তৈরির বিরোধিতা আসার কারণে পুঁজিবাদ নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। এই সময় অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে রাষ্ট্র নারী-শ্রমিকদের জন্য নিয়ে আসে কিছু সুরক্ষামূলক আইন। ব্রিটেন-এ পার্লামেন্ট আনে বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকদের জন্য ১০ ঘণ্টা কাজের বিল (১৮৪৭)। পরবর্তী দুই দশক জুড়ে তা ধীরে ধীরে অন্যান্য শিল্পের জন্যও বাধ্যতামূলক হয়। ১৮৪২-এর খনি শিল্পে মেয়েদের কাজে নিয়ন্ত্রণ আনা হয় ইত্যাদি। এসব সুরক্ষামূলক আইনের চাপে মেয়েদের কাজে নেওয়া পুঁজির পক্ষে অলাভজনক হয়ে ওঠে। এর ফলে নারীদের কাজ ও পুরুষদের কাজের পৃথকীকরণ প্রাতিষ্ঠানিকতা পেল।

কিন্তু তা বলে মেয়েদের কারখানার কাজ বা উপার্জনের কাজ বন্ধ হয়ে গেল এমনটা নয়। কিন্তু এবার থেকে পরিবার টিঁকিয়ে রেখেও নারীর মজুরিশ্রমে অন্তর্ভুক্তির রাস্তা খুঁজতে শুরু করলো পুঁজিবাদ। পুরুষ শ্রমিকের মজুরির গালভরা নাম হল পারিবারিক মজুরি, অর্থাৎ সমগ্র পরিবারের প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি। যদিও তা ছিল নামমাত্র ও অপর্যাপ্ত। তাই নারীও মজুরিশ্রমে বাধ্য রইল কিন্তু তার মজুরির নাম হল সহায়ক উপার্জন বা উপরি-উপার্জন, পরিবারের প্রতিপালন করে যতটুকু উপরি রোজগার করা যায় আর কি! পুঁজির সুবিধে হল দ্বিগুণ, পরিবারের বিকল্প (অর্থাৎ গৃহশ্রমের সামাজিকীকরণ, সন্তান প্রতিপালনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ, অ-কর্মক্ষম ব্যক্তির দায়িত্ব ইত্যাদি) তো তৈরি করতে হলই না, উপরন্তু নারী শ্রমিকের শ্রম তো উপরি, তাই তাকে নামমাত্র মজুরিতে খাটিয়ে নেওয়ার ছাড়পত্র মিলে গেল।

নারীর মজুরি শ্রম— বর্তমানে

পুঁজির সময়-উপযোগী প্রয়োজনে সে তার শ্রমিক বাহিনীকে

ঢেলে সাজিয়ে নেয়। পরিবার টিকিয়ে রেখে, নারীর শ্রম ব্যবহার করার পদ্ধতি সে খুঁজে নিয়েছে। যেমন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, পুরুষরা যখন সৈন্য হিসাবে যুদ্ধে, তখন মেয়েদের কারখানায়, ভারী শিল্পে, 'পুরুষের' কাজে যোগ দেওয়া ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আবার যুদ্ধ-পরবর্তীকালে তাদের ফিরে যেতে হয় গৃহে, গৃহশ্রমে। নারী শ্রমিকরা সর্বদাই উপস্থিত থেকেছে পুঁজির উদ্বৃত্ত শ্রমবাহিনী হিসেবে। যখন কোনো কাজে পুরুষ শ্রমিককে কাজে লাগানো অ-লাভজনক হয়েছে, পুঁজিবাদ নারীর মজুরি-শ্রমের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন ভারী শিল্প, বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও মেয়েদের কাজের হার ক্রমশ বেড়েছে। আবার অর্থনৈতিক স্বার্থের বাইরে নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ভাঙার দায় ন্যূনতম ভাবেও সে নেয়নি। সেটা যতটুকু হয়েছে, তা সামাজিক আন্দোলনের চাপে /প্রভাবেই।

বিংশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই উত্তর-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার বহুজাতিক পুঁজি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে নারীর শ্রমকে। বিশ্বজুড়ে মুনাফা বাড়ানো আর মজুরির খরচ কমানোর জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রকে সরিয়ে আনা হয়েছে দক্ষিণের গরিব দেশগুলোতে। সস্তার শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে 'দুর্বল' অথচ পরিশ্রমী, 'নরম আঙুল'-এর 'নমনীয়' মেয়েরা, এশিয়ার তরুণীরা ('docile, nimble fingured, flexible asian women')। ১৯৭৭-এ একটি মালেশিয়ান বিনিয়োগকারী কোম্পানির ব্রসিওর-এ লেখা ছিল— 'The manual dexterity of oriental female is famous the world over. Her hands are small and she works fast with exterme care. Who therefore could be better qualified by nature and inheritance to contribute to the efficiency of a bench-assembly production line than the oriental girl?'

বিশ্বায়ন ও উদারনীতিকরণের আজকের পর্যায়ে পুঁজির চাহিদা ও নারী শ্রমিকদের অবস্থার কয়েকটি দিক আলোচনা করে আমরা এই অংশটি শেষ করবো। বিশ্বায়নের হাত ধরে শ্রমের বাজারের জন্য এসেছে 'নমনীয়করণ' ও 'নারীকরণ' ('flexibility and 'feminisation')-এর ধারণা। পুঁজির ক্রমাগত সঞ্চয়নের জন্য প্রয়োজন— (১) শ্রমিকদের শোষণের নিত্যনতুন পদ্ধতি, ও (২) পণ্যের বাজারের বৃদ্ধি। শ্রমিকদের শোষণের উপায় হলো কাজের ঘণ্টা এবং/অথবা শ্রম-ঘনত্ব বাড়ানো আর মজুরি কমানো। কাজের বাজার সংকুচিত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনৈতিক চুক্তিতে, শোষণমূলক শর্তে শ্রমিকদের খাটিয়ে নেওয়া, আর উল্টোদিকে ন্যূনতম সংগঠিত হতে না দেওয়াই যখন উদ্দেশ্য তখন প্রায়ই পুঁজির পছন্দ হয় সামাজিকভাবে অ-সুরক্ষিত নারী শ্রমিকদের। কারণ তাদের স্থির মজুরির বদলে চুক্তিভিত্তিক মজুরিতে, উৎপাদিত পণ্য প্রতি (piece-rate) মজুরি দিয়ে, ঘরে বসে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাটিয়ে নেওয়া যায়, যখন খুশি ছাঁটাই করা যায়, চরম খারাপ পরিবেশে, সামান্য মজুরিতে কাজে লাগানো যায়, বিয়ে বা সন্তান ধারণের ছুতোয় চাকরি থেকে বের করে দেওয়া যায়। রপ্তানি-নির্ভর শিল্পগুলিতে এই কারণে সব ধরনের কাজেই মেয়েদের বেশি নেওয়া হয়। কোনো কাজকে মেয়েদের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা গেলে মজুরি কমিয়ে দেওয়া যায়, তাই কাজের নারীকরণের মধ্যে দিয়ে লিঙ্গগত বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলা হয়।

অন্যদিকে, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর সেবামূলক ভূমিকাকে বাজারে সেবাপণ্য উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে পুঁজিবাদ তার বাজার সম্প্রসারণ করছে। পরিষেবামূলক কাজের পরিধি বাড়িয়ে সেখানে মেয়েদের 'নারীসুলভ' সেবাদানের কাজে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। পুঁজি মুনাফার পাহাড় জমাচ্ছে।

গৃহশ্রম— নারীর মজুরিহীন শ্রম

প্রথম পর্যায়ের নারী আন্দোলনে উঠে আসা স্বর যদি হয় কারখানায় শ্রমজীবী নারীদের, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠে এসেছিল নারীর বাধ্যতামূলক, মজুরিহীন, সামাজিক স্বীকৃতিহীন গৃহশ্রমের কথা। বিংশ শতকের ষাটের দশক থেকেই ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন জুড়ে যে জনআন্দোলন শুরু হয়, তার হাত ধরে 'পুরুষের উপার্জনমূলক আর নারীর সেবামূলক ভূমিকার পরিবার' (male bread-winner female care-giver family system) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। বিবাহ-বিধি, বাধ্যতামূলক (বহু) সন্তান ধারণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন শুরু হয়। এই সময়ের ১৯৭০-এর দশকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র (ক্যাথলিক চার্চের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও) ডিভোর্স আইন, গর্ভপাত আইন পাশ করতে বাধ্য হয়। এই সময়ের নারী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অবদান হল নারীর গৃহশ্রমের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী শোষণের তত্ত্বায়ন।

আমেরিকার লেখিকা মার্গারেট বেনস্টন, ইতালির নারী আন্দোলনের কর্মী মারিয়া রোজা ডালা কোস্তা গৃহশ্রমের রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে মার্কসীয় অর্থে শোষণের তত্ত্বকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত করেন। ডালা কোস্তা বলেন, একটি শ্রমিক পরিবারের পুরুষ যে মজুরি উপার্জন করছে, তা দিয়ে কেবল তার বেঁচে থাকার রসদের কাঁচামাল সংগৃহীত হচ্ছে, এই কাঁচামালের সাথে পরিবারের নারীর শ্রম যুক্ত হয়ে তা ব্যবহারযোগ্য হচ্ছে। অর্থাৎ নারীর গৃহশ্রম পুরুষের মজুরি-ক্রীত কাঁচামালে যে মূল্য যোগ করল তার একটা অংশ দিয়ে সে তার নিজের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন করল আর অপর অংশ ব্যবহার হলো পরিবারের পুরুষ শ্রমিকের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনে। যার

অর্থ আবার এই যে, নারীর গৃহশ্রম আসলে পুঁজিবাদের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি নামক পণ্যের উৎপাদক। এছাড়াও সন্তান ধারণ ও লালনপালনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের শ্রমশক্তি যোগানের দায়িত্ব মেটাচ্ছে নারীর গৃহশ্রম।

পরিবারের মধ্যেকার শোষণকে যতই অর্থনীতির বাইরের শোষণ আকারে চিহ্নিত করা হোক, এই তত্ত্বের গুরুত্ব এখানেই যে তা গৃহশ্রমকে পুঁজিবাদী শোষণের গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে। তাই যখন যখন পুঁজিবাদ সংকটে পড়েছে, মজুরির ওপর কোপ পড়েছে, জনকল্যাণ খাতে রাষ্ট্রের টাকার ঘাটতি হয়েছে, আর তার ফলে মেয়েদের গৃহশ্রমের বোঝা বেড়েছে। শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েদের মজুরি-শ্রমের পাশাপাশি গৃহশ্রমও সামলাতে হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ভাবনার পরিমণ্ডলকে কাজে লাগিয়ে শ্রমজীবী মেয়েদের ওপর পুঁজিবাদের এই দ্বিগুণ শোষণই পৃথক নারী আন্দোলনের ভিত্তি ও তার পক্ষে যুক্তি।

পুঁজিবাদ ও নারীর পণ্যায়ন

আগেই বলেছি যে, পুঁজি চলাচলের বিশ্বায়িত পরিকল্পনা যেমন একদিকে শ্রমিক শোষণের নিত্য নতুন ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করছে তেমনই তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে রয়েছে বাজার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, বাজার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন ও বিনোদনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে ক্রেতা ও ভোগসুলভ মানসিকতার জন্ম দেওয়া ও তাকে লালন করা পুঁজিবাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর এই কাজে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগানো হচ্ছে মেয়েদের। ভোগ্যপণ্যের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। বিনোদনের বাজারকে সমৃদ্ধ করার জন্য উন্নয়নশীল দুনিয়ার পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মানসিকতার সাথে আপস করে মেয়েদের শরীরকেন্দ্রিক ভাবমূর্তিকে ক্রমাগত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

মেয়েদেরই আবার করে তোলা হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের এই বিপুল বাজারের ক্রেতা। ভোগ্যপণ্য বাজারের ৮৪ শতাংশ ক্রেতাই মেয়েরা, পোশাক, গয়না, প্রসাধন, কসমেটিক-এর বাজারের সাথে সাথে মেয়েদের মধ্যে সৌন্দর্যে প্রতিযোগী মানসিকতা বাড়ানোর সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার চিন্তা, চেতনা, সত্ত্বা, আত্মসম্মান, নারীর পুরনো ধরনের পিতৃতান্ত্রিক নির্মাণকে ভেঙে নতুন ধরনের পিতৃতান্ত্রিক নির্মাণকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। পুঁজিবাদ নারী- স্বাধীনতার অর্থ করেছে খোলা বাজারে শরীর বিক্রির স্বাধীনতা। এসবই পুঁজির প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে যুক্ত।

বেশ্যাবৃত্তি ও পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদে এসে বেশ্যাবৃত্তি নতুনভাবে আইনি মোড়কে পুঁজির সঞ্চয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বিনোদনমূলক ও পরিষেবামূলক যে কোন ব্যবসার সাথে আরো বেশি লাভের আশায় বেশ্যাবৃত্তিকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। থাইল্যান্ড, আফ্রিকার কিছু দেশের মতো বহু জায়গায় বেশ্যাবৃত্তিকে আইনি করে মুনাফা মারাত্মকভাবে বাড়ানো হচ্ছে, যৌনতার ক্রয়-বিক্রয়কে পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত করে তাকে আরও লাভজনক করা হচ্ছে। সেক্স-টুরিজিম এখন বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির সবচেয়ে সহজ লাভজনক উপায়। আমাদের দেশের মুম্বাইয়ের যৌনপল্লীর প্রায় ৬০ শতাংশ শিশু। গোয়ার হোটেল শিল্পে, পানশালায় বিনোদন কর্মী হিসেবে মেয়েদের কাজে নেওয়া হচ্ছে।

পর্নোগ্রাফির ব্যবসা, সহজে যৌনতা কেনার নানারকম ক্রেতাসুরক্ষিত ফিকির যোগাচ্ছে পুঁজি। ইন্টারনেট এর মাধ্যমে, মোবাইল ফোনের বিভিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে যৌনতার ক্রয়-বিক্রয়ের লাভজনক বাজারে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে বেশি বেশি করে। যৌনতা পণ্যায়নের সংস্কৃতির এই আবহে মুনাফা বাড়াচ্ছে পুঁজি। মেয়েদের সাথে সাথে ছেলেদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে এই শোষণমূলক যজ্ঞে। তবে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বহু বহু গুণ বেশি। এ বিষয় নিবিড় ও সঠিক তথ্যমূলক অর্থনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা আজো বেশ বিরল। কিন্তু পুঁজির মুনাফার ক্ষেত্র হিসেবে যৌনতা প্রদানের এই পরিষেবা ও তাতে শোষণের পরিমাণ নিঃসন্দেহে আরো চর্চার দাবি রাখে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারী আন্দোলনের সাথেও এই ক্ষেত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

পুঁজিবাদে গণতান্ত্রিক আইনি কাঠামো

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইনি গঠনতন্ত্র বা বহু আচরণে তাকে পিতৃতন্ত্র-বিরোধী বলে মনে হয়— দেশের সংবিধানে লেখা আছে 'নারী পুরুষ সমান'। তাই দিয়ে সত্যি কি প্রমাণিত হয় পুঁজিবাদ পিতৃতন্ত্র বিরোধী? অর্থাৎ একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইনকে কিভাবে দেখবো। যদিও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একটি আপাত গণতান্ত্রিক কাঠামো আছে, তবুও প্রকৃত অর্থে তা যেমন গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে না, ঠিক তেমনই তার আইনও মানুষের স্বার্থে তৈরি হয় না। কোন এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের স্বপক্ষে (pro-people) কিছু আইন তৈরি হতেও পারে, তেমনই প্রয়োজনে সেই আইন লঙঘনের 'আইনি' সুবিধাও থাকে। যেমন, ঐতিহাসিক কারণে যে আইন তৈরি হয়, প্রয়োজনে সেই আইন লঙঘনের 'আইনি' ব্যবস্থাও থাকে। যেমন, যে শ্রম আইনগুলি মানুষ বহু আন্দোলন করে অর্জন করেছিল, খাতায় কলমে আজও তার প্রতিটি টিকে থাকা সত্ত্বেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর ব্যবস্থা করেছে পুঁজিবাদ। তেমনি নারী পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্নে আইনের দিক দিয়ে পুঁজিবাদ বেশ প্রগতিশীল বটে, কিন্তু বাস্তবে তা বৈষম্য টিকিয়ে রাখে।

কিছুদিন আগেই গর্ভপাত না করতে পারার কারণে আয়ারল্যান্ডে সবিতা হালাপ্পানাভার নামে মেয়েটির মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে একটা আলোচনা চলছিল। তাতে সামনে এলো— যদিও গর্ভপাত আইন ঐতিহাসিক ভাবে নারী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত, তবু নাকি ৭১ শতাংশ দেশে এখনো কেবল মায়ের ইচ্ছার কারণে গর্ভপাত বে-আইনী, ৬৬ শতাংশ দেশে সামাজিক

বা অর্থনৈতিক কারণ দেখালেও গর্ভপাত বে-আইনি, মায়ের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকলেও ৩৩ শতাংশ দেশে গর্ভপাত বে-আইনি, ৩ শতাংশ দেশে মা মারা গেলেও গর্ভপাত করা যায় না। অর্থাৎ এখনো গর্ভপাত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শর্তসাপেক্ষ— নারীর অধিকার নয়। যদিও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবকেই এর জন্য দায়ী করা হয়, কিন্তু পুঁজিবাদ তার স্বার্থেই এই প্রভাব টিকিয়ে রাখে।

আইনের প্রশ্নটা তুলতে হলো তার কারণ, নারী মুক্তির প্রশ্নে বহু লড়াই-ই আইনি পথের চোরাবালিতে আটকে পড়ে, নিঃসন্দেহে এই আইনি লড়াইগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু আইন তৈরি হলেই তাতে সমতা বিধান হবে, এমনটা নয়। সব শ্রেণীর মেয়েরা সমান ভাবে আইনের সুযোগ তো পাবেই না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক পথে তাই নারীর সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়।

উপসংহার

নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক বিভেদ ও নারীর শোষণ কতটা সামন্ততান্ত্রিক আর কতটা পুঁজিবাদী, এই বিতর্ক সমাজে এত বহুমুখী যে পুঁজিবাদ বহু ক্ষেত্রেই বেশ খানিকটা ছাড় পেয়ে যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো সমাজব্যবস্থায়, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীর সামাজিক ভাবে গৌণ অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বটে, কিন্তু পুঁজির নিজস্ব প্রয়োজনের কারণেই এই উৎসগুলি টিকিয়ে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে। পিতৃতন্ত্র বিরোধী পুঁজিবাদের কোন বৈশিষ্ট্যকেই স্থায়ী বা নির্দিষ্ট বলে ধরার কোন কারণ নেই। পুঁজি তার বৃদ্ধির স্বার্থে, পুঁজি ও মজুরিশ্রমের দ্বন্দ্বের তাৎক্ষণিক সবচেয়ে লাভজনক সমাধানের স্বার্থে যে কোন তাৎক্ষণিক ও কেতাবি অবস্থান নিতে পারে।

সবশেষে বলবো, যে কোন শোষণমূলক ব্যবস্থার পক্ষে সামাজিকভাবে বিভেদের উৎসগুলো টিকিয়ে রাখা সাধারণভাবে লাভজনক, তাই জাতপাতগত, লিঙ্গগত, বর্ণগত কোন বিভেদই মেটানোয় পুঁজিবাদ আগ্রহী হবে না। আবার এর কোনটাই তার টিকে থাকার প্রাথমিক শর্ত নয়। তাই সামাজিক আন্দোলনের চাপে মাঝে মধ্যেই সে এই ধরনের বিভেদ-বিরোধী মুখ ধারণ করতেও পারে। কিন্তু পুঁজিবাদে পুঁজি আর মজুরি শ্রমের বিভেদ মিটবে না। যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক শোষণের নিত্য নতুন অমানবিক পন্থা তৈরি করা হচ্ছে প্রতিদিন, সেখানে গণতান্ত্রিক পথে একজন নারী-শ্রমিক বড়জোর একজন পুরুষের সমান শোষিত হওয়ার অধিকার অর্জন করতে পারে। আদপে নারীর মুক্তির লড়াই যুক্ত আছে শোষণহীন সমাজ বদলের লড়াইয়ের সাথেই।

প্রবন্ধ

পরিবারের বিবর্তন ও বেশ্যাবৃত্তির উৎস সন্ধান

রূপা আইচ

'বেশ্যাবৃত্তি' সমাজে রমরমিয়ে বিরাজ করলেও সাধারণভাবে 'সমাজ' একে 'অপরাধমূলক' 'পাপ' কাজ রূপে চিহ্নিত করেছে। 'বেশ্যাবৃত্তি' কথাটি উচ্চারণ এবং বেশ্যাদের জীবন নিয়ে ভাবাও তাই সমাজে উপেক্ষিত, বলা যায় ঘৃণিত, হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে 'পুঁজিবাদ' যখন 'নারীদেহ' ও 'যৌনতা'-কে পণ্যরূপে বিবেচনা করে 'বেশ্যাবৃত্তি'র আইনিকরণ নিয়ে তোড়জোর শুরু করেছে, তখন দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একদিকে সমাজের রক্ষণশীল অংশ ও অপরদিকে যুক্তিবাদী, সচেতন মানুষের একটা অংশ এর প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। গড়ে উঠেছে নানা মতামত ও বিতর্ক।

'গণিকাবৃত্তি' বজায় রাখার যুক্তি হিসেবে যা যা বলা হয়, তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো— ঐতিহাসিকদের মতে জীবনধারণের যতগুলি উপায় প্রাচীনতম, তার মধ্যে 'বেশ্যাবৃত্তি' একটি। হাজার হাজার বছর ধরে এই প্রথা তৈরি হয়েছে। তাই 'বেশ্যাবৃত্তি' হলো পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পেশা। কথাটি বিতর্কিত। সমাজে উদ্বৃত্ত তৈরি হওয়ার আগে বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্ন ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীনতম পেশা হলো কুম্ভকারের ও অস্ত্র বানানোর। পুরোহিতদের পেশাও এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, ইতিহাসের কোন্ প্রেক্ষাপটে কেন নারী জীবনধারণের জন্য এরকম একটি পেশাকে বেছে নিল? এই ইতিহাসের অন্বেষণ ব্যতীত শুধু 'আদিমতম'— এই বিভ্রান্তিতে কোনো পেশাকে 'চিরকালীন' বা 'গৌরবান্বিত' করা যায় না।

ঠিক কেমন করে সমাজে 'গণিকা' দেখা দিল তা আজ নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। আমরা যখন লিখিত ইতিহাসের যুগে পৌঁছাই তখন সমাজে পুরুষপ্রধান একপতিপত্নী-পরিবার মূলত প্রতিষ্ঠিত। এই যুগ থেকেই বেশ্যাবৃত্তির উল্লেখ আমরা পাই। সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ইত্যাদির যেমন ভূমিকা আছে ইতিহাসকে বোঝার ক্ষেত্রে, তেমনভাবেই বাখোফেন, ম্যাক লেনন, মর্গ্যান প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় পর্যবেক্ষণলব্ধ যে সিদ্ধান্তগুলি হাজির করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে মার্কস-এঙ্গেলস্ সহ নানা সমাজতত্ত্ববিদ্ আজ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠী কাঠামোর বিকাশের বিবর্তনের নানাদিক ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত মর্গ্যানের প্রসঙ্গে এঙ্গেলস-এর এই মন্তব্যটি খুবই বিখ্যাত— "সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে পিতৃপ্রধান নিয়ে যে গোত্র দেখা যায় তার পূর্ববর্তী স্তরে আদি মাতৃঅধিকারভিত্তিক গোত্রের আবিষ্কারটি হচ্ছে আদিম সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে ঠিক ততোখানি অর্থপূর্ণ যতখানি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য।" যদিও 'অধিকার' শব্দটিকে কেন্দ্র নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে এঙ্গেলস-এর সময় থেকেই। এই সমস্ত গবেষণার মধ্যে দিয়ে আমরা 'গণিকাবৃত্তি'র উৎসকে কিছুটা খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা নিতে পারি।

মানুষ সামাজিক জীব, গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। প্রাক্-ইতিহাসে এই সময় খাদ্যসংগ্রহ ও শিকার জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল। তবে নিছক শিকারীজাতি অর্থাৎ শুধু শিকার করেই যারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এমন জাতি কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু লক্ষণীয় হল যে, মেয়েরা মূলত খাদ্যসংগ্রহ ও গার্হস্থ্য শ্রম করত। এইভাবে গড়ে ওঠে মানুষের সমাজের প্রথম শ্রেণীবিভাজন— নারী ও পুরুষের মধ্যে। যেহেতু মুখ্য উৎপাদন কার্যে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল (খাদ্যসংগ্রহ), মেয়েদের স্বাধীনতা সমানাধিকার সম্মানজনক প্রাধান্যের অবস্থান বিরাজ করত। উদ্বৃত্ত যেহেতু ছিলনা তাই সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু—শিকারের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল পুরুষদের হেফাজতে, আর গৃহস্থালির আসবাবপত্র নারীদের অধিকারে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমান।

কিন্তু এই সময় থেকেই নারীদের সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় নারীর ঘন ঘন মাতৃত্ব। যেহেতু সমাজে নারীর গর্ভে 'মনুষ্যশক্তি'র উৎপাদন মানবজাতির টিকে থাকার একটা প্রধান উপকরণ ছিল, সমাজে নারীর স্থান ছিল সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। "নারীর মাতৃত্ব ছিল লিঙ্গগত কর্মবিভাগের প্রধান হেতু এবং নারীর ওপর পুরুষের শাসনের প্রধান হেতু।" (সুকুমারী ভট্টাচার্য) বলা হয় কৃষির–মধ্যে দিয়ে নতুন ধরনের জীবিকার আয়োজনের স্রষ্টা নারী। কিন্তু উৎপাদনের মধ্যে যখন 'কৃষি' প্রধান স্থান গ্রহণ করলো, বিশেষত পশু দ্বারা লাঙল টানানো শুরু হলো, এ কাজে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হলো। এই গবাদি পশু চালিত লোহার ফলাওয়ালা লাঙলের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ মানুষের জীবনোপকরণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। এছাড়া এই সময়ে মানুষের নানা ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পদ্ধতিগুলোও তাদের আয়ত্তে আসে।

এই আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শারীরিক গঠনের দিক থেকে ও মাতৃত্বকালীন পর্বে নারী এমনকিছু অসুবিধার মধ্যে পড়ত, যাতে জীবনযাপনের জন্য ও সন্তান লালনপালনের জন্য তাকে সাময়িকভাবে হলেও পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হত। শ্রমশক্তি যেখানে উৎপাদনের অন্যতম অবলম্বন সেখানে সমাজের উৎপাদনমূলক মূল কাজ এবং উৎপাদনের যন্ত্র পুরুষের মালিকানায় আসায় মানব প্রজাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা কোনো কোনো দিক থেকে

নারীর তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তা সমাজে পুরুষ-প্রাধান্যের ভিত্তি তৈরি করল। যদিও তখনো পর্যন্ত সমাজে নারীর স্থান পুরুষের অপেক্ষা গৌণ হয়ে ওঠেনি।

সমাজে নারীর অধস্তনতা শুরু হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। বর্বরযুগের নিম্নস্তর পর্যন্ত স্থায়ী ধনদৌলত ছিল শুধু ঘর, পোশাক, অসংস্কৃত গহনা, লোহার হাতিয়ার, বাসন ইত্যাদি। কিন্তু বর্বরযুগের উচ্চস্তরে পশুপালন ও পশু-উৎপাদন ধনদৌলতের নতুন পথ খুলে দেয়। এই নতুন ধনদৌলত কার সম্পত্তি? পশুপালন সর্বত্রই তখন পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। পশুপালন ও লাঙল সহ চাষ আসার পর খাদ্য উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা হলো পুরুষের। ফলে সম্পত্তি হল পুরুষের। তবে আধুনিক অর্থে তাকে সম্পদের মালিক মনে করা চলবে না। কিন্তু তখনকার ব্যবস্থা (গোষ্ঠীবিবাহ, যেখানে নারী তার সন্তানদের চেনে, কিন্তু পুরুষ জানে না কে তার সন্তান) অনুযায়ী সন্তানেরা পিতার উত্তরাধিকারী হতে পারত না। সে সময়ের প্রথা অনুসারে পুরুষ অন্য কুল থেকে স্ত্রীর কুলে আসত। ধনদৌলত বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের প্রতিষ্ঠা যত বাড়তে থাকে, ততই উত্তরাধিকার ও বংশপরম্পরা গণনার রীতি উল্টে দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কিন্তু মাতৃঅধিকার অনুযায়ী বংশধারা থাকাতে এটি হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য এই প্রথা ভাঙার প্রয়োজন ছিল এবং তা ভাঙা হল। এঙ্গেলস্-এর মতে,

> আজ আমাদের নিকট এই কাজটি যত শক্ত মনে হয়, উহা তেমন শক্ত ছিল না। কেননা, মানুষ আজ পর্যন্ত যতগুলি চরম যুগান্তকারী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, উহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেও, কুলের একটিও প্রাণীর জীবনে কোনোরূপ ব্যাঘাত না জন্মাইয়া এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল। সকলেই পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি থাকিতে পারিল। ভবিষ্যতে পুরুষ সন্তানেরা কুলের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে, মেয়ে সন্তানদের অন্যকুলে পাঠাইতে হইবে— এই মর্মে একটি সাধারণ আদেশই যথেষ্ট ছিল। এর ফলে মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের বিধিটি বিপর্যস্ত হল। সকল দিক থেকে পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।

তাই এঙ্গেলস্-এ মতে,

> মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ হল স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালিরও কর্তৃত্ব দখল করিল, স্ত্রীলোক হইল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য অর্থাৎ সন্তানসন্ততির পিতৃত্বের নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন করা হয়...

গোষ্ঠী পরিবারের মধ্যে কোনো একজনের পিতা কে তা এতদিন নিশ্চিতভাবে জানা যেত না। তাই গোষ্ঠীগত পরিবারে বংশের ধারা মায়ের দিক থেকে পরিগণনা করা হত। আর আদিম পারিবারিক রূপ যে গোষ্ঠীগত বিবাহ— এরকম পরিবারে সকল পুরুষের ও সকল স্ত্রীরই পরস্পরের সাথে যৌনসম্পর্কের অবকাশ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের ফলে ধনী ক্ষমতাশালী পুরুষ তার সম্পদকে তার আপন ঔরসজাত উত্তরাধিকারের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইল। ফলে যথাযথ উত্তরাধিকার চিহ্নিত করতে নারীর বহুগামিত্ব অস্বীকার করা হলো, যদিও পুরুষের এ সুবিধা থেকে গেল। নারীকে ঠেলে দেওয়া হল গৃহের আরও কোণে। একমাত্র পিতার দিক থেকেই গোত্রসম্বন্ধ ও বংশানুক্রম স্বীকৃত হতে লাগল। তাই নারীর 'অধস্তনতা' সার্বিকভাবে এ যুগের প্রধান লক্ষণ রূপে উঠে এল।

সমষ্টিবিবাহজাত পরিবার এবং আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারের মধ্যবর্তী স্তরে কোথাও কোথাও গোষ্ঠীতে একটিমাত্র গৃহকর্তার চূড়ান্ত আধিপত্য দেখা যায়। যিনি বাইরের গোষ্ঠীর ব্যাপারে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, ছোটখাটো বিষয়ের নিজেই নিষ্পত্তি করেন, এবং টাকাকড়ির পরিচালনা তাঁর হাতে থাকে— তিনিই এই তহবিল এবং সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে দায়ী। কিন্তু গোষ্ঠীর চূড়ান্ত ক্ষমতা পারিবারিক সভার ওপর ন্যস্ত। সমস্ত পূর্ণবয়স্ক সদস্য, স্ত্রী ও পুরুষদের নিয়ে এই সভা। এই সভার সামনে গৃহকর্তা তার কাজের হিসেব দেন, এই সভা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সভ্যদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে; কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়, বিশেষত জমি-জায়গা প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানে সিদ্ধান্ত হয়। এই ভিত্তি থেকে গৃহকর্তার স্বৈরক্ষমতা এবং তার তুলনায় পরিবারের বাকি সদস্যদের অধিকারহীনতা সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন ওঠে।

বস্তুত, পুরুষের পক্ষে 'বহুপত্নীত্ব' এবং 'গণিকাবৃত্তি' দাসপ্রথারই ফল। এবং ব্যতিক্রমমূলক অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ। প্রথম থেকেই গোত্র বা গোষ্ঠী সংগঠনগুলো জীবিকার জন্য খাদ্যাঞ্চল ও শিকারভূমি নিয়ে ঝগড়া করত, যুদ্ধ করত, পরস্পরকে হত্যা করত বা আপোষে মিটিয়ে নিত। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধিতে শ্রমশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর থেকে ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবন্দীদের 'দাস' রূপে খাটাতে লাগলো। দাসরা যাবতীয় কাজ করত। এইভাবে কোনো কোনো জায়গায় শুরু হল 'ক্রীতদাস প্রথা'। যুদ্ধবন্দী নারীরা শ্রম দেওয়া ছাড়াও আরও একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করত— জয়ী গোষ্ঠীপ্রধানদের যৌন আনন্দ দান। এছাড়া অন্তর্গোষ্ঠীবিবাহ বন্ধ হওয়া নারী সংখ্যায় কমে গেলে 'নারীহরণ' বা 'নারীক্রয়'ও শুরু হয়। নারীহরণের মধ্য দিয়ে পুরুষ একাধিক হরণকারী নারীকে বিবাহ করে বা যৌন উপভোগের অংশ হিসেবে তাকে রেখে দেয়। জোড়বাধা বিবাহের উৎপত্তির সাথে এই স্ত্রীলোক হরণ ও ক্রয় শুরু হয়। বন্দিনী দাসীদের অবশ্য অনেক সময় গৃহে নিয়ে তোলা হত দম্পতির সংসারে। এইসব দাসীদের ছেলেরা বাপের

বিষয়সম্পত্তির একটা ক্ষুদ্র ভাগ পেত এবং এদের স্বাধীন নাগরিক বলে ধরাও হত। ক্রীতদাস প্রথায় প্রাপ্ত দাসীদের অনেকসময় বিবাহও করা হত, আবার বেচেও দেওয়া হত। কখনো অন্য কোনোভাবে বেঁচে যাওয়া সন্তানসহ সম্ভোগের জন্য নিজের উপজাতিতে গ্রহণও করা হত। পশুদের মতো তাদের কাছ থেকে শ্রমশক্তি নেওয়া হত এবং গোত্রের বংশবৃদ্ধি করার জন্য এদের ব্যবহার করা হত। নারীর অধস্তনতা একভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্রীতদাসীদের যৌন উপভোগের বস্তুতে পরিণত করা সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। নারী যেহেতু পরিণত হল উনমানবে, তাই তার জীবনের এক অন্যতম কাজ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল পুরুষকে তার রূপ-যৌবন-লাস্য দিয়ে এবং গৃহশ্রম দিয়ে সন্তুষ্ট করা। নিজের শরীরের উপর তার কোনো অধিকার নেই, সম্পত্তি অর্জন বা ভোগের উপর তার কোনো অধিকার নেই। কারণ সে নিজেই একটা ভোগ্যবস্তু বা সম্পদ। পুরুষের সমৃদ্ধি বিচার করা হত তার পত্নী, উপপত্নী ও রক্ষিতার সংখ্যা দিয়ে। যেমন— পশু ও পুরুষ ক্রীতদাসও তার সমৃদ্ধির প্রতীক। ধনী ও হোমরা-চোমরাদের একটি বিশেষ অধিকার ছিল বহুপত্নীত্ব। বহু স্ত্রী সংগ্রহ হত এই দাসীদের কিনেই। অর্থের অভাবে সাধারণ লোকেরা মূলত একপত্নী নিয়ে থাকত ও সুবিধামত নিম্নমানের গণিকা সান্নিধ্যে যেত।

আদিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন পরিস্থিতি দেখা পাওয়া যায় যেখানে পুরুষের বহুপত্নীত্ব এবং সেইসঙ্গে তাদের স্ত্রীদের বহুস্বামীত্ব রয়েছে এবং তাদের সাধারণ সন্তানসন্ততিরা সকলেরই সন্তানসন্ততি বলে পরিগণিত হচ্ছে— সেখানে বেশ্যাবৃত্তির উপস্থিতি নেই। এই অবস্থার পরবর্তীতে ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটতে ঘটতে পরিণামে একপতিপত্নী সম্পর্কে এসে পৌঁছায়। অর্থাৎ যখন 'নির্বিচার যৌনসম্পর্ক' ছিল সেখানে বেশ্যাবৃত্তি ছিলনা। ছিল প্রত্যেকটি স্ত্রীলোক সমানভাবে প্রত্যেকটি পুরুষের এবং তেমনই প্রত্যেকটি পুরুষ প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের পতিপত্নী ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের পরস্পর সহিষ্ণুতা, ঈর্ষা থেকে মুক্ত হচ্ছে— এ ধরনের সম্পর্ক-বিশিষ্ট বৃহৎ এবং স্থায়ী যূথগঠনের প্রথম শর্ত, যার মধ্য দিয়ে কেবল পশুস্তর থেকে মানুষে উৎক্রান্তি সম্ভবপর হয়েছে। তবে এই 'নির্বিচার যৌনসম্পর্ক' সম্বন্ধেও একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। ভেস্তেমার্ক নির্বিচার যৌনসম্পর্ক বলতে বুঝেছিলেন ব্যক্তিগত রুচির দমন অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি যার সবচেয়ে খাঁটি রূপ। কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এই ধারণার বিরোধিতা করে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, "এর অর্থ হল যে বর্তমানের বা অতীতের বিধিনিষেধগুলো তখন ছিল না। ...এর থেকে অবশ্য এইকথা আসে না যে, রোজই একটা এলোমেলো যৌনসম্পর্ক চলত।"

অনেকে মনে করেন, মেয়েদের চাইতে পুরুষদের যৌনক্ষুধা বেশি। তাই মেয়েরা বারাঙ্গনা হয় আর পুরুষ নানা কিছুর বিনিময়ে যৌনক্ষুধা মেটায়। কিন্তু বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষ ও নারী দু'জনের যৌন ক্ষুধা সমান। আসলে পুরুষ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের উত্তরাধিকারের মধ্যে সঞ্চারিত করতে গিয়ে নারীর যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানাধীন সমাজে নারীর অধস্তনতা থেকে শুধু 'বেশ্যাবৃত্তি'র জন্ম হল তা নয়, পরিবারেও নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। নারী পরিণত হল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্মাণের যন্ত্রে। পুরুষপ্রধান, বিশেষত একপতিপত্নী পরিবার আসার ফলে গৃহস্থালির সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেল। এটি আর সমাজের দেখবার বিষয় রইল না। এটি হয়ে দাঁড়ালো ব্যক্তিগত সেবা। সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী হল প্রথম ঘরোয়া ঝি। আজকের আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারও মূলত স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য এবং গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের স্বার্থে এই প্রথায় বিবাহ সম্পূর্ণভাবেই অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রয় করে বিবাহের প্রথা লোপ পেল কিন্তু বেচাকেনা ব্যাপারটাই ক্রমশ বেশি করে এমনভাবে চলল, যাতে শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও মূল্য যাচাই করা হতে থাকল ব্যক্তিগত গুণ দিয়ে নয়, সম্পত্তি দিয়ে।

'প্রজনন' সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও নারীর 'অধস্তনতা' এবং তাকে 'ভোগ্যবস্তু' বলে মনে করার প্রবণতাকে গভীর করেছে। প্রজননে যৌনসঙ্গী বিষয়ে মানুষের ধারণা প্রথমে ছিল অবচেতনায়। যাযাবর মানুষ তাদের পশুপালনের মধ্যে প্রজনন ক্রিয়া দেখত। সেখান থেকে প্রজনন ও যৌনতা সম্পর্কে তাদের কিছুটা বোধ তৈরি হয়। পরবর্তীতে কৃষিজীবি মানুষ, মা-এর সন্তান জন্ম দেওয়ার সাথে শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে তুলনা করল। নারীক্ষেত্র ও বীজ— জমি ও বীজের মালিকের মতো তাই নারী ও সন্তানের মালিকানাও পুরুষের।

এদিকে পরিবারে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেমন— প্রথমে মাতাপিতা ও সন্তান, দ্বিতীয়ত ভাই ও বোনের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হতে হতে চলল। অন্তঃপ্রজনন রোধের প্রেরণা মানুষ পেয়েছিল 'প্রাকৃতিক নির্বাচননীতি'র ক্রিয়ায়। কিন্তু তা সহজেই লুপ্ত হতে পারেনি, এর প্রেরণা বারবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু তা করেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, উদ্দেশ্যের স্পষ্ট চেতনা ছাড়া। একে 'অবৈধতা' রূপেই সমাজ বিচার করেছে। কিন্তু এর সাথে কখনোই 'গণিকাবৃত্তি'র তুলনা করা যায় না।

একপতিপত্নী পরিবারে পুরুষের আধিপত্য সুনিশ্চিত করা হলো সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য। বিবাহিত স্ত্রীর জন্য ছিল কঠোর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য। সে শুধু মা, গৃহকর্ত্রী, দাসীদের কর্মাধ্যক্ষ। তাই শুরু থেকে একপতিপত্নী পরিবার কেবল নারীর জন্য, পুরুষের জন্য নয়। তবুও সবরকম অবরোধ ও প্রহরা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে প্রতারণার করার কিছু কিছু সুযোগ

নিত। এই যে একগমনে পুরুষের পরনারীর প্রতি বা নারীর পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ— এর মূল কারণ, একগামী বিবাহের সূচনা ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম থেকে কোনোক্রমেই জন্মায়নি। এই বিবাহ সুবিধার বিবাহ। এই প্রথা গড়ে উঠেছিল নারী-পুরুষের একজনের অপরের উপর আধিপত্য হিসেবে। ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীবিরোধ তাই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে; প্রথম শ্রেণী-নিপীড়নও পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের মধ্য দিয়ে। একপতিপত্নী বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দিনে অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক জীব তাই ঘটনাস্থলে এসে পড়ে— স্ত্রীর উপপতি এবং প্রতারিত স্বামী। অর্থাৎ নারীর ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত হলেও তা অনেকসময়ই ছিল অদম্য। কারণ পরিবারের বাইরে যা 'অবৈধতা', তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল 'যৌনপ্রেম'। একপতিপত্নী বিবাহেই প্রথম আধুনিক প্রেমের বিকাশ ঘটা সম্ভব। তবু একথা বলা যাবে না যে, সে প্রেম কেবল এবং প্রধানত স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হিসেবেই তার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। কারণ তা নাকচ হয়ে যায় পুরুষাধিপত্যাধীন একবিবাহের সমগ্র চরিত্রেই ফলেই। তাই ব্যভিচার বা গণিকাগমনের ব্যাপারে রচিত হতে থাকে নানা নিয়মকানুন। কিন্তু খুব প্রগতিশীল আইনও এইটুকুতে সন্তুষ্ট যে, উভয়পক্ষ বিবাহে সরকারিভাবে নিজের সম্মতি জানিয়েছে। আইনের যবনিকার আড়ালে যেখানে বাস্তব জীবন চলে সেখানে কী ঘটছে, এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে পৌঁছানো হচ্ছে, তা নিয়ে (কীভাবে) আইন এবং আইনজ্ঞ মাথা ঘামায় না। এই সুবিধাভিত্তিক বিবাহপ্রথা প্রায়শই স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়। কখনো দু'পক্ষের, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বেলায়। "স্ত্রীর সাথে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এই যে, সে ফুরনের মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটা বিক্রি করে চিরকালের মতো দাসত্বে"। পরিবারে নারীর স্বীকৃতিদানের একমাত্র জায়গা মাতৃত্ব। কুল বা গোষ্ঠীতে একারণে মেয়েদের যে স্বাধীনতা ও সম্মান ছিল, এই পরিবার প্রথায় তা একেবারে বিপরীত অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো।

অধিকাংশ সভ্যতার ক্ষেত্রে এই প্রায় সাধারণ চিত্র। পরিবারের বাইরে যখন কোনো নারী অন্য পুরুষকে অর্থ বা বস্তুর পরিবর্তে দেহদান করেছে তাকে সমাজ গণিকা বলে চিহ্নিত করেছে। বিবাহ সম্পর্কের বাইরে বিবাহিত বা অবিবাহিত নারী যখন বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বিধানের মূল্য রূপে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে সেটিই গণিকাত্বের লক্ষণ। সে মূল্য গ্রহণের মধ্যেই হোক বা নিয়মিত বৃত্তি রূপেই হোক। কাজেই, 'বিবাহবন্ধনের বাইরে' একটি নিয়ামক লক্ষণ এবং 'মূল্যগ্রহণ' আর একটি। 'গণিকাবৃত্তি' এ দুটির দ্বারা চিহ্নিত।

কবে, কীভাবে 'মূল্যগ্রহণ'-এর মাধ্যমে নারী দেহদান করতে শুরু করে তার একটা রূপরেখা তাই ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সমাজে পরিবার ও বিবাহ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি 'গণিকাবৃত্তি'র উদ্ভব যে নারীর স্বাতন্ত্র্যকে আরো বেশি ক্ষুণ্ণ করেছে তা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা একটা অংশের মানুষকে যত সমৃদ্ধ করেছে তত 'গণিকাবৃত্তি'র প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্বৃত্ত অর্থ পুরুষ যৌন আনন্দের বিলাস-সম্ভোগে ব্যয় করেছে।

নিজের সম্পদের উত্তরাধিকার সম্প্রসারিত করতে পুরুষ একদিকে যেমন 'পরিবার' প্রথাকে পবিত্র করে তুলেছে, পাশাপাশি তার যৌনক্ষুধা মেটাবার প্রয়োজন থেকে 'পতিতাবৃত্তি'কে সে কীভাবে সমাজে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে পারে তা নিয়ে নানা যুগেই সমাজে দ্বৈধ মানসিকতা প্রকাশ পেতে পেতে চলেছে। কখনো গণিকালয় গমনে পাপ, যদিও প্রায়শ্চিত্ত যৎসামান্য। কখনো গণিকার অর্থ অর্জনের ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে নানা আইন। আবার 'কামশাস্ত্রে' গণিকাকে নানা যৌন-আচরণ বিধি শেখানো, অথচ সেই আচরণবিধি প্রয়োগের জন্যই আবার গণিকাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা। আবার বিত্তশালী পুরুষ বা কখনো সরাসরি রাষ্ট্রের উদ্যোগে গণিকাদের শিক্ষিত— কামকলা পটিয়সী, নৃত্যগীত পারদর্শী, উন্নত রুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলা হয়েছে পুরুষের মনোরঞ্জনের স্বার্থেই। সমাজে 'পতিতাবৃত্তি' নিয়ে দ্বৈধ মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নানা আচরণের মধ্য দিয়ে। যেমন, ক্ষেত্রকে ফলপ্রসূ করার একটা প্রণালী হলো ক্ষেত্রের ওপর নারী-পুরুষের মিলন। যৌনশক্তির প্রতীক হিসেবে গণিকা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্থান পেয়েছে। গণিকার জননীত্ব গৌণ। তার যৌনতা উর্বরতার আবহ বহন করে— বেদ থেকে দুর্গাপূজা পর্যন্ত ভারতের কৃষিজীবী সমাজে তার এই স্থান আমরা দেখতে পাই। সমাজের এই দ্বৈধ মানসিকতা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কোনোমতেই সমাজের কর্তারা ঠিক করতে পারছেন না গণিকা সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি হবে! সমাজে স্পষ্ট দুটো মনোভাব যেন বিদ্যমান। প্রথমটি হল 'গণিকা' একটা প্রয়োজনীয় অশুভ বৃত্তি আর দ্বিতীয়টি হল 'গণিকা' সর্বতোভাবে অশুভবৃত্তি ও পরিহার্য। মানুষ তো জানে অন্য সব বৃত্তির মতো এ বৃত্তিও সৃষ্টি হয়েছে সমাজের একটি অংশের পুরুষের প্রয়োজন মেটাতে। কোনো শিশুকন্যাই জন্মাবধি 'গণিকা' হয় না, সমাজই তাকে 'গণিকা'য় পরিণত করে পুরুষের স্বার্থে। এই দ্বৈধ মানসিকতার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, 'গণিকা' যদি 'পাপীয়সী'-ই হয় তো তার অর্থে দেওয়া দান তো সমাজের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তার অর্থের ফল ভোগ করতে সমাজের কোনো দ্বিধা নেই।

গণিকাদের মধ্যে ছিল নানা স্তর। সবচেয়ে নিচুস্তরের যে গণিকারা বেঁচে থাকার বাধ্যবাধকতায় এই বৃত্তিতে যোগ দিত, তাদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। অসম বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মধ্যেই

তারা জীবনধারণ করত। পুরুষ কখনো গণিকাকে পরিহার করে, আবার কখনো অপ্রতিহত কামনায় নারীকে 'গণিকা'য় পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এর ফলে পুরুষের গৃহে স্ত্রী-সন্তানকে অবহেলা করে অর্থ ও অনুরক্তি অন্য এক নারীকে উৎসর্গ করার মধ্যে গ্লানি ও অপরাধবোধ থাকে। এর জন্য সে নিজেকে দোষ দেয় না, দেয় গণিকাকে। অবচেতন মনে বহু অন্যায় সম্পর্কে সে অবহিত থাকে বলে তার সমস্ত চেতনসত্তা অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব গণিকার ওপর আরোপ করে দোষস্খালনের চেষ্টা করে। গৃহস্থ নারীর পক্ষে যে নানা কারণে এ আচরণ সম্ভব নয়, তা বুঝে তাদের অপরাধবোধ থাকে। সর্বোপরি, নারীর জীবনের সুস্থ বিকাশ রুদ্ধ হচ্ছে এবং মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমান ঘটছে— যার দায় চাপানো হচ্ছে গণিকা-র ওপর। উদ্বৃত্তভোগী ধনী ব্যক্তির হাত ধরে গণিকাবৃত্তি তৈরি হবার বাধ্যবাধকতা জন্ম নিয়েছে— তা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভোলানো হচ্ছে, পুরুষের এই যৌনক্ষুধা একদিকে 'কুলস্ত্রী' এবং অন্যদিকে 'গণিকা'দের মনুষ্যসত্তার ঐকান্তিক অপমান ঘটাচ্ছে।

অনেক সময় গণিকাদের স্ব-ইচ্ছায় যোগদানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ইতিহাসে দাসশ্রমের পাশাপাশি মজুরিশ্রম দেখা যায় এবং তার আনুষঙ্গিক হিসেবে ক্রীতদাসী মেয়েদের বাধ্যতামূলক আত্মদানের পাশাপাশি দেখা দেয় স্বাধীন নারীদের পেশাগত গণিকাবৃত্তি। কিন্তু এই প্রথা যা 'হেটোয়ারিজম' নামে আলোচিত, যার চূড়ান্ত রূপ 'গণিকাবৃত্তি'— সেখানে পুরনো যৌন স্বাধীনতা কিন্তু বজায় থাকছে শুধু পুরুষের জন্য।

অতীতের এই প্রথাগত হেটোয়ারিজম বিবর্তনের পথে যতই আমাদের পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন প্রণালীর ফলে বদলে যায় ও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হতে থাকে এবং যতই এটা নগ্ন পতিতাবৃত্তির রূপ নেয়, এর নৈতিক ফল ততই খারাপ হয়। এবং এতে নারীর চেয়ে পুরুষের অধঃপতন হয় বেশি। গোটা পুরুষজাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটে। বর্তমান জগতে 'একপতিপত্নী' প্রথা এবং 'পতিতাবৃত্তি' সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য বিপরীত একটি সামাজিক অবস্থার দুটি মেরু। তাই 'একপতিপত্নী' প্রথার বিলুপ্তি না করে 'গণিকাবৃত্তি'কে লোপ করা সম্ভব নয়।

একটি ব্যক্তির চেতনাবোধ-অনুভূতিকে দ্রব্যে পরিণত করার মধ্যে রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার কলঙ্ক। নারীর 'অধস্তন' অবস্থানকে কেন্দ্র করে যে প্রথার জন্ম, শুধু 'প্রাচীনতম বৃত্তি' বলে তা সমাজে টিকে থাকতে পারে না। দাসত্বের অবসান যদি আমরা চাই তাহলে স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত সন্তান জন্মানোর যন্ত্র 'কূলবধূ নারী' ও 'পতিতাবৃত্তি'— এই দুইয়ের অবসানের জন্য আমাদের কথা বলতে হবে। 'বেশ্যাবৃত্তি'তে বেচাকেনার বস্তু শুধু 'নারীর শরীর' নয়, যৌন-অনুভূতিও। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির মতো একটা বিমূর্ততাকে বেচাকেনার মাপকাঠি কি আদৌ আপেক্ষিকতার বাইরে নির্দিষ্টতায় পৌঁছে দিতে পারে— এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে।

বেশ্যাবৃত্তিতে তিনটি ব্যাপার সাধারণত থাকে—(১) টাকাপয়সা বা অন্য কোনো বস্তুর পরিবর্তে যৌনসম্পর্ক তৈরি করা হয়; (২) যে যৌন আনন্দ দিচ্ছে সে হবে 'বহুগামিনী'; (৩) যাদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রায়ই মনের কোনো যোগাযোগ থাকে না। সম্পর্কটা হয় ব্যবসায়িক। তাই 'বহুগামিনী' হলেই 'বেশ্যা' নয়। যে মেয়ে কেবল প্রেমের জন্য পর পুরুষকে দেহদান করে তারে 'ব্যভিচারিণী' বলা হয়। বেশ্যাবৃত্তি থাকলে সমাজে সাধারণত যে লক্ষণগুলি পাশাপাশি দেখা যায়—(১) বিবাহপ্রথা; (২) বিয়ের আগে মেয়েদের কুমারী থাকা; (৩) সমাজে নানা শ্রেণী-জাত-বর্ণ-লিঙ্গ মর্যাদার উচু-নিচু ভেদ। অর্থাৎ 'বেশ্যাবৃত্তি' সমাজের সার্বিক বৈষম্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শোষণমূলক বিনিময় ব্যবস্থা। একথা অবশ্যই সত্য, 'উপহার' হিসেবে শুরু হলেও গণিকাবৃত্তি দ্রুতই পরিণতি লাভ করে বৃত্তি বা জীবিকা অর্জনের উপায় রূপে, যা দাঁড়িয়ে থাকে দ্রব্য বা অর্থের বিনিময়ের ওপর। প্রশ্ন হলো, নিজের বিকাশ ঘটিয়ে সমস্ত প্রাণীজগতের উপরে মানুষ যেভাবে নিজেকে 'উন্নত' অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, সেখান থেকে নিছক একটা 'বিনিময়যোগ্য দ্রব্য' রূপে মানুষ নিজেকে দেখতে চাইবে কেন? সমাজে 'পুঁজিবাদী পণ্য'-র রূপান্তর অনেক বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিছক বেচাকেনার যে কোনো কিছুকে আগাগোড়া 'পুঁজিবাদী পণ্য' ছিল বলে সিদ্ধান্ত টানা নেহাত-ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাছাড়া যা কিছু টিঁকে আছে তাকে পূর্বাপর গড়পড়তা একই অবস্থায় টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব কেন মানবসমাজ নেবে? 'মানুষ' ও তার 'সভ্যতা'র বিকাশ ও প্রগতির পথে যা প্রয়োজন তা থাকবে, যা প্রতিবন্ধক তা থাকবে না। এসব কথার জন্য হয়তো আরও দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তবে সমাজ জুড়ে যেহেতু 'নারীদেহ' ও 'যৌনতা'কে ঘিরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা চলছে, তাই এই বিকল্প ভাবনাগুলোকে অনেক যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়ায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যে আমাদের এক আশু দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র ও তত্ত্বায়নে সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী

১. কমিউনিস্ট ইস্তেহার
২. পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি— ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
৩. মার্কসবাদ জানবো— মধুসূদন চক্রবর্তী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
৪. সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ— রেবতী বর্মন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
৫. প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ— সুকুমারী ভট্টাচার্য
৬. মহাভারতের নরনারী— শঙ্কর শীল, প্রতিভাস প্রকাশনা

প্রবন্ধ

হিন্দু নারী এবং বিবাহ ও আইন ১৯৫৫

শমিতা সরকার

হিন্দু বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৫) আজকের দিনের মেয়েদের অধিকার সম্পর্কিত ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যাপার। কিন্তু প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর পর্বের মতো এই আইন আসার আগে এদেশের (হিন্দু) মেয়েদের অবস্থার সংস্কারের একটি পর্ব চলেছে। শুরুতে তা নিয়ে দু-চার কথা বলা যাক।

ঔপনিবেশিক আমলে নারীদের জন্য বেশ কিছু সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল। অধিকাংশ সময় মেয়েদের বেঁচে থাকার সুযোগই ছিল ক্ষীণ। তাই সমাজসংস্কারকরা মূলত জোর দিয়েছিলেন যাতে সামাজিকভাবে মেয়েদের বেঁচে থাকার সুযোগ মেলে। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করে মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণের নামে সম্পত্তি দখলের জন্য মেয়েদের পুড়িয়ে মারা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা রদ হলেও বিধবাদের জীবন দুর্বিষহই ছিল। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং বহুবিবাহ কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি কারণে বহুসময় বিধবারা সমাজ এবং পরিবারের মধ্যে যৌন ও অন্যান্য নির্যাতন ও ঠগবাজির শিকার হত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে উদ্যোগী হন তখন তিনি উপরোক্ত সামাজিক কদাচারগুলি থেকে বিধবাদের নিষ্কৃতি দিয়ে তাদের মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে আরেকটি প্রয়োজনীয় প্রয়াসও তিনি নিয়েছিলেন। এই বিধবাদের যাতে পুনর্বিবাহের ব্যাপারে পরবর্তীকালে অস্বীকৃতির ফাঁদে পড়তে না হয় তাই জন্য চালু করা হয়েছিল বিবাহ নিবন্ধীকরণ বা registration। এরপর উনবিংশ শতকের শেষার্ধে Brahmo Marriage Act (১৮৭২) দ্বারা অন্য ধর্মের মহিলার সঙ্গে কোন হিন্দু পুরুষের বিবাহ যা হিন্দু লোকাচার মেনে বিবাহ হয়নি সেই ধরনের বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয়। এই প্রথম পুরুষ নারীর ধর্মাচরণ বিধি যাতে তাদের বিবাহের পথে আর অন্তরায় না হতে পারে তার আইনি স্বীকৃতিলাভ ঘটে। এছাড়া এই সময়েই বাল্যবিবাহ বিরোধী চিন্তাভাবনার ফলে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৪ করার সুপারিশ করা হয়।

মহারাষ্ট্রের রুকমাবাঈ প্রথম নারী যিনি নিজের বাল্যবিবাহের বন্ধনকে ছিন্ন করার প্রয়াস নিয়েছিলেন (১৮৮৭)— বিবাহে নারীরও সম্মতির প্রয়োজন সেই কথাটি তুলে ধরে। বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে তিনি বাল্যবিবাহ দ্বারা স্বামীর সঙ্গে থাকার চেয়ে শ্রীঘরবাসকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। এ নিয়ে সমাজ সংস্কারক বেহরমজি মালাবারির লড়াই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয়।

উনবিংশ শতকের শেষতম অধ্যায়ে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯৯) আর একটি দিকচিহ্ন। এর বিরুদ্ধে তিলক ইত্যাদির মতো চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশ জুড়ে বিরোধিতা করেছিলেন। সতীদাহ রদ এবং বিধবাবিবাহ আইনের মত সহবাস সম্মতি আইনও এসেছিল মেয়েদের তথা বালিকাদের বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য।

ঘটনার সূত্রপাত এরকম— মেদিনীপুরের এক দশ বছরের বালিকা চল্লিশ বছরের স্বামীর সাথে সহবাসের ফলে নিহত হয়। এই প্রথম ভারতের দণ্ডবিধির নিরিখে Marital Rape বা বিবাহ-অন্তর্ভুক্ত ধর্ষণের বিষয়টি হত্যার মামলা হিসাবে আদালতে ওঠে। বিচারে ঐ বালিকার স্বামীর একমাসের হাজতবাস হয়। এই নিয়ে সারাদেশে তোলপাড় হয়। যাদের আমরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী বলি তাঁরা কিন্তু এই নাবালিকা সহবাসের বিরুদ্ধে আইন তৈরির পক্ষে ছিলেন। এদের মধ্যে জাস্টিস রানাডে অগ্রগণ্য।

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে একদিকে কট্টর ব্রাহ্মণগণ বিধান দিচ্ছেন ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই কন্যার বিবাহ বিধেয়— অন্যদিকে শিক্ষিত উদারনৈতিক মানসিকতা সম্পন্ন মানুষরা এর বিরোধিতা করছেন। অনেক সময় অবশ্য বাল্যবিবাহের বিরোধিতার কথা বলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপরীত পথের পথিক হয়েছেন অনেকে।

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে রায়সাহেব হরিবিলাস গৌর সরদা ম্যারেজ রিস্ট্রেন্ট বিল আনেন, যা সরদা আইন (১৯২৯) নামে খ্যাত। এই আইনে বলা হয়, মেয়েদের বিবাহের বয়স অন্তত ১৪ বছর হওয়া উচিত। লালা লাজপত রায় এই বিলটি তাড়াতাড়ি পাশ করাতে আগ্রহী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলায় এই বিলের বিরোধিতা ছিল তুঙ্গে। আইনসভার সদস্য মুক্তাগাছার বিলেতফেরত জমিদার ডি কে লাহিড়ীচৌধুরি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

আজ যখন আমরা স্বাধীন ভারতে হিন্দু আইনের বিশ্লেষণ করি তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে আইনগুলি প্রাক-স্বাধীনতাকালে গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে আমরা লিঙ্গ সমতার প্রচেষ্টা রূপে বিবেচনা করতে পারি কি না।

পাঠকের কাছে এই প্রশ্ন রেখে আমরা চলে আসি স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আইন সংস্কার ও আইন তৈরির ক্ষেত্রে।

Imperial Penal Code থেকে যখন Indian Penal Code তৈরি হলো, সেই নতুন আইন লিঙ্গ বিভাজনকে কীভাবে দেখল? দেশের সংবিধানে বলা হলো, Equality of all in the eyes of law অর্থাৎ নারী পুরুষের সমানাধিকার। এখানে একটা বৈপ্লবিক

পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে বিবাহ সম্পর্ক এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে। নারী আর আইনত পিতার দানসামগ্রী নয়। স্বামীও তার 'ভাত-কাপড়ের ভার' নেওয়া প্রভু নয়। এই প্রেক্ষিতেই আমরা পরিবার ও সমাজে নারী পুরুষের অবস্থানগত তারতম্যের প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করবো, বিবাহ ও উত্তরাধিকার (হিন্দু) আইন কীভাবে দম্পতির জীবনকে দ্যাখে।

পুরনো ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী স্বামী হচ্ছেন প্রভু এবং নারী হচ্ছেন প্রভুর প্রজা। সমাজে নারীর প্রধান কাজ সন্তান ধারণ এবং তার লালন-পালন। বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর ইচ্ছার কোনো দাম ছিল না। সিদ্ধান্ত সবই পুরুষের। তবে স্বীকার করতে হবে যে সংস্কারের সদিচ্ছাকে বাস্তবায়িক করতে কতিপয় হলেও পুরুষরাই তৎপর হয়েছেন।

ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দিয়ে নারীকে রাজনৈতিক লিঙ্গ-সমতার একটা আইনানুগ পরিবেশ দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়। এর পাঁচ বছরের মধ্যেই আসে Hindu Marriage Act (1955)। এই প্রথম বিবাহ-প্রসূত সমস্যার ক্ষেত্রেও নারীকে সমানাধিকার দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা হলো। নারীর বিবাহবিচ্ছেদ চাইবার অধিকার, সন্তানকে নিজে পালন করার অধিকার, সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার আইনে স্বীকৃত হলো।

এখন দেখা যাক বিখ্যাত আইনবিদ ফ্লেবিয়া অ্যাগনেস কেন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে হিন্দু আইন সংস্কারকে বলেছেন 'stilted efforts at gender justice'। যে গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এই বাক্যবন্ধটি, সে গ্রন্থটির নামও এ প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— Law and Gender Inequality, অর্থাৎ তাঁর মতে, এ দেশের আইনের মূলে আছে লিঙ্গ সাম্য নয়, অসাম্যই।

১৯৫৬-র আইন হিন্দু নারীপুরুষকে পারস্পরিক ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয় নি— অথচ তার এক বছর আগে রচিত ১৯৫৪-র স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে তা ছিল। কারণ? আইনদাতারা বোধহয় ভেবেছিলেন, সমাজের কাছে এটা বড়ই 'র‍্যাডিকাল' পদক্ষেপ হয়ে যাবে! আসলে অসাম্যের বীজ থেকে গিয়েছিল আইন তৈরির মধ্যেই। ১৯৪১ থেকে ১৯৫৫— এই পনের বছরের হিন্দু আইন সংস্কার প্রচেষ্টাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে কী পাবো? তিনটি সংসদে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে— প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে, অন্তর্বর্তী সরকারের যুগে এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম পার্লামেন্টে। আর প্রতি পর্যায়ে মেয়েদের অধিকারে জল ঢালা হয়েছে— আসলে সদস্যরা তো ছিলেন সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই প্রতিভূ। এই আইন যারা এনেছিলেন সেই শাসকদলের রাজনৈতিক স্বার্থই তাদের কাছে প্রাথমিক বিচার্য থেকেছে, যদিও সাংসদরা মুখে বলেছেন 'নারীমুক্তি'র কথা।

১৯৪১ সালে যে হিন্দু ল' কমিটি তৈরি হয় তার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৩৭-এর আইনের ছিদ্রগুলি ভরাট করা। বিবাহ এবং উত্তরাধিকার নিয়ে এরা একটি সম্পূর্ণ কোড বিল তৈরি করেন। এর পরে আসে দ্বিতীয় হিন্দু ল' কমিটি ১৯৪৪, যা কিনা ১৯৪৭ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৪৮-৫১ অন্তর্বর্তী পার্লামেন্টে এ বিষয়ে বাকবিতণ্ডা আলাপ-বিলাপ চলে। অবশেষে একটি 'জল-মেশানো' বিল পেশ হয়। অবশ্য ১৯৫৫-৫৬ সালে সেটাও পাশ করানো সহজসাধ্য ছিল না। আগেই বলেছি, মূলত রক্ষণশীল অংশ থেকে বিরোধিতা আসার ফলেই এই অবস্থা ঘটে।

হিন্দু আইন সংস্কারকে তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন:

(১) কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতর থেকেই এর বিরুদ্ধে কীরকম বিরোধিতা ছিল;

(২) কোন্ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সংস্কার আইন পাশ জরুরি হয়েছিল;

(৩) কীভাবে এটিকে একদিকে একটি Code বা আইনপঞ্জী এবং অন্যদিকে নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

প্রথমে আসি বিরোধিতা প্রসঙ্গে। একটিমাত্র স্ত্রীকেই আইনসঙ্গত ভাবা, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার এবং কন্যাদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া নিয়েই মূল বিরোধ দানা বেঁধেছিল। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, শুধুমাত্র ভরণপোষণ নয় সম্পত্তির সমান এবং ন্যায্য অধিকার— এগুলি দিতে বুকে শেল বিঁধেছিল অনেকেরই। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গান্ধীর স্নেহধন্য সাবেকি কংগ্রেস নেতা পট্টভী সীতারামাইয়া, নতুন রাষ্ট্রের জাঁদরেল মন্ত্রী সরদার প্যাটেল, তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন— নামের তালিকা যে ফুরোতেই চায় না!

কট্টর দক্ষিণপন্থী ও হিন্দু কট্টরপন্থী দলের প্রতিনিধিরা তো এই আইনকে হিন্দুত্ববিরোধী ও ভারতীয়ত্ব-বিরোধী বলেই চিহ্নিত করে ফেললেন। আর তার সঙ্গে শুরু হল বিল পাশে দেরি করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সবধর্মের একই দেওয়ানি আইন বা Uniform Civil Code-এর জিগির। এইসময়ে বেশ কিছু মহিলা সাংসদ যারা আগে অনেক সময় Uniform Code-এর দাবি তুলেছিলেন তাঁরা লাইন বদলে নতুন বিলকেই সমর্থন করলেন। এটাকে কিন্তু একটি রাজনৈতিক রণকৌশল হিসেবেই দেখা উচিত, বিশেষত যদি আমরা বিষয়টিকে নারীবাদী ক্ষমতায়নের প্রেক্ষায় বিচার করি। কারণ যদি মহিলা সাংসদরাও Uniform Civil Code-এর দাবিতে অনড় থাকতেন তাহলে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল এবং নারীবিরোধী লবি-র সাথে একই অবস্থানে চলে যেতেন, এবং হয়তো তার ফলে নারী অধিকার আন্দোলনকে এগোনোর পথটা আরো কঠিন হয়ে পড়ত।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বিষয়টিতে। কেন এই আইন পাশ করানোটা রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। আসলে স্বাধীন ভারতে হিন্দুরা পূর্বতন তিনটি রাজনৈতিক কাঠামো থেকে

উদ্ভূত হয়েছিলেন— প্রাক-স্বাধীনতা যুগের উপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারত, রাজন্য-শাসিত অঞ্চল এবং আদিবাসী ও জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এজন্য 'হিন্দু' শব্দটিতে এক সর্বব্যাপী দ্যোতনায় দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল, যার মধ্যে সকল জাত ও গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা যায়। এ প্রসঙ্গে গবেষক অর্চনা পরাশর মনে করেন যে, আইনপ্রণয়কদের একটি hidden agenda ছিল। আইনে একধর্মিতা বা Uniformity এনে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা, রাষ্ট্রকে ধর্মের থেকে প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেয়েদের অধিকারগুলির আইনগত পুনর্বিবেচনার কথা ভাবা হয়েছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাছে জাতির ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক হিসেবে আইন সংস্কারকে ব্যবহার করাটাই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য প্রান্তিক জনজাতির বা দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রচলিত আইন বা customary right-গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। বিশেষত, মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার অনেক অঞ্চলে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বা অনেক জনজাতির মধ্যে পারস্পরিক বিবেচনা-প্রসূত সহজ বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত থাকলেও সেগুলিকে এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছিল।

উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নিঃসন্তান বিবাহিত নারীর সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর তার স্বামীর উত্তরাধিকারীদের উপর ন্যস্ত হবে, যদিও যে সম্পত্তি তার দ্বারা অর্জিতও হয় এবং তার পিতামাতা জীবিতও থাকেন তাহলেও তারা আইনত উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই।

আসলে আইনপ্রণেতাদের বেশিরভাগই ছিলেন কংগ্রেস দলের আইনজীবী, যাঁরা আবার ব্রিটিশ আইনই শিখেছেন। ফলত দেশ স্বাধীন হলেও এদের মধ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা ঔপনিবেশিকতার শিকড় উৎপাটিত হয়নি। সামাজিক বিবেক জাগ্রত করার কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ছাড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামাজিক সংস্কারের জন্য ব্যবহার করা— ওই ঔপনিবেশিক মানসিকতারই ফসল। ইংরেজি-শিক্ষিতরা তাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রচলিত মূল্যবোধ অনুসারেই কাজ করছেন।

তবে দেখা যায় যে, হিন্দু আইন সংস্কারের রাজনৈতিক সমীকরণ যেহেতু যথেষ্ট নড়বড়ে ছিল, রাষ্ট্রকে অনেক ক্ষেত্রেই শক্তি-সাম্যের কথা চিন্তা করে তবেই আইন সংস্কারের দিকে এগোতে হয়েছে। এজন্যই আইনের মোড়ক ছিল নারীমুক্তির, আধুনিকতার, অথচ তার আধার ছিল সাবেকি ব্রাহ্মণ্য লোকাচার উদ্বুদ্ধ। যে জন্য বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে স্বীকৃত হওয়ার জন্য সপ্তপদী-মঙ্গলাচারণকে প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও অনেক প্রান্তিক জাতি ও জনজাতির মধ্যে এই আচরণ আবশ্যিক নয়। ফলে এই আইনের চরিত্রে আধুনিক সাম্যের সংজ্ঞা কত দূর প্রযোজিত হয়েছে তা তর্কাতীত নয়।

এই আইনে কন্যাসন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তৎকালীন আইনমন্ত্রী সি সি বিশ্বাস ১৯৫৪ সালে সংসদে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধিতা জ্ঞাপন করেন। সম্পত্তি ভাগ প্রসঙ্গেও সংসদে প্রবল বিরোধিতার ফলে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বিবাহিত মেয়েদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। শুধুমাত্র পিতার স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত হয়। অন্যদিকে স্ত্রীধন, আইনত যা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি, বাস্তবে সেটিকে যৌতুক হিসাবে গণ্য করা হয়, ফলে নারী তার ওপর ব্যক্তিগত অধিকার পায়না— শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেটাকে বিবাহ উপলক্ষে তাদের উপঢৌকন হিসেবে দেখে। অনেক ক্ষেত্রে সেটা বধূনির্যাতনের বিষয়ও হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পরবর্তীকালে নতুন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন দিয়ে এই সমস্যাকে রোখার চেষ্টা হয়েছে। অথচ ঐ আইন আনার সময়ই মেয়েদের উত্তরাধিকার দিতে গিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে গেল-গেল রব উঠে যায়।

বিবাহ আইনে যে তথাকথিত 'সাম্য' আনার চেষ্টা হলো তার ফল কী হয়েছিল? বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের আইনি অধিকার লাভ করলেন। পাশাপাশি, পুরুষও কোন রোজগার না করে কর্মরতা স্ত্রীর থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার স্বীকৃতি পেলেন (right to remain unemployed!)। এই হলো আমাদের দেশের 'আধুনিক সাম্যের' স্বীকৃতি। অন্যদিকে, এই আইন পাশ হওয়ার পরে কর্মরতা মহিলাদের, বিশেষত যাঁদের চাকরির জন্য স্বামীর বাসস্থান ছেড়ে থাকতে হয়, আদালতের রায়ে তাঁদের রুজিরুটি রোজগারের সাংবিধানিক অধিকার ব্যাহত হচ্ছে। মহামান্য ন্যায়াধীশরা মনে করছেন, স্বামীর স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার অধিকার স্ত্রীর জীবনধারণের অধিকারের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সেই পুরোনো নীতি। স্বামী হচ্ছেন প্রভু— প্রভুর সেবা পাবার অধিকারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আদালত— 'Restitution of Conjugal Rights' আইনের জাঁতাকলে।

এটা যে এতটুকু বাড়িয়ে বলা নয় তার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

১) ১৯৫৮ সালে জনৈক রামপ্রকাশ ও তার স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর মামলায় আদালত রায় দেয় যে বিবাহ হচ্ছে একটি পবিত্র বন্ধন যা পবিত্র ঐক্য তৈরি করতে পারে— স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালন স্ত্রীর প্রথম কর্তব্য; অতএব বিবাহ বজায় রাখতে স্ত্রী দূরে চাকরি করতে যেতে পারবে না।

২) ১৯৬৪ সালে পাঞ্জাবে জনৈকা তীর্থ কাউর স্বামী কৃপাল সিং-এর আনা অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি দাম্পত্যপালন এবং চাকরি বজায় রাখা দুই ব্যাপারেই উৎসাহী। কিন্তু আদালত রায় দেয় যে স্ত্রীর চাকরি ছাড়তে না চাওয়া দাম্পত্য পালনের দায়িত্ব থেকে পলায়নী মনোভাবেরই প্রকাশ; অতএব তাকে হয় চাকরি ছাড়তে হবে অথবা বিবাহবিচ্ছেদ নিতে হবে।

(৩) ১৯৬৬ সালে মধ্যপ্রদেশের গয়াপ্রসাদের আবেদনে আদালত তার স্ত্রী ভাগবতের বিরুদ্ধে রায় দেন যে স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য তার অনুগত হয়ে থাকা, তাকে মান্য করা এবং একই ছাদের আশ্রয়ে থাকা; অতএব হয় তাকে বিবাহবিচ্ছেদ নিতে হবে অথবা চাকরি ছাড়তে হবে।

৪) ১৯৭৩ সালে গুরদীপ সিং ও সুরেন্দ্র কাউরের মামলায় দেখা যায় যে স্বামী দূরে চাকরি করতে যাচ্ছে, স্ত্রী নিজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার সাথে যেতে চাইছে না। এ ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ রায় দিয়েছিল যে হিন্দু আইন অনুসারে স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে স্বামীর অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

৫) ১৯৭৭ সালে হরিয়ানার অযোধ্যা প্রকাশ ও কৈলাশবতীর মামলায় দেখা যায় যে স্ত্রী বিবাহের আগে থেকেই কর্মরতা ছিলেন। বিয়ের ৭ বছর পর অবধি তিনি চাকরি ছাড়েন নি এই অজুহাতে restitution of conjugal rights-এর মামলা হয়। আদালত স্ত্রীকে বলে যে তাঁর দায়িত্ব ঘরে থাকা।

এই উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় যে, তথাকথিত 'আধুনিক' ও 'নারীমুক্তি'র পথিকৃত এই আইন এবং তার প্রয়োগ কীভাবে স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও নারীকে পরাধীন করে রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

ফলত, দেখা যাচ্ছে সরকারী রিপোর্ট (১৯৭১) অনুযায়ী সে সময়ে সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকুরিরতদের মধ্যে মাত্র ১১.৮৬% মহিলা— এদের মধ্যে বিধবা ও অবিবাহিত মহিলারাও আছেন।

তবে চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আসার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে থাকে ১৯৭৫ সাল নাগাদ।

গুজরাট হাইকোর্ট জনৈকা প্রভীনবেন ও তাঁর স্বামী সুরেশভাই-এর মোকদ্দমায় রায় দেয় (১৯৭৫) যে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেরই অধিকার আছে চাকরি করে রোজগার করার। মহিলা চাকরি করেন বলে দাম্পত্য বজায় রাখতে ইচ্ছুক নন একথা বলা যাবে না। একই সময়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টও রাধাকৃষ্ণ ও ধনলক্ষ্মীর মামলায় বলে যে স্ত্রী তার সন্তান ও নিজের জন্য রোজগার করতেই পারে।

১৯৭৮ সালে দিল্লী হাইকোর্টে পুর্বোল্লিখিত কৈলাশবতী ও অযোধ্যা প্রকাশের মামলায় পাঞ্জাব হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের দেওয়া রায়ের (১৯৭৭) বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে ন্যায়াধীশ দেশপাণ্ডে বলেন যে, বিবাহের পরে স্ত্রীর গৃহ কোথায় হবে সেই ব্যাপারে স্বামীর সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত— এটা সাংবিধানের সাম্যের অধিকারের পরিপন্থী; বিবাহিত নারীর চাকরি করার অধিকারকে এই রায়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হলো (স্বরাজ গর্গ ও আর এম গর্গের মামলা)।

এবার আসা যাক এই আইনের বহুবিবাহ রোধের ধারা প্রসঙ্গে। হিন্দু বিবাহ আইন খ্রিস্ট ধর্ম অনুসরণে একবার মাত্র দারপরিগ্রহর (স্ত্রী মৃত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন না হলে) বিষয়টি আইনসিদ্ধ করে। রক্ষণশীল হিন্দু মহলে এই আইন আনার সময় প্রবল ঝড় ওঠে। এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় Uniform Civil Code-এর দাবি। হিন্দু পুরুষরা মনে করতে থাকেন যে, মুসলিম পুরুষের তুলনায় তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু আইন যেহেতু ব্রাহ্মণ্য লোকাচার যেমন সপ্তপদীকেই বিবাহসিদ্ধতার আইনগত প্রমাণ বলে মেনে নেয় (বিবাহ নিবন্ধীকরণ যেহেতু হিন্দু আইনে বাধ্যতামূলক নয়), সেই সুযোগে প্রথম অথবা দ্বিতীয়া স্ত্রীকে না জানিয়ে বহুবিবাহ করার প্রবণতা রয়েই যায়। কেননা, আইন অনুসারে স্ত্রীকেই বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করতে হবে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভরণপোষণের দায় না নেবার সুযোগও হিন্দু পুরুষদের জন্য তৈরি হয়। স্বামীর সম্পত্তিতে বৈধ স্ত্রী এবং বৈধ সন্তানেরই একমাত্র অধিকার হওয়ায় বহু মহিলাকে সন্তানসহ পথে দাঁড়াতে হয়।

বহুবিবাহ রদ নিয়েই হিন্দু পুরুষের পক্ষ থেকে এই আইনকে আদালতে অসিদ্ধ সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। বোম্বে হাইকোর্টে এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টে একাধিক মামলা হয় এই বলে যে, এই আইন সাংবিধানের 'সাম্যের অধিকার', 'হিন্দুধর্মাচরণের অধিকার' খর্ব করছে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুসলমান পুরুষের বহুবিবাহের ধর্মীয় ও আইনগত সুযোগ থাকলেও তাদের আইনে আবার মহিলাদের বিবাহ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারও বেশি। তাদের বিবাহ সবসময়ই নথিভুক্ত, ফলে অস্বীকারের সুযোগ নেই। দেনমোহর নারীর অধিকার (যদিও এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটি কাগুজে অধিকারে পরিণত)। অন্যদিকে বহুবিবাহ রদ করা হলেও হিন্দু আইন পুরুষদের সুযোগ করে দিয়েছে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসার। তাই বোধহয় জনগণনায় দেখা যায়, বহুবিবাহের সংখ্যা মুসলমানদের চাইতে হিন্দুদের মধ্যে বেশি।

হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে হিংসাত্মক ব্যবহার (cruelty), স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়া (desertion) ও পারস্পরিক সম্মতিতে বিচ্ছেদের জন্য আইনও ছিল না। ১৯৭৬-এ তার পরিবর্তন আসে।

পরিশেষে বলা চলে হিন্দু বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৫)-এ লিঙ্গসমতা বা লিঙ্গন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অতি দুর্বল হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল— পরবর্তীকালে তাই পদে পদে প্রয়োজন হয়েছে নতুন নতুন আইনের।

সূত্রনির্দেশ

ফ্লেবিয়া অ্যাগনেস, *ল অ্যান্ড জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি*, ১৯৯৯
সুধীর চন্দ্র, *এনস্লেভড ডটারস*, ১৯৯৭
মনময়ী বসু, *হিন্দু উইমেন অ্যান্ড ম্যারেজ ল*, ১৯৯০
মধু কিশওয়ার, 'কোডিফায়েড হিন্দু ল', *ইপিডবলিউ* ২৯/৩৩, ১৯৯৪
অর্চনা পরাশর, *উইমেন অ্যান্ড ফ্যামিলি ল রিফর্ম*, ১৯৯২

প্রবন্ধ

মুসলিম নারীর জীবন

সাহানা খান

ধর্ম হলো স্বভাব বা গুণ, অর্থাৎ যা ধারণ করে প্রাণী ও পদার্থ টিকে থাকে। ধর্মের বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'ধৃ' ধাতুতে 'ম' প্রত্যয় যোগ। 'ধৃ'-এর অর্থ হল ধারণ বা পোষণ। পুরাণে ধর্মে পূজিত হচ্ছেন দেবতা, অথচ মারলিন স্টোন রচিত 'হোয়েন গড় ওয়াজ এ উওম্যান' বইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে প্রথমে পূজিত হতেন 'দেবী'। মারলিনের গবেষণালব্ধ ফল এই যে বহু নির্মমতা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যেমন নারীর অধিকার হরণ হয়েছে, তেমনই তার অধস্তনতাও 'প্রমাণ' করা হয়েছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে ঈশ্বরের লিঙ্গ পরিবর্তন। ধর্মশাস্ত্রের প্রধান কাজ 'কর্তব্য' ও 'নৈতিকতা'র মেলবন্ধন। ধর্মাচরণের দোহাই দিয়ে নৈতিকতার দায়ভার কেবল নারীর উপরই আরোপ করা হয়েছে।

কোন ধর্মই নারীর প্রতি সুবিচার করেনি। ধর্মের গোড়াপত্তন থেকেই নারী অবদমনের বীজ বপন হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের তিন সেমেটিক ধর্ম— ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলামে নারী সৃষ্টির কাহিনী নারীকে তার সৃষ্টির জন্য পুরুষের কাছে চিরঋণী করে তুলেছে। কথিত আছে যে নারীর জন্ম পুরুষের বুকের পাঁজরের হাড় থেকে। জন্মলগ্ন থেকেই নারী অধস্তনতার শিকার। (যদিও ইসলাম দাবি করে যে একমাত্র এই ধর্মেই নারীকে যথাযথ মর্যাদা/অধিকার দেওয়া হয়েছে।)

আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় ইসলাম ধর্মে নারীর সার্বিক অবস্থান নিয়ে। ধর্মগুরুরা দাবি করেন কোরান নাকি বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই যদি হয় তাহলে কোরানে বর্ণিত আদম ও হাওয়া-র জন্মপদ্ধতি কী করে বিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়? কোরানে আছে যে, (সুরা এরাযা-৭, ২০-২২) আদম ও হাওয়া শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়েই জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে। শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয়ে প্রথমে হাওয়া ও পরে আদম সেই ফল ভক্ষণ করে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, শয়তান দ্বারা নারীই প্রথম প্ররোচিত হয়েছে এবং তার অনুসারী পুরুষ। এভাবে নারীর পরনির্ভরশীলতার (আদি জন্মসূত্রে) ও সহজেই প্রলোভিত ও প্ররোচিত হওয়ার প্রবণতা (হাওয়া-র জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ) দর্শানো হয়েছে।

প্রাক্-ইসলাম যুগে নারীর অবস্থান

এবার আসা যাক ইসলাম-পূর্ব যুগে। সপ্তম শতকে আরব দেশে এই ধর্মের অভ্যুত্থান হয়। অধিকাংশ ইসলামিক ঐতিহাসিকদের মতে প্রাক্-ইসলাম আরব ছিল অন্ধকার যুগে— যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরঞ্চ ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীরা ছিল অনেক স্বাধীন। তা না হলে ঐ যুগে খাদিজার মতো ব্যক্তিত্বময়ী, ধনবতী ও বুদ্ধিমতী মহিলার দেখা মিলত না। খাদিজা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী এবং নিজেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাঁর অনেক পুরুষ কর্মচারীর মধ্যে মহম্মদও ছিলেন একজন। ইসলাম যুগ কিন্তু খাদিজার এই বুদ্ধিমত্তাকে কোন স্বীকৃতি দেয়নি। উল্টে তাঁকে মহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম গ্রহীতা একান্ত অনুরক্তা হিসাবে দেখানো হয়েছে। খাদিজা যদি প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী ও বুদ্ধিমতী না হতেন তাহলে মহম্মদকে বহুপত্নী লাভের জন্য খাদিজার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না। প্রাক্-ইসলাম যুগে আরব নারীরা প্রয়োজনে রণাঙ্গণেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ঐ যুগে নারীরা সংগীত চর্চাও করতেন। বহু প্রতিভাবান মহিলা কবিও ছিলেন সে সময়। কথিত আছে, মহম্মদের চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর ওপর প্রথম 'ঐশী' বাণী বর্ষিত হয়— যেটাকে ইসলাম ধর্মের জন্মমুহূর্ত বলা যেতে পারে।

ইসলাম পরবর্তী যুগ

এই নবীন ইসলাম ধর্ম দাবি করে যে একমাত্র ইসলামই নারীকে অন্ধকার যুগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আদতে ধর্ম যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রধান অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি তা আজ কারো অজানা নেই। ধর্ম এমনই একটা অস্ত্র যার ব্যবহারে শোষিত নারী নিজেকে আর শোষিত ভাবে না, ধর্মকে সে তার প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গীভূত করে নেয়। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। কোরানে নারীর প্রথম দর্শন দেখা যায়— সুরা বাকারা-য়। নিচে আয়াতটি তুলে ধরছি—

> তোমাদের স্ত্রীসকল তোমাদের ক্ষেত্র। অতএব যেরূপ ইচ্ছা হয় ক্ষেত্রে আগমনপূর্বক স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও...। (*সুরা বাকারা* ২/২২৩)

এখানে নারীকে কর্ষণের ভূমি ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ('স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও'-র তাৎপর্য স্বীয় জীবনের জন্য সন্তান কামনা করা— গিরীশচন্দ্র সেন কর্তৃক কৃত ব্যাখ্যা) হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নারীর মতামত মূল্যহীন, জড়পদার্থবৎ মৃত্তিকার ন্যায়।

> পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন বলিয়া এবং তাহারা (পুরুষরা) নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়া...।
>
> (*সুরা নিসা* ৪/১৪)

কোরানেই যখন পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে নারীকে অধীনস্থ করার বিধান দেওয়া আছে তখন অধিকার বা সমকক্ষতার প্রসঙ্গ অবান্তর। অধিকার যা দেওয়া আছে তা একমাত্র

নিঃশর্তভাবে পুরুষের উচ্চ স্থান মেনে নিয়ে বশ্যতা স্বীকারের।

অথচ, দাবি করা হয় যে কোরানে নর-নারীর মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়েছে (ড. ওসমান গণি : *ইসলাম ও নারী সমাজ*)। তাঁর উদ্ধৃত দুটি আয়াত—

> বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজে আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে।''
>
> (*সুরা তওবা* ৯/৭১)
>
> তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'' (*সুরা বাকারা* ২/১৮৭)

ব্যভিচারের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে কিন্তু কোরানে নর-নারীর মধ্যে বৈষম্য লক্ষিত হয়। ব্যভিচারের শাস্তি নারীর ক্ষেত্রে—

> এবং যদি তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোরতর অশ্লীল আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে তোমরা চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু ঘটে...। (*সুরা নিসা* ৪/১৬)

পুরুষের ক্ষেত্রে—

> এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ উহাতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও...।''
>
> (*সুরা নিসা* ৪/১৭, *কুরাণ মজিদ*, বাংলা অনুবাদ)

উপরোক্ত চারটি আয়াতের মধ্য দিয়ে কোরানের স্ব-বিরোধিতা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে নর-নারীর সমতা দানের কথা বলা হয়েছে আবার অপরদিকে একই অপরাধে নারীর শাস্তি আমৃত্যু এবং পুরুষের ক্ষেত্রে মৃত্যু তো দূর অস্ত্ বরং অন্যায় স্বীকারে মার্জনার কথা বলা হয়েছে। এত সূরা বা আয়াতের উদ্ধৃতির কারণ একটাই— ধর্মগ্রন্থের বিধানের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিকতা যে নারীকে কোন্ শিকলে আবদ্ধ করেছে তা জানা থাকলে নারীর অগ্রগতির অন্তরায় সহজেই বোধগম্য হয়।

বিশ্বে এমন কোন ধর্মই নেই যেখানে নারীকে কয়েদ করে রাখার জন্য নিত্যনতুন নিয়মাবলীর আবির্ভাব হয়নি। হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলিম ও অন্যান্য সব ধর্মেই নারী কীটস্য কীট বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম ধর্মে ভালো কিছু দিক আছে, কিন্তু তা নারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তা হলো, ইসলামে বর্ণ ভেদাভেদ নেই, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা-জনিত কিছু বিধান রয়েছে, বিধান আছে প্রতি বেলা খাওয়ার সময় প্রতিবেশী অভুক্ত আছে কিনা জানার, অভুক্ত থাকলে নিজেদের খাবার তার সাথে ভাগ করে খাওয়ার, ইত্যাদি।

আজকের ভারতে মুসলিম নারী

এবার আসা যাক মুসলিম নারীদের আজকালকার অবস্থান প্রসঙ্গে। তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ ভারতেও মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই একই দমনমূলক নীতি— তাদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাধীনতা, চলাফেরা, সাজপোশাক (বোরখা বা হিজাব)— এক অর্থে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যাবতীয় কিছুকেই ধর্মের মোড়কে ভরে খর্ব করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাধারী ধর্মীয় গুরুরা।

পরিচিতির বিপন্নতা: এই সম্প্রদায়ের নারীদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মের অজুহাতে চাপানো নিয়মাবলীর বেষ্টন (বোরখা, হিজাবের বাধ্যতামূলক ব্যবহার) ও চলাফেরার সীমাবদ্ধতা থেকে একটা বদ্ধমূল ধারণা এদের সম্পর্কে পোষণ করা হয় যে, তাদের সবকিছুই যেন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ফসল। যার ফলে তাদের অধস্তন অবস্থান, অবদমন সবই মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সাথে একাকার করে দেখা হয়। কিন্তু মুসলিম অধিকাংশ মেয়েদের অনুভব এই যে তারা সংখ্যালঘু দলভুক্ত। সেই কারণে তাদের মধ্যে একরকম পরিচিতির বিপন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলামেশার পরিধিও সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। নিজেদের বাড়ি ও সম্প্রদায়ের বেষ্টনীর মধ্যেই তারা নিরাপদ বোধ করে।

অবরোধ প্রথা: বোরখা বা হিজাব-এর ব্যবহার মুসলিম মেয়েদের বহির্জগতে সাবলীল চলাফেরা করার এক প্রধান অন্তরায় ও সমস্যা। কোরানের সূরা নূর (২৪/৩০), সূরা আহ্‌যাব (৩৩/৫৯) ইত্যাদি কোনো কোনো আয়াতে নারীদের শরীর আবৃত করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। মহম্মদ নিজেই পত্নীদের অবরুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মহম্মদের বহু পত্নী লাভের মতো পর্দা প্রথারও আবির্ভাব ঘটেছিল খাদিজার মৃত্যুর পর। এই হিজাব বা বোরখা পরা মেয়েদের কর্পোরেট ও অন্যান্য সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বোরখা পরিহিতা মেয়েরা অভিযোগ করেন যে তাঁদের প্রকাশ্য স্থানে, যেমন বাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে হেনস্থার শিকার হতে হয়। তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র সহ সর্বত্র যোগদান করতে ইচ্ছুক কিন্তু সামাজিক বা পারিবারিক চাপে বোরখা বা হিজাব ছাড়া তাঁদের বাইরে বের হওয়া সম্ভব হয় না।

বোরখা ব্যবহারের প্রচলনটা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কম, অবাঙালি মুসলিমদের মধ্যেই বেশি। যেহেতু ইদানিং এইসব মহিলারা শিক্ষা থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্র যোগদানে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তাই আগের তুলনায় রাস্তাঘাটে বোরখা পরিবৃতাদের বেশি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে আগে বাঙালি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বোরখা মোটেই দেখা যেত না। আজকাল সেখানেও বোরখার কিছুটা চল হয়েছে, যদিও এখনো পর্যন্ত শাড়ীর উপর গায়ে চাদর ঢাকা দেওয়ার প্রচলনটাই বেশি। আজকাল সর্বত্র মসজিদ ও মাদ্রাসার বাড়বাড়ন্ত হওয়ায় ধর্মগুরুদের পরিবারের মেয়েরা বাধ্য হচ্ছেন বোরখা বা হিজাব

ব্যবহার করতে এবং তা অন্যান্য পরিবারের মহিলাদের মধ্যেও চারিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরো ভয়ংকর, গ্রামের দিকে দেখা যায় সাত/আট বছরের বাচ্চা মেয়েরাও হিজাব পরে মক্তবে পড়তে যেতে বাধ্য হচ্ছে। লিঙ্গ-বৈষম্য কী তা বুঝে ওঠার মত পরিণত হওয়ার আগেই তাদের মধ্যে অবরোধের বীজ বপন করা হচ্ছে। কট্টরপন্থী দেওবন্দ দার-উল-উলুম কর্তৃক কর্মরতা মুসলিম নারীদের উপর জারি করা ফতোয়া ও তার অনুসারী আরো অন্যান্য ফতোয়ার ফলে মুসলিম মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথ আরো কঠিন হয়ে ওঠে।

ফতোয়া: ২০১০-এর ৪ঠা এপ্রিল দার-উল্-উলুম-র জারি করা ফতোয়ার বক্তব্য— "মুসলিম নারীদের সরকারি, বেসরকারি সব সর্বক্ষেত্রে শরীর সম্পূর্ণ আবৃত না করে চাকরি করা চলবে না, কারণ সেখানে পুরুষদের সংস্রবে আসার ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকে"। অর্থাৎ অন্যভাবে দেখতে গেলে নারী পরিচালিত সংস্থা, নারী সহকর্মী ও নারী গ্রাহক হলে তবেই মুসলিম মহিলাদের চাকরি করার অনুমতি দেওয়া যাবে। যা কার্যত অসম্ভব। এটা মানতে গেলে পাবলিক সেক্টরে কাজ করা এই মহিলাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না, কারণ ঐ সমস্ত কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরে কাজ করা যেমন অসম্ভব তেমনই পুরুষ সহকর্মীদের ও অপরাপর পুরুষদের সাথে বাক্যালাপ ছাড়া কাজ করাও অসম্ভব। এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজও করা যাবে না। তা সে পঞ্চায়েত বা লোকসভা যাই হোক না কেন। কতিপয় মেয়েদের স্কুল, মক্তব, দরজির কাজ— এই ধরনের কয়েকটি জায়গা খোলা থাকছে মুসলিম নারীদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে। কাজের ক্ষেত্র একেবারে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। কট্টরপন্থীদের এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রচারমাধ্যম, মহিলা সংগঠন ও মুসলিম সমালোচকদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে দার-উল-উলুম তড়িঘড়ি ঘোষণা করে যে এই ফতোয়া মুসলিম মেয়েদের কাজে যোগদানে নিষেধ করছে না। তাদের মুখপাত্র হিসাবে দেওবন্দ মাদ্রাসার মৌলবী আদনান মুন্সী দাবি করেন যে এই ফতোয়া কেবল কর্মরতা মেয়েদের বোরখা ব্যবহারের উপরই জোর দিচ্ছে।

এই ফতোয়ার ফলে কিন্তু চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের মুখে পড়ছে দরিদ্র পরিবারগুলো। ঐসব দরিদ্র পরিবারের কী হবে যাদের মেয়েদের বাইরে কাজ করাটা অত্যন্ত জরুরি সংসারের অন্নসংস্থানের জন্য? তা সে শ্রমিক, পরিচারিকা যে কোন কাজই হোক না কেন? অনেক পরিবার আছেন যারা ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান এবং সবাই না হলেও কেউ কেউ এই ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করতে ভয় পান এবং অমান্য করাকে 'হারাম' বলে মনে করেন। ২০১০ সালের আগে ২০০৮-এর ২৫শে জুন 'দার-উল-উলুম' ফতোয়া জারি করেছিল— "মেয়েদের চাকরি করা ভাল জিনিস নয়, কারণ বোরখা পরা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে তাদের অপরিচিত পুরুষের সংস্রবে আসতে এবং কথাবার্তা বলতে হবে যা কিনা খুবই খারাপ কাজ। বিবাহ পরবর্তী দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়, সুতরাং মেয়েদের কাজ করার কোন প্রয়োজনই নেই।" ওয়েবসাইটে প্রকাশিত দেওবন্দ্ মাদ্রাসার ফতোয়া তো আরো জঘন্য— "মুসলিম নারীরা বোরখা পড়তে বাধ্য। এমনকি তাদের মুখও সম্পূর্ণ আবৃত থাকা উচিত পরপুরুষের সামনে। আরো ভালো হয় যদি সে তার চোখটাও ঢেকে রাখে। এমন কি মুসলিম, অ-মুসলিম নারীদের সামনেও পর্দা রক্ষা করতে হবে।" এরকম আরো অনেক ফতোয়া জারি করা হয়েছে।

কিন্তু অবরোধের যে শিকড় এঁদের মন ও শরীরের গভীরে প্রোথিত করার চেষ্টা অহরহ চলেছে তাকে উপড়ে ফেলে মুসলিম নারীরা আগুয়ান হচ্ছেন। আশার আলো দেখিয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাসন্তীর ফতেমা মোল্লা (অঞ্চল প্রধান), জয়নগরের তহুরা বিবি (পঞ্চায়েত সদস্য), উত্তর চব্বিশ পরগণার সুহানা খান (পঞ্চায়েত সদস্য) ইত্যাদি। এদের মধ্যে শিক্ষিত যেমন আছেন, নিরক্ষরও আছেন। তহুরা বিবি যেমন পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পর নাম স্বাক্ষরসহ কিছুটা পড়াশোনা শিখেছেন নিজস্ব তাগিদেই। শুধু তাই নয় নিজের সন্তানদের ও অন্যদের সন্তানদেরও স্কুলে যেতে বাধ্য করেছেন। এই বোধ কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া নয়, সম্পূর্ণ অন্তরের তাগিদ।

কর্মক্ষেত্র : অনেক মুসলিম নারী স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত, কিংবা ছোটখাট সংস্থায় কাজ করেন— অনেক সময় সেই সংস্থার মালিকও কোনো মুসলিম নারী। সেলাই, এমব্রয়ডারি, জরির কাজ, পোশাক তৈরির কারখানা, বিড়ি বাঁধা, ধূপ তৈরি, চিকনের কাজ ইত্যাদি কাজেই বেশি সংখ্যক মহিলারা যুক্ত হন। এইসব কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কম বেতন, শৌচাগারের অভাব, কাজের খারাপ পরিবেশ, ক্রেশ না থাকা, সামাজিক নিরাপত্তা যেমন স্বাস্থ্য বিমার অভাব। আজকাল বেশির ভাগ রাজ্যেই নানান ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে সাথে এইসব প্রকল্পগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যা মুসলিম নারীদের ক্রমাগত দারিদ্র্যের দিকেই ঠেকে দিচ্ছে।

এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের ঘরে বসে কাজ করার প্রবণতার একটা বড় কারণ কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অভাব, শিক্ষার অভাব, কারিগরি দক্ষতার অভাব তাদের ঠেলে দেয় কম দক্ষতার ও কম বেতনের কাজে, পরিণতি সেই দারিদ্র্য। ক্রমাগত যেন দারিদ্র্যের বলয়ের মধ্যেই তারা ঘুরপাক খাচ্ছে। গৃহকেন্দ্রিক কাজের ফলে এঁরা বাইরের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হন এবং নিজেদের সংগঠিত করতে ব্যর্থ হন। এঁরা দর কষাকষিও বিশেষ করতে পারেন না কারণ অধিকাংশ কাজই তারা কাজ পান ঠিকাদারের মারফত, সরাসরি মালিকের কাছ থেকে নয়। এর ফলশ্রুতি, কাজের কম সুযোগ ও কম বেতন। এমনও আছে যে অনেক মুসলিম মহিলা

জানেনেই না যে কে তাদের নিযুক্ত করছে। তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাই সরাসরি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। খুব স্বল্প সংখ্যক মহিলাই সরকারের ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচির সাথে যুক্ত হন, যথা— স্ব-নির্ভর প্রকল্প, পঞ্চায়েত রাজ ইত্যাদি।

শিক্ষিত মহিলারা ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির ফাঁসে ও অবহেলার কারণে সরকারি, বেসরকারি সহ সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রেই কম যোগদান করেন। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েও চাকরি করতে অনীহা প্রকাশ করেন। ভয় পান সমাজের রক্তচক্ষুর।

বিবাহ : ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তি। ইসলামি বিয়ের চুক্তির ব্যাখ্যা নিয়ে হুমায়ুন আজাদ তাঁর 'নারী' গ্রন্থে আনোয়ার আহমেদ কাদরির একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন— ''ইহা এমন এক চুক্তি যাহার দ্বারা একজন পুরুষ কর্তৃক একজন নারীকে সম্ভোগের অধিকার দ্বারা দখল করা বুঝায়।'' এই বিবাহে পুরুষ প্রথমে নারীর কাছে প্রস্তাব (ইজাব) পাঠাবে ও নারী তা স্বীকার (কবুল) করবে। নারীর তরফ থেকে প্রস্তাব পাঠানো অবান্তর প্রশ্ন। বিয়ে সম্পন্ন হয় একটি চুক্তিপত্রের (নিকাহ্‌নামার) মাধ্যমে।

কয়েক বছর আগে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড একটি আদর্শ নিকাহ্‌নামা তৈরি করেছিল যা এখনো পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। সেই 'আদর্শ' নিকাহ্‌নামায়ও অবশ্য মুসলিম নারীদের কোনরকম অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়নি। তিন তালাকের প্রথায় সম্মতি প্রদান করা আছে। মেয়েদের বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট করা নেই অর্থাৎ বাল্য বিবাহ চলবে। চলাফেরার স্বাধীনতা বলতে তা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ। মেয়েদের তালাক (খুলা) দেওয়ার কোন প্রস্তাব এই নিকাহ্‌নামায় নেই। নিকাহ্‌নামায় একটি হলফ্‌নামা রাখা হয়েছে যেটি উভয়কেই কাজি এবং দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করতে হবে। হলফ্‌নামায় উভয়ের বৈবাহিক জীবনের যে নির্দেশিকা পেশ করা আছে তা পিতৃতন্ত্রের বক্তব্য। আদর্শ নিকাহ্‌নামা তৈরির প্রস্তাবের সময়ই বোর্ডের তরফে এই অভিমত পেশ করা হয় যে ''তালাকের অধিকার পুরুষের হাতেই থাকা উচিত কারণ বিবাহের আর্থিক দায়ভার যেহেতু পুরুষকেই বহন করতে হয়।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা—১০/১০/২০০৪) অল ইন্ডিয়া মুসলিম উওমেন পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শায়েস্তা আনোয়ার বলেন যে ''এই নিকাহ্‌মানা মুসলিম নারীদের বঞ্চিত করেছে।''

তালাক : বিয়ের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে আসে তালাক এবং একসাথে তিন তালাকের বহুল অপব্যবহার। একবারে তিন তালাক দেওয়ার কথা কোরানেও নেই। কোরাণ অনুসারে, পুরুষ কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রীকে তিনমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরুষ চাইলে অবশ্য স্ত্রীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলেও পুনরায় সংসার করতে পারবে না। তখন তাদের আবার বিবাহ করতে হবে। কিন্তু তৃতীয়বার তালাকের পর স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করতে হলে অন্যত্র তার বিয়ে দিতে হবে এবং যদি ঐ দ্বিতীয় পুরুষ তাকে তালাক দেয় তবেই সে পূর্বোক্ত স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। তালাকপ্রাপ্তা নারীকে খোরপোষ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়, নির্ভর করবে পুরুষের সদিচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর।

নারী তালাক দিতে পারে এমন কথা কোরানে নেই। তবে কোরাণের ব্যাখ্যাকাররা বলেন যে, স্ত্রী তালাক চাইতে পারে যদি স্বামী অনুমোদন করে। আরবিতে স্ত্রী কর্তৃক তালাক দেওয়ার প্রথাকে 'খুলা' বলা হয়। সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে দেনমোহরের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। স্বামীর সম্পত্তির উপরও তার কোনরকম অধিকার থাকে না।

২০১০ সালের ডিসেম্বরে তিন তালাকের শরিয়তি বিধানের বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের আইনি সহায়তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে 'বেঙ্গল ফোরাম ফর মুসলিম উইমেনস্ রাইট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট' নামে মুসলিম মহিলাদের একটি সংগঠন। ফোরামের আহ্বায়িকা আফরোজা খাতুনের কথায়, ''ধর্মের নামে মুসলিম নারীদের উপর যে নির্যাতন চলে তার অবসান ঘটাতে গেলে বিয়ে, তালাক বা সম্পত্তির সমানাধিকারের মতো বিষয়গুলোকে ধর্মের পরিসর থেকে বার করে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আনতে হবে। আমরা এটাই বলছি।'' দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ফোরাম ৯/১২/১০ কলকাতায় রাজ্যস্তরের এক সম্মেলনের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, ৯ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার জন্মদিন। আফরোজা আরো বলেন যে, তালাকের এই যথেচ্ছাচারের শিকার হন হতদরিদ্র পরিবারের মেয়েরা। আর্থিক দুরাবস্থা ও নিপীড়ন কতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা উঠে এল ফোরামের আর এক নেত্রী খাদিজা বানুর কথায়— ''মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া, ডোমকল, রাণীনগর, ইসলামপুর, জলঙ্গী ও বেলডাঙ্গার একশো গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে প্রতিটি গ্রামে অন্তত দশজন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার দেখা পেয়েছি। একটা গ্রামে ষাটজনকেও পেয়েছি। অথচ জঙ্গীপুর মহকুমায় ওদের সংখ্যা তুলনায় কম। কারণ সেখানে মেয়েরা বিড়ি বেঁধে কিছু রোজগার করেন।'' এদিনের সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার দক্ষিণপাড়া গ্রামের জ্যোৎস্না খাতুন, ডোমকল থানার শ্রীপতিপুর গ্রামের সাবিনা, শেফালি বা ফিরদৌসির মতন তিন বোন কিংবা বেলডাঙা থানার মির্জাপুর গ্রামের সাধনা খাতুনের জীবনের চালচিত্র প্রায় একইরকম। সাবিনার কথাই ধরা যাক— বিয়ের পর পণ পরিশোধ করতে

পারেনি তার বাবা। তাই মেরে হাতের আঙুল বাঁকিয়ে দিয়েছে তার স্বামী। তারপরও পণ আদায় না হওয়ায় কাফ সিরাপের সাথে বিষ মিশিয়ে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল। সাবিনা কোনমতে প্রাণটুকু হাতে করে পালিয়ে আসে শ্বশুরবাড়ি থেকে। এই পালানোর অপরাধে স্বামী তালাক দেয়। সাবিনার বাড়ি মনে করে তালাক অবৈধ, কিন্তু গ্রামের সমাজপতিরা জানান তালাক না মানলে একঘরে করে দেবেন। বাধ্য হয়ে তালাক মেনে নেয় সাবিনা এবং আদালতের দ্বারস্থও হয় ন্যায়বিচারের আশায়। আদালতের খরচ জোগাতে গিয়ে পরিবারটি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। সাবিনারা তিন বোনই তালাকপ্রাপ্তা। উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত শায়েস্তানগরের তফুরা বিবির তালাক কিন্তু পণজনিত কারণে নয়, খুবই তুচ্ছ কারণে হয়েছে। মীর মন্ডল ও তফুরা একে অপরকে ভালোবেসেই দুই বাড়ীর সম্মতিক্রমে বিয়ে করেছিল। বিয়ের কয়েকমাস পর থেকে তার স্বামী তাকে রাত্রে শাড়ি খুলে রেখে ঘুমাতে বলতো, তাহলে কাপড় বেশিদিন টিকবে। এই অসম্মানজনক প্রস্তাবে তফুরা রাজি না হওয়াতে মীর তাকে তালাক দেয়। এখন অবশ্য অন্যত্র বিয়ে করে তফুরা ভাল আছে, কিন্তু ক'জনের জীবনে তা সম্ভব হয়?

তিন-তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাইলে, অন্য পুরুষের সাথে তার বিয়ে দিয়ে 'দাম্পত্য সম্পর্ক' গড়িয়ে তারপর তার কাছ থেকে তালাক করিয়ে নিয়ে সেই স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণের পদ্ধতি জঘন্য ও ন্যক্করজনক। কোরানে বর্ণিত এই বিধানের ফল যে কত মারাত্মক তা ২০০৫ সালের একটি খবরের উদাহরণ টেনে বলা যায়। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ব্লকের কাজিশা গ্রামের এক বধূ লতিফুন্নেসাকে তার স্বামী ফৈজল শেখ রাগের মাথায় তালাক দেন। পরে ভুল সংশোধন করতে ও ভালোবাসার টানে ধর্মীয় বিধান না মেনেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। এই অপরাধে তাদের বছর দুয়েক 'একঘরে' থাকতে হয়েছে। একদিনের যমজ শিশুর মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন ফৈজল শেখ ও তাঁর বাবা খিলাফত। সন্তান অবৈধ এই অজুহাতে গ্রামে কবর দিতে দেওয়া হয়নি। মৃত সন্তানের মা লতিফুন্নেসাকে জোর করে শরিয়তি বিধান পালনের জন্য এক আত্মীয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী শ্বশুর না চাইলেও সমাজের চাপে মেনে নেন। লতিফুন্নেসা কিন্তু এই অবিচার মেনে নিতে পারেন নি। তাই বিয়ের দিন সকালে তিনি আত্মহত্যা করেন। কতশত প্রাণ যে এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় বিধানের সাঁড়াশি আক্রমণে তার হিসাব নেই।

'বেঙ্গল ফোরাম ফর মুসলিম উইমেনস্ রাইট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট' তালাকের বিরুদ্ধে আইনি রক্ষাকবচ সহ বহু বিধান রদ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারে মুসলিম নারীর অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়াও চাইছেন মুসলিম সমাজে দত্তক আইনের প্রচলন এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের স্বার্থে স্বনির্ভর প্রকল্প।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে শরিয়তি এই বিধান বলবৎ আছে যে— "বাবা বেঁচে থাকলে পুত্রের মৃত্যু হলে তার 'সন্তান ও স্ত্রীর' সম্পত্তির উপর দাবি থাকবে না।" মুর্শিদাবাদের রানীনগর ব্লকের তাহিরা এই আইনের জ্বলন্ত উদাহরণ। তেরো বছরে তাহিরার বিয়ে হয়। একটি শিশু নিয়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাহিরা বিধবা হন। শ্বশুর বর্তমান থাকতে স্বামী মারা গেলেন, তাই তাহিরা ও তাঁর সন্তান শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির কোন অধিকার পান নি। এমনকি স্বামীসহ বাস করার ঘরটিতেও তার ঠাঁই হয়নি। শরিয়তি আইনের ধাক্কায় সন্তানসহ তাহিরা আজ বেঘর হয়েছেন। এমন ঘটনা অজস্র মুসলিম নারীর জীবনে ঘটে চলেছে।

সম্প্রতি (২০১৩ এপ্রিল) মৌখিক তালাক ও তিন-তালাকের ঘৃণ্য ন্যক্কারজনক বিধান ও অত্যাচারের প্রতিবাদে একজোট হয়েছিলেন এমন ঘটনার শিকার হওয়া মুসলিম মহিলারা। 'ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত একটি সাধারণ সভায় জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, ওড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, গুজরাট, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যগুলিতেও এমন ঘটনার প্রচুর উদাহরণ আছে।

রাজস্থানের আনোয়ার জাহানের কথাই ধরা যাক। মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী রোজগার তো করতেনই না উল্টে মারধোর করতেন। একদিন রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসলেন। আনোয়ার বাড়ি ছাড়তে রাজি হলেন না। আদালতে গেলেন। তবু শেষ রক্ষা হল না। মহারাষ্ট্রের ফইমিদার জীবনটা আবার অন্যরকম। বিয়ের আগে স্বামীকে বলেন নি তাঁর চশমা আছে। শুধু সেজন্য তাঁকে অপমান থেকে শুরু করে মারধোরও সইতে হয়। তারপর একদিন তাকে মৌখিক তালাক দেন। ঐ সংগঠনের আহ্বায়ক রহিমা খাতুন বলেন, "অধিকাংশ মেয়েই তালাকের কোরানের বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের দেশেও তালাকের নিয়মাবলী আলাদা করা নেই।" তিনি এও বলেন যে, "নিকাহ্নামা হতে হবে মেয়েদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে, যাতে ইচ্ছেমতো মেয়েদের কেউ ঠকাতে না পারে।"

শিক্ষা: ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ১৩.৪% এবং মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার ৫৯.১%। পশ্চিমবঙ্গে ২৫.২% বাসিন্দা মুসলিম। মুসলমানদের ৮৪.২৬% গ্রামাঞ্চলে এবং ১৫.৭৪% শহরাঞ্চলে বাস করেন। রাজ্য স্তরে শিক্ষার পরিসংখ্যানে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলে মুসলিম মহিলাদের ৫৯% ও গ্রামাঞ্চলে ৪৩% শিক্ষিত। (অ-মুসলমান মহিলাদের শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতর হার যথাক্রমে ৮২% এবং ৬৮%)

কয়েকটি রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা এবং মুসলিম ও অ-মুসলিম মহিলাদের সাক্ষরতার হার					
		সাক্ষরতার হার (%)			
রাজ্য	*মোট* মুসলিম জনসংখ্যা	*শহরাঞ্চল* মুসলিম মহিলা	অ-মুসলিম মহিলা	*গ্রামাঞ্চল* মুসলিম মহিলা	অ-মুসলিম মহিলা
পশ্চিমবঙ্গ	২৫.২	৫৯	৮৭	৪৮	৬৮
কেরালা	২৪.৭	৮৭	৯৫	৮৫	৯০
উত্তরপ্রদেশ	১৮.৫	৪৭	৮১	৩২	৪১
বিহার	১৬.৫	৫৭	৭৭	২৮	৩৪
জম্মু-কাশ্মীর	০৬.৭	৫২	৮৮	৩০	৫৫
কর্ণাটক	১২.২	৭১	৮৫	৫২	৫৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	০৯.২	৬৭	৭৮	৪৮	৪৬
দিল্লী	১১.৭	৫৯	৮৭	৪৯	৭২

(সূত্র: জনগণনা ২০০১)

মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষায় পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। তাছাড়াও পরিবারগত গোঁড়ামিও খানিকটা দায়ী বিশেষত মেয়েদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণেই কয়েকটি শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পরেই মেয়েদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলছুটের সংখ্যা মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি। কারণ আর্থিক অনটনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মায়েদের কাজে বের হতে হয়। তখনই বাচ্চা মেয়েটিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ঘর সামলানোর কাজে যুক্ত করা হয়। কখনো বা পরিচারিকার কাজেও নিযুক্ত করা হয় উপার্জনের জন্য। অনেক সময় মা-বাবা শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান— অর্থাভাবই এর মূল কারণ। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি স্কুল খুবই কম। থাকলেও সেখানকার পঠনপাঠন নিম্নমানের। ফলত যাদের আর্থিক সংগতি আছে তারা বেসরকারি স্কুলে যায়। মুসলিম মহল্লায় মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুলের সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। মুসলিম এলাকায় প্রাইমারি স্কুলও সংখ্যায় কয়েকটি মাত্র। অনেক সময় সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনার কারণে নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকেও মা-বাবারা মেয়েদের স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেন। এছাড়াও মেয়েদের হোস্টেল না থাকা, ঘর ভাড়া না পাওয়া (সম্প্রদায়গত কারণে) বা পাওয়া গেলেও যথেষ্ট আর্থিক সংগতি না থাকার কারণেও এদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণ পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, দূরত্ব, কাছাকাছি মেয়েদের ভালো স্কুল না থাকা, শিক্ষিকার অভাব ইত্যাদি। স্নাতকের সংখ্যাও গ্রামে কম। আবার এইসব কারণে স্কুল-ছুটের সংখ্যাও গ্রামে বেশি।

উচ্চবিত্তদের শিক্ষার সুযোগ বরাবরই ছিল। মধ্যবিত্তদের মধ্যে তুলনামূলক আর্থিক সঙ্গতির জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল বা আছে। তবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেতনা কম। একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মুসলিম মায়েদের ৬৯.৭৫ শতাংশ চান না যে তাদের মেয়েদের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের বেশি হোক। অনেক সময় দূরত্ব, দারিদ্র্য, কাছাকাছি ভালো স্কুলের অভাব, এ সমস্ত কারণেই গ্রামে মক্তব ও মাদ্রাসায় শিক্ষাগ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। প্রায় বিনা পয়সাতেই এগুলোতে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মক্তব-মাদ্রাসা গ্রামবাসী বিশেষত অবস্থাপন্নদের অনুদানের উপরই চলে। যদিও এখানে বলা ভালো, মাত্র ৪ শতাংশ মুসলিম মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে। নিম্নবিত্তদের মধ্যেও এখন মেয়েদের শিক্ষিত করার আগ্রহ বাড়ছে, সন্তানকে শিক্ষিত করতে হলে মায়ের জানাটা জরুরি— এই চেতনা থেকে। আর একটা কারণ হল ন্যূনতম শিক্ষা না থাকলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিন পাল্টাচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরাও এগিয়ে আসছে। নিচের দু-একটা উদাহরণে সেটা পরিষ্কার হবে।

সংগ্রামই জীবন : ১) রায়দীঘির বকুলতলা গ্রামের সেলিমা— মাধ্যমিকের ফল হাতে বাড়ি ফেরার পরই পরিবারের লোকজন পড়া ছেড়ে বিয়ের জন্য প্রস্তুতির কথা বলেন। পরদিনই সেলিমা পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাড়িভাঙা বামাচরণ বিদ্যাপীঠে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। মাস ছয়েক আগে ঐ এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে শিবির করা হয়েছিল। শিবিরের আলোচনাই সেলিমাকে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করেছে। ঐ শিবিরে পুলিশের পক্ষ থেকে যে ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছিল সেলিমা তা খাতায় লিখে রাখে। সেলিমা যখন দেখে যে বাড়ীর লোক পড়াতে নারাজ তখন সে পুলিশের সাহায্যে ভর্তি হয়।

২) মুর্শিদাবাদের সুতি-র রেশমা খাতুনের ব্যাপারটা অন্যরকম। বান্ধবীদের নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে রেশমা বিয়েতে অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করে। এও জানায় যে মা-বাবা তার কথা শুনছেন না। এরপর তার তিন বন্ধু রিম্পা খাতুন, সাহানারা খাতুন ও তাজমিরা খাতুন দল বেঁধে তার বাড়ী যায় রেশমার বিয়ে বন্ধের আর্জি নিয়ে এবং উপর্যুপরি অনুরোধের পর বিয়ে বন্ধ করতে সফল হয়। মুর্শিদাবাদে ২০১১ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১২ জুন পর্যন্ত অন্তত ৯ জন নাবালিকার বিয়ে রোখা সম্ভব হয়েছে।

তবে ডোমকলের শিবনগর গ্রামের আসফা খাতুন, পূর্ণিমা খাতুন, হাবাসপুর মাঠপাড়ার খালিদা খাতুন, বাগলপাড়ার আলেয়া খাতুন, রেজিনগরের রাজনেহার খাতুন, সুতিরই টুম্পা খাতুনের বিয়ে রোখার ক্ষেত্রে প্রশাসন বা গ্রামের কোনও পরিবার বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছিল।

৩) বর্ধমানের গাঙ্গুলীডাঙা গ্রামের পূর্ব পাড়ার বিলকিস বোলপুরে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করত। সে তার দিদির বিয়ের সময় বাড়ী ফিরে আসে ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়। বিলকিসকে পাত্রপক্ষ টাকা দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়— অভাবের সংসারে কয়েক হাজার টাকাই লোভনীয়, কিন্তু বিলকিসের অনমনীয় মনোভাবের কাছে হার

মানেন তার অভিভাবকরা। বিলকিস নিজে তো স্কুলে যায়ই, পাড়ার প্রায় সব ছেলে-মেয়েকেই সাথে করে নিয়ে যায়। শুধু কুচোকাঁচাদের নয়, সমবয়সী স্কুলছুটদের, এমনকি পাড়ার কাকীমা-মাসীমাদেরও টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্কুলে। নাবালিকা বন্ধুদেরও বিয়েতে না বলতে শেখাচ্ছে। অথচ তার নিজের অক্ষর পরিচয় হয়েছে মাত্র আড়াই বছর।

৪) উত্তর চব্বিশ পরগণার সংগ্রামপুরের রাজিয়া— পরের বাড়িতে পরিচারিকা হয়েই যার দিন কাটছিল। নিরক্ষর বলে পাত্রপক্ষ বিয়ে নাকচ করে দেয়। তারপরই শুরু হয় রাজিয়ার লড়াই। পড়াশোনা শুরু করে সে। কাজ ও পড়াশোনা সামলে সে এখন নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

৫) খানাকুলের পনেরো বছরের রৌশনারা খাতুন বিয়ে না করে পড়তে চাওয়ার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় তার পরিবার। এখন একটু হলেও সুস্থ হবার পথে। এরপরও সে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হতে চায়।

উর্দুভাষীদের শিক্ষার অবস্থান বেশ হতাশাব্যঞ্জক। উর্দুভাষীরা স্বাধীনতার পর থেকে তাঁদের মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। ভারতীয় সংবিধানে ৩৫০-এ ধারায় সমস্ত রাজ্য ও প্রশাসনিক স্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথা বলা আছে। সংবিধানের এই নির্দেশ সত্ত্বেও উর্দুভাষীরা মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে প্রায় বঞ্চিত বললেই হয়। বেশির ভাগ রাজ্যে উর্দু-মাধ্যমের স্কুল খুব কম। কলকাতায় তবু হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল আছে। কিন্তু শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা অপ্রতুল। শিক্ষিকার সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উর্দু-মাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায়ই বাবা-মায়েরা মহিলা শিক্ষিকা থাকলে তবেই তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠান। এমন কি মাধ্যমিক স্তরেও ৫০ শতাংশ শিক্ষক মহিলা। মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, অন্ধ্রে তুলনামূলক ভাবে উর্দু-মাধ্যমের স্কুল সংখ্যায় বেশি।

বর্তমানে মুসলমানরা উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। যেমন, আল-আমিন মিশন। এখানে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই শিক্ষার সুযোগ আছে। অবশ্য ধর্মাচরণ এখানে বাধ্যতামূলক। মেয়েদের হোস্টেলও আছে, তবে সব সময় মাথা কাপড় দিয়ে আবৃত করা আবশ্যিক। শিক্ষার মান খুবই উন্নত। দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগও দেওয়া হয়। এছাড়া এ রাজ্যের বাঙালি বা অ-বাঙালি মুসলিম মেয়েরা ভিন রাজ্যে পড়তেও পাড়ি দিচ্ছে। বিভিন্ন রকম কারিগরি প্রশিক্ষণেও উৎসাহী হয়ে উঠেছে। সামনে আগুয়ান হওয়ার প্রতিযোগিতায় এরাও শরিক হচ্ছে, এটাই আশার আলোর দেখাচ্ছে।

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

বাংলাদেশ সহ পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া বা তিউনিশিয়ার মতো মুসলিম রাষ্ট্রে বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদের মীমাংসা হয় দেশের আইন মোতাবেক। সেখানে শরিয়তি আইনগুলোকে সংস্কার করেই রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ : মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বণ্টন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ওদেশে হয়েছে। শ্বশুর বেঁচে থাকাকালীন স্বামীর মৃত্যু হলেও বাংলাদেশের বিধবা ও তাঁর সন্তানরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন না। তালাকের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের আইন মোতাবেক স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে যত শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পুরসভার চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশের কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে একবছর জেল কিংবা দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটো শাস্তিই হতে পারে। আর তালাকের ইচ্ছা প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে নোটিশ না দিলে তালাক বাতিল বলে গণ্য হবে। নোটিশ পাওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি সালিশি কাউন্সিল গড়বেন। তাছাড়া স্ত্রী গর্ভবতী হলে গর্ভাবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না।

ইন্দোনেশিয়া: সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনতার বাস এই দেশে। তিরিশ বছর আগে, অক্টোবর ১৯৮৩, ধর্মীয় নেতাদের একটি জাতীয় আলোচনা সভাতে প্রস্তাব পাশ হয় যে, ''ইসলামিক শিক্ষা জন্মনিয়ন্ত্রণকে যুক্তিযুক্ত মনে করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা এবং স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিবান ও নিষ্ঠাবান শিশুর কথা ভেবে''। বক্তব্যের সপক্ষে কোরান থেকেও উদ্ধৃতি তুলে আনা হয়। এখন পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই সরকার অনেক আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। এর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ইন্দোনেশীয় সরকার সেখানকার মুসলিম ধর্মগুরুদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিজেদের রাষ্ট্রের স্বার্থেই প্রয়োজন।

ইরান : ১৯৭৯ সালে শাহের পতনের পর নতুন মৌলবাদী নেতারা আগের পরিবার পরিকল্পনা আইনগুলি বাতিল করেন। পরবর্তী দশ বছরে যখন জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝে ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে হঠাৎ-ই জন্মনিয়ন্ত্রণে আধুনিকতম পদ্ধতির অনুসরণের অনুমতি দিলেন। ইরান এখন পৃথিবীর সফল জন্মনিয়ন্ত্রক দেশগুলির একটি।

তিউনিশিয়া : আর একটি মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে সফলভাবে পরিবার পরিকল্পনা চলে আসছে। এখানে আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় নেতারাও বিরোধিতা করেননি। পৃথিবীর অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এখানকার মহিলারা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। শতকরা হিসাবে মহিলাদের একটা বড় অংশ লোকসভায় স্থান দখল করে আছেন।

মরক্কো : তিউনিশিয়ার পরেই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে মরক্কো। এখানকার পারিবারিক আইনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন

প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়েরই বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয়েছে আঠারো বছর। নারীদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আছে।

সেনেগালেও তাৎক্ষণিক তালাক নিষিদ্ধ হয়েছে। তুরস্কে বহুবিবাহ চিন্তারও অতীত।

বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক সহ বেশিরভাগ ইসলামিক রাষ্ট্রেই মুসলিম ব্যক্তিগত আইন মেয়েদের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিবর্তন করা হয়েছে। অথচ গণতান্ত্রিক কাঠামো সত্ত্বেও এ দেশে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিমার্জনার দিকে একেবারেই নজর দেওয়া হয়নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশকে তোষণ করে শাসকগোষ্ঠী মেয়েদের অধিকারকে কতখানি খর্ব করতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শাহবানু মামলার রায়ের উপর আইনের হস্তক্ষেপ।

ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর আমাদের দেশে অভিন্ন ফৌজদারি আইন তৈরি হলো। শরিয়ত মতে আমাদের দেশে কোন মুসলিম চোরের হাত কাটা হয় না। কিন্তু বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকারে আজও চলছে শরিয়তি আইন। আর এ দেশে মুসলিম নারীর জীবনও এতটুকু সুতোর উপর দোদুল্যমান। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সম্প্রদায় নির্বিশেষে এবং নারীপুরুষের সমতার ভিত্তিতে এক ও অভিন্ন দেওয়ানি আইনই কাম্য। যে সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন, নারীরও অধিকার আছে শুধুই নারী হিসাবে গণ্য না হয়ে দেশের সমাজের সমান অংশীদার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে রোকেয়ার লেখা কবিতার লাইন দুটি আজও নারীর মনের আকাঙক্ষা—

সোনার পিঞ্জরে ধরে রেখো না আমায়
আমারে উড়িতে দাও দূর নীলিমায়।।

তথ্যসূত্র

১) *নারী পুরুষ ও সমাজ* : আনু মুহাম্মদ।

২) *নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম* : সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

৩) *ইসলাম ও নারী* : কঙ্কর সিংহ

৪) *ইসলাম জগৎ ও নারী সমাজ* : ডঃ ওসমান গণী

৫) *কুর আন শরীফ* : গিরীশচন্দ্র সেন (অনুবাদিত)

৬) *কুল আন মজিদ* : বাংলা অনুবাদ। নিখিল বিশ্ব আহ্-মদিয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহ্মেদ (আইঃ)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত।

৭) *সাচার কমিটির রিপোর্ট*

৮) *কলকাতার উর্দুভাষী সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রের দৃশ্যপট*: অধ্যাপক এম. কে. এ. সিদ্দিকি

৯) Times of India : (রাহুল সিং-এর গবেষণা)

১০) আনন্দবাজার পত্রিকা : ১.১২.১০, ১০.১২.১০, ১৯.১২.১০, ৩০.৪.১৩

প্রবন্ধ

দলিত নারী: বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম

দেবী চ্যাটার্জী

ইতিহাসের চোখ দিয়ে দেখলে, ভারতবর্ষে নারীরা সর্বদাই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের শিকার। ধ্রুপদী হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নারীকে পুরুষের সাপেক্ষে স্পষ্টত অনেক নিচু স্থান দেওয়া হয়েছে। বর্ণবিভেদের মূল কথা— বর্ণভিত্তিক অন্তর্বিবাহ— নির্ভর করে নারীর যৌনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণের উপর। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ যাতে না ঘটে তার জন্য নারী-পুরুষকে কঠোরভাবে আলাদা রাখার কথা বলা হয়েছে, আর নারীর শরীর ও যৌনতার নিয়ন্ত্রণ ছিল এর মূল কথা। সতীত্ব, বাল্যবিবাহ বা সদাসর্বদা নজরদারি ছিল নারীর 'পাপ' পথে যাওয়া আটকানোর নানা ব্যবস্থার কয়েকটি। প্রথমে পিতা, তারপর স্বামী, আর শেষে পুত্রের অধীনে থাকাই তাই নারীর নিয়তি।

জাতপাত আর পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতির বেড়াজালে নারীরা সবাই ক্রমাগত নিপীড়নের শিকার। নারীবাদী ঐতিহাসিক উমা চক্রবর্তীর কথায়, ''নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রণ ও তার মধ্যে দিয়ে শুদ্ধ রক্তের পুনরুৎপাদনকে বলা চলে আদিমতম জিন কারিগরি, অদৃষ্টের পরিহাস এই যে এটা সব জাতের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে ও বহাল থেকেছে, পরবর্তীকালে আইনের পরিবর্তন বা উদারনৈতিক মতাদর্শও তা ভাঙতে সমর্থ হয়নি। বিশেষত উত্তর ভারতের নিচু জাতের মধ্যেও দুঃখজনকভাবে এই ব্যবস্থা টিকে আছে, তারা সচেতন নন যে, যে কাঠামো নানাভাবে তাদের নিপীড়ন করে তার থেকেই এই সব রীতিনীতি উদ্ভূত হয়েছে।''

স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান মেয়েদের সমানাধিকার দিয়েছে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে, এবং রাজ্যগুলিকে ক্ষমতা দিয়েছে এবিষয়ে সদর্থক ভূমিকা পালনের। সংবিধান মেয়েদের সমান আইনি সুরক্ষা, সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করেছে, জনপরিসরে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করেছে। সমস্ত সাবালকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার মেয়েদের ভোটদানের অধিকার দিয়ে তাদের রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। কংগ্রেসের রক্ষণশীল অংশ, হিন্দু মহাসভা, জনসংঘের কঠোর বিরোধিতার ফলে যদিও আম্বেদকর নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য যেভাবে ভেবেছিলেন সেভাবে হিন্দু কোড বিল পাশ করা যায়নি, '৫০-এর দশকে পরপর বেশ কিছু আইন পাশ করে হিন্দু পার্সোনাল আইনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, যাতে সম্পত্তি, উত্তরাধিকার বা বিবাহ-সংক্রান্ত অধিকারের প্রশ্নে মেয়েদের অধিকার বাড়ে। ১৯৫৫ -৫৬ সালে হিন্দু পরিবার বিষয়ক বিভিন্ন সংস্কারের জন্য ৪টি আইন প্রণয়ন করা হয়। হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অ্যাক্ট (১৯৫৬), হিন্দু দত্তক ও খোরপোষ আইন (১৯৫৬), এবং হিন্দু নাবালক ও অভিভাবকত্ব আইন (১৯৫৬)।

প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার আনার ফলে স্বাধীন ভারতে নারীরা পুরুষেদের সমান ভোটাধিকার পেলেন— যে অধিকার অনেক পশ্চিমী দেশের নারীদের দীর্ঘ সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়েছিল। কিন্তু আইনসভাগুলিতে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব ছিল কম। প্রথম লোকসভা নির্বাচনে আইনসভায় নির্বাচিত নারীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪.৪১ শতাংশ, ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে হয় মাত্র ৭.৯২ শতাংশ। মন্ত্রীমণ্ডলীতে কিছু নারী অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা, অর্থ, বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতো দপ্তর তাঁরা পান না। ১৯৭১ সালে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রক, ডঃ ফুলরেণু গুহ-র তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠন করে, যা কিনা 'নারীদের সামাজিক অবস্থা, তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সাংবিধানিক, আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করে দেখবে এবং তার ফলাফল পর্যালোচনা করবে। এর কারণ এই যে রাষ্ট্রসঙঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ আকারে উৎযাপন করার উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশগুলোকে নারীদের অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে অনুরোধ করেছিল। ১৯৭৪ সালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে যা দেখা যায় তা চমকে দেওয়ার মতো। *টুওয়ার্ড ইক্যুয়ালিটি* নামক এই রিপোর্টে ভারত সরকারের লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিরাট প্রশ্ন তোলা হয়। এই রিপোর্টই প্রথম বলে যে মেয়েদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত সাম্য ও ন্যায়বিচারের অধিকার অর্জন করা যায় নি। রিপোর্ট রচয়িতারা অভিযোগ করেন যে স্বাধীনতার পর নারীদের অবস্থানের উন্নতি ঘটে নি, বরং আরো খারাপ হয়েছে। রিপোর্টে লক্ষ্য করা হয় যে এদেশে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দশকে (১৯৭৫-৮৫) নানা দিক দিয়ে নানা ধরনের কাজকর্ম করা হয়। নারীদের 'কল্যাণমূলক' ব্যবস্থার তুলনায় 'উন্নয়নমূলক' ব্যবস্থার প্রতিই জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও আয় করার ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রকল্প নেওয়া হয়। শুধু নারী সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির উপর নজর রাখার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রকে পৃথক নারী সেল তৈরি হয়। নারী উন্নয়ন কর্মসূচিগুলিকে অর্থ যোগানোর জন্য রাজ্যস্তরে গঠিত হয় নারী উন্নয়ন কর্পোরেশন। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার মেয়েদের প্রতি সমস্ত ধরনের

বিভেদ নির্মূল সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW) অনুমোদন করে। একই বছরে লোকসভা বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় নারী কমিশন বিষয়ক আইন পাশ করে। পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যগুলিতেও একে একে নারী কমিশন তৈরি হয়।

ভারতসরকার তার নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে প্রধান লক্ষ্যগুলির একটি হিসেবে গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য বলা হয়েছিল দেশজুড়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানসিকতার স্তরে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নারীরা পুরুষের সমান অংশীদার হিসেবে তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হিসেবেও মেয়েদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০০১ সালকে জাতীয় নারীর ক্ষমতায়ণ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এত ধরনের কার্যকলাপ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের দলিত নারীরা নিচেই পড়ে থাকল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত, নারীবাদী থেকে দলিত রাজনৈতিক কর্মী বা তাত্ত্বিক কেউই এদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেন নি। দলিত পুরুষদের তুলনায়ও তারা হীন বলেই হয়ত তারা দলিত অধিকার-কর্মীদের নজর এড়িয়ে যায়। আবার দলিত বলেই হয়ত ভারতবর্ষের নারীবাদী চর্চার পরিসরেও তারা যথেষ্ট জায়গা পান না— সচেতন বা অসচেতনভাবে যা উচ্চবর্ণের হিন্দু নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়েই চর্চা করে।

কাউন্টারকারেন্ট-এ এম স্বাথী মার্গারেটের প্রবন্ধটিতে (৩.৬.২০০৫) এই বিষয়টি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। তিনি নিজেকে একজন দলিত মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত তেলেগুভাষী দলিত-খ্রীস্টান নারী হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি জানান যে তাঁর এই প্রতিটি আত্মপরিচয়ই তিনি নিজে ও সারা বিশ্ব অনুভব করে। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে যে কান্তি পদ্ম রাও, গোপাল গুরু, গদর-এর মত দলিত বুদ্ধিজীবীরা দলিত সমাজে পিতৃতন্ত্রের বিষয়টা নিয়ে সংবেদনশীল নন। তেমনি ভোলগা, বসন্ত কান্নাভিরান, কল্পনা কান্নাভিরান, ছায়া দাতারদের মতো উচ্চবর্ণের নারীবাদীদের লেখাতে জাতপাত-লিঙ্গ সম্পর্ক তেমন প্রতিফলিত হয় না। তিনি দুঃখ করে বলেন, যারা দলিত আবার নারী, তাদের কথা এঁরা এক মুহূর্তের জন্য ভাবেন না। তাদের কাছে সব নারীই দলিত। বাস্তবে কিন্তু "উচ্চবর্ণের নারীদের সামাজিক অবস্থান কখনোই দলিত নারী বা পুরুষের মতো ছিল না। বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে যখন পিতৃতন্ত্র কাজ করে তা ব্যক্তিদের জাতি পরিচয় দিয়ে নির্ধারিত হয়। বিভিন্নতার ভিত্তিতে যে রাজনীতি তাকে তাই নিজেদের ভিন্নতা নিয়ে নয়, তারা যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে শুধু সেগুলো নিয়ে নয়, অন্য সব ধরনের ভিন্নতা নিয়েও সমান সংবেদনশীল হতে হবে।

১

দলিত গবেষক ও অধ্যাপক গোপাল গুরুর 'দলিত নারীর ভিন্নভাবে কথা বলেন' নামের একটি লেখায় (EPW, ১৪-২১ Oct, ১৯৯৫) নারী আন্দোলনের মধ্যে দলিত নারী প্রশ্নটি বিশেষত্ব নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ। তিনি বলেন :

> "বিগত কয়েক দশকে দলিত নারীর প্রশ্নটা বিশ্ব জুড়ে জনমানসে আলোচনায় এসেছে। দলিত নারীদের নিরবচ্ছিন্ন লড়াই-ই বিশ্বজুড়ে তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করেছে। আর নারীর আত্মঘোষণা বিশেষ দেশের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ রূপ পায়। বিশেষ করে বেজিং সম্মেলনের পর থেকেই ভারতে বিভিন্ন ধরনের স্বাধীন নারীবাদী গোষ্ঠী অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী সংগঠনগুলি গতিশীল হয়ে উঠেছে...। দলিত নারীদের ভিন্নতার উপর দাঁড়িয়ে তাঁদের সংগঠিত হওয়াটা ছিল এরই একটা যৌক্তিক ফল।

তিনি দলিত নারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দলিত উইমেন' গঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। ভারতে মূলধারার নারীবাদীদের থেকে আলাদা হয়ে এই সংগঠনটি তৈরি হয় গোপাল গুরু যাকে 'ভিন্নতার রাজনীতি' বলেছেন সেই জায়গা থেকে।

গুরুর এই প্রবন্ধ মূলধারার নারীবাদী আন্দালনকে ধাক্কা দিয়েছিল। এরপর মানবী বিদ্যার অ্যাকাডেমিক পরিসরে অনেক বিতর্ক আর আলোচনা চলেছে। এই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নারীবাদী গোষ্ঠী একের পর এক আলোচনা করতে থাকে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৯৬ সালে পুনে-র নারী বিষয়ক তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র 'আলোচনা' আয়োজিত দুদিন ব্যাপী সেমিনারের কথা। এর আগে ১৯৯৩ সালে পুনে ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত দুদিনের সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে প্রকাশিত একটি গ্রন্থেও সম্পাদক পি জি যোগদণ্ড দলিত নারী নিয়ে লেখাপত্রের অভাবের কথা বলেন।

খুব শীঘ্রই বোঝা গেল যে মূলধারার নারী আন্দোলনে যতই সাধারণভাবে সমস্ত নারী মুক্তির কথা বলা হোক, 'নারী' বলে একটি সমসত্ত্ব সত্তার কথা বললে তা সব ধরনের নারীর সমস্যার কথা বলছে না। দলিত নারীর জীবনের শোষণ যেহেতু বহুমাত্রিক, অ-দলিত নারীদের থেকে পৃথক, তা আলাদা করেই তুলে ধরার দাবি রাখে।

দলিত নারীদের প্রতি বৈষম্য হয় কারণ তাঁরা নারী (লিঙ্গ ভিত্তিক), কারণ তাঁরা দলিত (বর্ণভিত্তিক)। এবং দলিত নারী হিসেবে, তাঁদের নিজেদের পুরুষদের দ্বারা (লিঙ্গ ও বর্ণ ভিত্তিক) শোষিত। ভারতবর্ষে জাতপাতগত ও লিঙ্গগত বিভেদের সবচেয়ে খারাপ রূপটা প্রকাশ পায় দলিত নারীদের প্রতি আচরণে। অথচ, ১৯৮০-র দশকের আগে না মূলধারার

নারীবাদীরা, না পুরুষ দলিত আন্দোলনের কর্মীরা, কেউই তাঁদের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেন নি। নারীবাদীদের কাছে তাঁরা ছিলেন দলিত, আর দলিত আন্দোলনের কর্মীদের কাছে ছিলেন নারী। দলিত হিসেবে তাঁরা নারীবাদী আলোচনায় যথেষ্ট জায়গা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতেন না। এদেশে নারীবাদী আলোচনা সচেতন বা অচেতন ভাবে তৈরি হয়েছে অ-দলিত, বর্ণহিন্দু নারীদের বিষয়গুলি কেন্দ্র করে।

গাব্রিয়েল ডিয়েট্রিচ তার 'দলিত আন্দোলন ও নারী আন্দোলন' নামক রচনায় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— ''নারী আন্দোলনের মধ্যে জাতপাতগত বিভেদের বিষয়টা চাপা দিয়ে হিংস্রতার শিকার হিসেবে সব নারীকে একজোট হতে বলার একটা ঝোঁক কাজ করে।... একটা অন্তর্নিহিত অনুমানও থাকে যে পিতৃতন্ত্রকে ভাঙতে পারলেই জাতপাতগত বিভেদ নিজে থেকেই দুর্বল হয়ে যাবে।... অপরদিকে দলিত আন্দোলন নারী নির্যাতনের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হলেও এই বিষয়টির ওপর জোর দেয় যে দলিত নারী একটি বিশেষ সত্তা আর জাতপাতগত সমস্যার সঙ্গেই তার সমাধান জড়িত।

অন্যদিকে নারী হিসেবে তারা যেহেতু দলিত পুরুষদের তুলনায়ও হীন, তাঁরা দলিত অধিকার কর্মীদের দৃষ্টি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন নি।তাই তারা অবহেলিত থেকে গেছেন। তাঁদের কথা বলার কেউ নেই।

২

দলিত মেয়েদের বিপদ বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শিক্ষা কম, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, অপুষ্টি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত ঘাটতি, বড় আকারে বেকারি ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার তারা।

দলিত নারীশ্রমিকরা সাধারণত অদক্ষ। ফলে তাদের মজুরি কম, কখনো বা মজুরি পায়ই না। প্রায় ৮৫ শতাংশ দলিত নারী কাজ করে কৃষিক্ষেত্রে। অসংগঠিত এই ক্ষেত্রে মেলে না সংগঠিত ক্ষেত্রের মতো সামাজিক সুরক্ষা— স্বাস্থ্য সুরক্ষা বা মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা। দলিত মায়েরা তাদের শিশু সন্তানকে নিয়েই মাঠে কাজ করতে বাধ্য হয়। সেখানে শিশুদের রাখার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। কখনো কখনো তা করারও অনুমতি মেলে না— তারা তখন কাজ খোয়ায়। ভারতবর্ষে জাত, শ্রেণী ও লিঙ্গ আধিপত্য কাঠামোর একেবারে তলায় অবস্থান করার কারণে দলিত মেয়েরা অশিক্ষিত স্বল্প মজুরির ভূমিহীন খেতমজুরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ভারতে কখনোই দলিত মেয়েদের নামে জমির 'পাট্টা' দেওয়া হয় না। তাঁদের শিক্ষাও সামান্য।

শহরাঞ্চলেও দলিত মেয়েরা মূলত কাজ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। তারা হকারি, ছোট ব্যবসা, কাগজকুড়ানি বা গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া তারা নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি বা ধূপকাঠি তৈরি, মোমবাতি তৈরি, জরি শিল্প, সেলাইয়ের কাজ করে। কোন কোন এলাকায় দলিত মেয়েদের দিনে একটি রুটির বিনিময়ে স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না করে মল সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে হয়। এই সব ক্ষেত্রেই মজুরি কম, কাজ ও মজুরি অনিয়মিত, কোনো সামাজিক সুরক্ষা নেই, যৌন নির্যাতন আছে, দালাল ও মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভর করে চলতে হয়।

প্রায় সব দলিত নারীই খুব কম বয়স থেকে শ্রম বাজারের অংশ হয়। দলিতদের নারী শিশুদের একটা বড় অংশই শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। কৃষিকাজে ও গৃহকাজে এদের শ্রমের প্রয়োজন হয়। গরিব পরিবারে নারী শিশুদের শিক্ষার পিছনেও খরচ করা হয় না। ফলে তারা শিশু শ্রমিক বনে যায়। তাই দলিত মেয়েদের স্কুল-ছুটের হার বেশি হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। প্রতিটি স্তরেই দলিত মেয়েদের স্কুল-ছুটের হার বেশি। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেরই স্কুল-ছুট হয় প্রায় ৮৩ শতাংশ। দলিত মেয়েরা ঘরের বা পরিবারেরও সমস্ত ধরনের কাজ করে থাকে— পরিষ্কার করা ও গৃহস্থালির সব কাজ। ৭০-৭৫ শতাংশ দলিত পরিবারে পরিবার-প্রধান নারী। যেহেতু গড়ে ৭০ শতাংশ দলিত ঘরে বিদ্যুৎ নেই, ৯০ শতাংশ দলিত ঘরে শৌচাগার নেই, গৃহকাজ পালন করতে দলিত নারীদের (ও বালিকাদের) একটা বড় রকমের শক্তি ব্যয় করতে হয়। খাবার, পশুখাদ্য, জল, জ্বালানি সংগ্রহ করতে হেঁটে যেতে হয় বহুদূর। দলিত মেয়েদের প্রতি চূড়ান্ত অমানবিক আচরণের কথা সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে। যখনই তারা তাদের অধিকারের কথা বলতে গেছে বা উচ্চবর্ণের মানুষের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে গেছে তাদের অমানবিকভাবে নিপীড়িত হতে দেখা গেছে। পুলিশ অনেক সময় দাঁড়িয়ে দেখেছে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

বেশিরভাগ দলিত নারী বছরের পর বছর বিভিন্ন ধরনের হিংসার শিকার। একটি বিশেষ ঘটনা, বা পরপর ঘটনা। পরিবারের মধ্যে বা সামাজিক পরিসরে। গালাগালি, শারীরিক আঘাত, যৌন নির্যাতন, পারিপারিক হিংসা, ধর্ষণ। উচ্চবর্ণের হিন্দু পুরুষদের হাতে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের সহজ শিকার দলিত নারীরা। দলিত নারীদের ধর্ষণ তাদের ক্ষমতা প্রকাশের অস্ত্র। একটি দলিত নারীকে অপমান করার অর্থ শুধু ঐ নারীটিকে অপমান করাই নয়। দলিত গোষ্ঠীটির সমস্ত পুরুষের 'পৌরুষ'কে অপমান করা। তাদের দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখে যেতে হয়। নিম্নবর্ণের নারীর উপর যৌন নিপীড়ন ঋণের সঙ্গেও জড়িত, কারণ জমি-মালিক নিম্নবর্ণের লোকেদের টাকা ধার দেয়।

অনেক সময় দারুণ দারিদ্র্যের কারণে তারা ঋণ শোধ করতে পারেনা। উচ্চবর্ণের কাছে ঋণ শোধ না করার দাম দিতে হয় দলিত নারীর ধর্ষণ দিয়ে। উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই এই বর্ণগত আধিপত্য কাঠামোকে

টিকিয়ে রাখতে পারে, নিম্নবর্ণের লোকেদের ওপর নির্যাতন চালাতে পারে। শুধু নারীদের ওপর নয় নিম্নবর্ণের শিশুদের উপরও নিপীড়ন চালিয়ে নিচু জাতকে শায়েস্তা করা হয়।

দলিত নারীদের উপর শারীরিক শোষণকে টিকিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা হলো দেবতার নামে উৎসর্গ করে 'দেবদাসী' বা 'যোগিনী' প্রথার মাধ্যমে। দক্ষিণ ভারতের বহু জেলায়, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে বেশির ভাগ দেবদাসীই দলিত। তাদের গণিকার জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। বেশির ভাগ দেবদাসীদের দেবী ইয়ালাম্মা-র নামে উৎসর্গ করা হয়। এই দেবীর অন্য নাম হলো যোগাম্মা, হোলিয়াম্মা বা রেণুকা। ইনি হলেন প্রাচুর্য আর শক্তির দেবী। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রে দেবী ইয়ালাম্মা-র ভক্তের সংখ্যা অনেক। উত্তর কর্ণাটকে দেবদাসী প্রথা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বেশ্যাবৃত্তির অন্য নাম। প্রতি বছর ১০০০-১০,০০০ কমবয়সী মেয়ে এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইউনিসেফ-এর (২০০৬) হিসাব অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশে দেবদাসীর সংখ্যা প্রায় ২৭,০০০, সরকারি হিসেবের থেকে অনেক বেশি। নিচু জাতের মানুষের উপর উচুজাতের কর্তৃত্ব ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণই যে দেবদাসীদের এইরকম জীবনের কারণ তা বোঝা যায় 'দেবদাসী'করণের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। সাধারণত খুব কম বয়সে, ৮-১০ বছর বয়সেই প্রথম উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠান হয়। এটা বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো। এর পর যৌবন এলে হয় দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানে তার উৎসর্গকরণ সম্পূর্ণ হয়। পুরোহিত লাল শাড়ি পড়া মেয়েটির বিয়ে দেন, দেবতার সাথে। এরপর এই কুমারী কন্যাকে বাধ্য করা হয় গ্রামের উঁচু জাতের প্রধান ব্যক্তির সাথে 'বিয়ের' রাত কাটাতে। এর পর থেকে সারা জীবনের জন্য গ্রামের যে কোন ব্যক্তিকে যৌনসেবা দিতে মেয়েটি বাধ্য থাকে। আগে স্থানীয় মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কুমারী দেবদাসী কন্যাকে প্রথম ধর্ষণের কাজটি করতেন। প্রকৃতপক্ষে, পুরোহিতরা দাবি করতেন যে এই পৃথিবীতে তাঁরাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাই তাঁদের দাবিই আগে। দেবতাকে যা যা উৎসর্গ করা হয় তাতে যেমন পুরোহিতের অধিকার, দেবদাসীর ক্ষেত্রেও তাই।

১৯৯২ সালে ৭৩- ও ৭৪তম সংবিধান সংস্কার আইনে, দলিত নারীরা স্থানীয় প্রশাসনে ঢোকার সুযোগ পেলেন। কিন্তু সংবিধানগত ও আইনগত সুরক্ষা সত্ত্বেও তপসিলি পঞ্চায়েত নেত্রীদের কাজ করতে গিয়ে এখনও বৈষম্য ও অসুবিধার মুখে পড়তে হয়। ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্টে আনন্দের গবেষণা 'পঞ্চায়েতের অবস্থা : ২০০৭-২০০৮'-এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৭ সালে মধ্যপ্রদেশের বেতুলের দুলারিয়া একজন দলিত মহিলা ও পঞ্চায়েতের পূর্বতন নেত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যার আগে চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে তাকে দু-দুবার ধর্ষণ করে, গ্রামের উন্নয়নের টাকা নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে। তিনি আরো জানান যে পুলিশকে বারবার জানানো সত্ত্বেও তারা দোষীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এসসি-এসটি অ্যাক্ট ১৯৮৯ দূরে থাক, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী এফআইআরও লেখা হয় নি। থানায় একটা রিপোর্ট লিখতে ৬ বছর সময় লেগে গিয়েছিল। কাউকে অ্যারেস্ট করা হয় নি। ক্রমাগত বিচার না পেতে পেতে এবং পঞ্চায়েত প্রধান ও স্থানীয় পুলিশের যোগসাজসের কারণে তিনি নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম গ্রেপ্তারটি হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই এই ধরনের ঘটনার খবর আসে।

২০০৬-এ CEDAW-র দ্বিতীয় এনজিও শ্যাডো রিপোর্টে বলা হয়—

> ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আনার মাধ্যমে দলিত নারীদের স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাজে অন্তর্ভুক্তির অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু দলিত নারীদের রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকারের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাঁরা সবাই জানাচ্ছে অশিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাজে অনভিজ্ঞতার মতো বাধার পাশাপাশি চলে ভয় দেখানো ও সরাসরি শত্রুতা।

৩

১৯৮০ থেকেই দলিত নারীরা পুরুষ ও মূলধারার নারী আন্দোলনের থেকে পৃথকভাবে তাদের কথা শোনানোর জন্য সংগ্রাম করছিলেন। দলিত পুরুষ ও মূলধারার নারী আন্দোলনে থেকে পৃথকভাবে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে শুরু করেন। ১৯৮৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে দলিত নারীদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্যোগের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন রুথ মনোরমা, এই সংগ্রামের এক প্রখ্যাত কর্মী। ১৯৯৪ সালে গঠিত হয় সারা ভারত দলিত নারী মঞ্চ। ঐ বছরই মার্চ মাসে দলিতদের, বিশেষ করে দলিত নারীদের উপর অত্যাচারের নিয়ে একটি জনশুনানির আয়োজন করে ব্যাঙ্গালোরের 'নারীকণ্ঠ' ও মানিলার 'এশিয়ান উইমেন্স হিউম্যান রাইট্স কাউন্সিল'। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদি দেখিয়ে দিল যে আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে দলিতদের উপর সবচেয়ে বেশী আক্রমণ কাজ করে পুলিশই। কিংবা তারা এই কাজে সহায়তা করা এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে উৎসাহ না দেখিয়ে ও কিছু কাজ না করে। এইসব আক্রমণের একটা ধরন আছে। শস্য বা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, শারীরিক নিপীড়ন, পিটিয়ে মারা, লক-আপে মৃত্যু, অপমান, দলিত নারী ও বালিকাদের ধর্ষণ।

জাতীয় দলিত নারী ফেডারেশন (NFDW) তৈরি হয় ১৯৯৫ সালে। ঐ বছরই NFDW বেজিং-এ অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সেখানে উপস্থিত শতাধিক ভারতীয় নারীর মধ্যে দলিত নারীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। 'দলিত নারীরা কষ্টকে শক্তিতে পরিণত করছেন' শীর্ষক একটি আলোচনাও হয়। এইভাবে ১৯৯০-এর দশক থেকেই দলিত নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৯৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর AIDWA (All India Democratic Women's Association) আয়োজিত অস্পৃশ্যতা ও দলিত নারীর উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি কনভেনশনে নানা অতিথি বক্তা, AIDWA কর্মী ও সমর্থকদের পাশাপাশি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে এক হাজার দলিত নারী সমাবেশ হয়। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা বিভিন্ন বয়সের, নিজেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও আইনি অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের সচেতনত দলিত নারীরা বিভিন্ন মাত্রার আবেগ নিয়ে তাদের সমস্যা ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ২০০১ সালের ৩১শে আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য, জাতিবিদ্বেষ ও তৎসংক্রান্ত অসহিষ্ণুতা-র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব সম্মেলনে দলিত নারীদের পক্ষে কথা বলে NFDW।

রাজ্যস্তরে, মহারাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালে তৈরি হয় মহারাষ্ট্র দলিত মহিলা সংগঠন। তার আগের বছরই ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির নারী শাখা ও বহুজন মহিলা সংঘ মিলে গঠন করে বহুজন মহিলা পরিষদ। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চন্দ্রপুরে গঠিত হয় 'বিকাশ বঞ্চিত দলিত মহিলা পরিষদ'। সেখানে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে ২৫ ডিসেম্বর, যে দিনটিতে আম্বেদকার 'মনুস্মৃতি' জ্বালানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, 'ভারতীয় স্ত্রী মুক্তি দিবস' হিসেবে স্মরণ করা হোক। ১৯৯৭ সালে দলিত খ্রিস্টান নারীদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'খ্রিস্টি মহিলা সংঘর্ষ সংগঠন'। এই সংগঠনগুলির মতাদর্শগত অবস্থান বিভিন্ন হলেও তারা 'ভারতীয় স্ত্রী মুক্তি দিবস' পালন বা লোকসভায় OBC নারীদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনের মতো বহু যৌথ কর্মসূচি নিয়েছে।

২০-২১ নভেম্বর ২০০৬ নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে দলিত নারীদের অধিকার নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এরকম সম্মেলন এই প্রথম। বিভিন্ন এনজিও-র যৌথ উদ্যোগে এটি সংগঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের বেশীর ভাগই ছিলেন ভারত, পাকিস্তান, নেপাল থেকে আসা দলিত নারী। তাঁরা উঁচু জাতের ও পুলিশের হাতে তাদের অত্যাচারিত হওয়ার ও বৈষম্যের অভিজ্ঞতার কথা বলেন— জানান যে পুলিশরা অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়ায় না। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে অত্যাচার, ফৌজদারি অপরাধের বিচার ও প্রশাসন, সরকারে অংশগ্রহণ, জমির অধিকার, সরকারি বাজেট সংস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চালানো হয়। এই আলোচনার পরিণতি হিসেবে 'মানবাধিকার ও দলিত নারীর মর্যাদা' বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। তাতে নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মতো দেশ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি কিছু সুপারিশ রাখা হয়। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ-

১) সমস্ত অপরাধমূলক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক তথ্যাবলী লিঙ্গ ও জাতপাত-এর দৃষ্টিকোণ-বিমুক্ত হতে হবে।

২) দলিত নারীদের অবমাননা থেকে মুক্ত করার জন্য সার্বিক নীতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে হবে। ফৌজদারি ক্ষেত্রে দলিত মহিলাদের সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে।

৩) দলিত নারীদের প্রতি বৈষম্য ও হিংসা নিবারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তাদের সুপারিশগুলি আইনত বাধ্য হয় এবং যাতে তারা স্বাধীন অভিযোগ গ্রহণ ও নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

৪) দলিত নারীদের অসহায়ত্বের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করে গার্হস্থ্য হিংসা (নিবারণ ও সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনের কার্যকর প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং দলিত নারীদের প্রতিনিধিত্ব সহ সর্বাঙ্গীণ নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৫) নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, পারিবারিক এবং উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার এবং স্থানীয় শাসন পরিকাঠামোয় নেতৃত্ব সংহত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

৬) সংসদ, আইনসভা এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় দলিত নারীদের এবং তৎসহ ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে *যোগিনী/বাদি* (ভারত/নেপাল) ইত্যাদির ন্যায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিতে হবে এবং তার জন্য বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৭) সরকারি জমি দলিতদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে এবং দলিত নারীর নামে অথবা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে যুগ্মভাবে উক্ত জমি নথিভুক্ত করতে হবে। দলিত জনসংখ্যার অনুপাতে যাতে উদ্বৃত্ত জমি দলিতদের মধ্যে বণ্টন করা যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক দেশে আইন সংশোধন ও প্রয়োগ করতে হবে।

৮) দলিতরা যে জমি দখল বা ভোগ করেন, সেই

জমিগুলিতে সংশ্লিষ্ট দলিত পরিবারের নারীর নামে অথবা পরিবারের পুরুষের সঙ্গে যুগ্মভাবে বৈধ অধিকার অর্পণ করতে হবে। দলিত নারীদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে জমি কেনার জন্য বাজেটে যথেষ্ট সংস্থান রাখতে হবে। কোনরূপ বৈষম্য না করে দলিত নারীদের সমান ও জীবনধারনোপযোগী মজুরি প্রদান করতে হবে।

৯) গোষ্ঠীগত সম্পদে, বিশেষত জলসম্পদের ক্ষেত্রে, দলিত নারীদের সমান অধিকার এবং অংশ ভোগ সুনিশ্চিত করতে হবে। দলিত সমাজের গোষ্ঠীগত সম্পদ সৃষ্টির জন্য বাজেটে উপযুক্ত সংস্থান রাখতে হবে।

১০) কায়িক সাফাই এবং *যোগিনী* প্রথা নির্মূল করতে হবে এবং পুনর্বাসন নীতি ও জীবনধারণের বিকল্প-পথ গ্রহণের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করতে হবে।

১১) বেগার প্রথা ও বাধ্যতামূলক শ্রম বন্ধের আইনগুলি প্রয়োগ করতে হবে।

১২) সকল দলিত কন্যার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য, বিদ্যালয় কর্মী ও পরিকাঠামো এবং বৃত্তিগত শিক্ষা বাবদ যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১৩) দলিত নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভবস্থায় মৃত্যু, শিশু মৃত্যু ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে হ্রাস করা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪) জাতিগত, শ্রেণীগত এবং লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করা এবং জাতিগত সংবেদনশীলতার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য যথাযথ সাহায্য করতে হবে।

দলিত নারীদের সংগঠন গড়ে তোলা এবং দলিত নারীদের সংগঠিত করার ফলে চিরাচরিত দলিত আন্দোলন তথা ভারতীয় নারীবাদের বিদ্যমান প্রেক্ষাপট পুনর্মূল্যায়নের সম্মুখীন।

৪

বুদ্ধিবৃত্তির জগতে ব্রাহ্মণদের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য জাত ও লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলির শর্ত নির্ধারণ করলেও, উনবিংশ শতাব্দীতে সত্যশোধক আন্দোলন এবং অব্রাহ্মণদের আন্দোলনের আলোকে নারী-প্রশ্ন অন্য এক মাত্রা পেল। ঔপনিবেশিক পর্বে একেবারে গোড়ার দিকে গণবিতর্কগুলিতে নারী সমস্যা ও জাতপাতের বিষয়গুলি জায়গা করে নিত এবং সমস্যাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ফুলে-আম্বেদকার ঐতিহ্যে নারী প্রশ্নে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল।

তারাবাঈ সিন্ধের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্ত্রী-পুরুষ তুলনা' ১৮৮২ সালে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো সিমন দি বোভোয়া-র 'দি সেকেণ্ড সেক্স' প্রকাশের প্রায় একশ বছর আগে। জ্যোতিরাও ফুলের (১৮২৭-১৮৯০) নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার যে বিপ্লবী সামাজিক ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছিল, তারাবাঈ সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারত্ব বহন করেছিলেন। পিতৃতান্ত্রিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তাঁর মৌলিক এবং দীপ্ত সমালোচনা নিঃসন্দেহে সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী ভাবনা ছিল। হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাবাদর্শগত গঠন প্রসঙ্গে এটা সম্ভবত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। এক তরুণী বিধবাকে শিশুহত্যার জন্য আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'পুনে বৈভব'-এ যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তার উত্তরে তারাবাঈ এই নিবন্ধটি লেখেন। 'পুনে বৈভব'-এর প্রতিবেদনে মেয়েটির বিরুদ্ধে তথা সমগ্র মহিলা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের ''আধুনিক'' এবং ''শিথিল'' নৈতিকতার জন্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি অভিযোগ অস্বীকার করে তারাবাঈ দেখিয়েছিলেন, পুরুষরা যে সমস্ত দোষ নারীর মধ্যে প্রায়শ খুঁজে পায়, সেই অপরাধগুলি অতি অবশ্যই পুরুষরা নিজেরাই করে থাকে। তারাবাঈয়ের প্রবন্ধ শুধু যে ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের সমালোচনা করেছিল, তা নয়, কুনবি এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ জাতের পিতৃতান্ত্রিকতাকেও ছেড়ে দেয়নি।

আম্বেদকারের আন্দোলনে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিক মাহাদ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে (১৯২৮) মহিলারা শুধু যে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন, তা নয়, সমান মানবাধিকারের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণের আলোচনাতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আম্বেদকার অস্পৃশ্যদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার পাশাপশি মহিলাদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রতিও নজর দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের মধ্যেই দলিত মহিলাদের স্বাধীনভাবে সভা অনুষ্ঠিত করতে দেখা গিয়েছিল। আরও অনেকগুলির সঙ্গে নাগপুর (১৯৪২), কানপুর (১৯৪৪), বোম্বে (১৯৪৮) এবং কলকাতাতেও (১৯৪৬) মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মীনাভাই শিবরাজ, সুলোচনা দোংরে, শান্তাবাঈ দানী, রাধাবাঈ কাম্বলে প্রমুখ মহিলা নেত্রী এই সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সম্মেলনে মেয়েদের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, বিবাহ প্রথার সংস্কার এবং গণিকাবৃত্তি থেকে মেয়েদের উদ্ধার করার দাবি সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কালারাম মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবিতে পঞ্চবর্ষব্যাপী নাসিক সত্যাগ্রহে (১৯৩০-৩৫) শত শত মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এতৎসত্ত্বেও, আম্বেদকারের চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে আলোচনায়, নারী সমস্যা সম্পর্কে তাঁর স্পর্শকাতরতা এবং এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থেকে গিয়েছিল। সম্প্রতি, ১৯৮৯ সালে, মীনাক্ষী মুন এবং উর্মিলা পাওয়ার 'আমরাও ইতিহাস রচনা করেছিলাম' ('উই মেড্ হিস্ট্রি টু') প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পিতৃতন্ত্রের সবথেকে মৌলিক সমালোচনা করেছেন সম্ভবত ই ভি রামসামী, লোকমুখে

যিনি পেরিয়ার নামে বিখ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর 'আত্মমর্যাদার আন্দোলন'-এর মাধ্যমে ঈশ্বর, পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার সাথে সাথে নারী অধিকারের সপক্ষেও তিনি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন। নারী-পরাধীনতা কেন্দ্রিক সকল ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ভ্রান্ত ধারণাকে ইভিআর (এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। নারীত্বের প্রচলিত ধারণাকে তিনি নস্যাৎ করেছিলেন। সতীত্বের মহিমা কীর্তনকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মাতৃত্ব ও মা হওয়াকে আদর্শায়িত করার ব্যাপারেও তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। মানব জীবন লালনপালনের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের থেকে পিতৃ-মাতৃত্ব নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করে বলে তিনি মনে করতেন।

পেরিয়ার একদল সমর্পিত 'আত্মমর্যাদাবাদীকে' অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তারাই নারীমুক্তি ও 'আত্মমর্যাদাবোধী' বিবাহ সমর্থনের প্রচারে নেমেছিলেন। 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলনের পত্রিকা *কুদি আরাসু*, *পুরাতচি*, *পাগুথারিভু* এবং *সমধর্ম* ইত্যাদিতে এতদসংক্রান্ত নানাবিধ প্রসঙ্গে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। মহিলারা নিজেদের উৎসাহেই অনেক লেখা লিখেছিলেন। নারী-শোষণের সাধারণ কারণগুলি ছাড়াও, বেশ কয়েকটি লেখাতে 'আদি দ্রাবিড়' (দলিত সম্প্রদায়) মহিলাদের সম্বন্ধেও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। *কুদি আরাসু*-তে মীনাক্ষী তাঁর লেখায় জাতীয়তাবাদী ভগিনীদের অন্য ধরনের অসহযোগ ও আইন অমান্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন,

> দেবদাসী ভগিনীরা, যাদের তাদের পিতামাতা পূর্বসূরীদের পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য করে তাদের জন্য সত্যাগ্রহ করুন। যারা আমাদের আদি দ্রাবিড় ভগিনীদের সাধারণ কুয়ো ব্যবহারের অধিকার দিতে ঘৃণা বোধ করে, তাদের গৃহের সামনে সত্যাগ্রহ করুন...।

দলিত মহিলাদের জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের নিজেদের কথাতেই বেশি বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে। ২০০৬ সালে প্রকাশিত শর্মিলা রেগে-র বিশাল কাজ 'Writing Caste/ Writing Gender: Reading Dalit Women's Testimonios'-কে ধন্যবাদ। এই বইটিতে শান্তাবাঈ ধানাজি দানী (১৯১৯-২০০১), মুক্তা সারভাগোর (১৯২২-২০০৪), শান্তাবাঈ কৃষ্ণাজি কাম্বলে (১৯২৩), কুমুড পাওয়ারে (১৯৩৮), উর্মিলা পাওয়ার (১৯৪৫), জানাবাঈ কাছরু গিরে (১৯৫৮), বিমল দাদাসাহেব মোরে (১৯৭০) প্রমুখ বিশিষ্ট দলিত মহিলাদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রদত্ত বিবৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অংশবিশেষের অনুবাদের মাধ্যমে ইংরাজি পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ না হলেও, সমাজকে দলিত মহিলারা কী চোখে দেখেন এবং তঁদের সামাজিক অবস্থান ও সম্প্রদায় সম্পর্কে উচ্চবর্ণ আরোপিত ধ্যানধারণাগুলিকে কীভাবে তাঁরা বিরোধিতা এবং পুনর্মূল্যায়ন করেন, এই সংকলন তার পরিচয় ধরে রেখেছে। রচনাশৈলী, বিষয়ভাবনা ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্য সমন্বিত এই সংকলনের বিস্তার ১৯২০ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। মুক্তাবাঈ সারভাগোর গান্ধীবাদ এবং আম্বেদকার রাজনীতির মধ্যে চাপা বিরোধের বর্ণনা দিয়েছেন। অপরদিকে শান্তাবাঈ দানী আম্বেদকার আন্দোলনে লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রায়িত করেছেন। পশ্চিম মহারাষ্ট্র অঞ্চলের বাবিতাই কাম্বলে ও শান্তাবাঈ কাম্বলে, আম্বেদকার-পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'মাহার' সম্প্রদায়ের জীবনযাপন এবং আম্বেদকার আন্দোলনের প্রভাবে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন জনসমক্ষে হাজির করেছেন। কুমুড পাওয়ারে ভরহাদ অঞ্চলে মাহারদের বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক হিসাবে প্রবেশের কথা বলেছেন। উর্মিলা পাওয়ার কোঙ্কন অঞ্চলের দলিত-জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। একই সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে দলিত নারী আন্দোলনের যোগসূত্রও নির্মাণ করেছেন। জানাবাঈ কাছরু গিরে ও বিমল দাদাসাহেব মোরে, অস্থায়ী আস্তানায় যাযাবর সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা এবং জাতপাতভিত্তিক পঞ্চায়েতের পিতৃতান্ত্রিক আচার-ব্যবহারের বিরোধিতার ইতিহাস লিখেছেন।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত বামা-র 'কারুক্কু' সম্ভবত তামিল ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দলিত সাক্ষ্য। প্রকাশের অনতিবিলম্ব পরেই তার পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বামা তাঁর গ্রামজীবন, বিদ্যালয় জীবন, খ্রিস্টান জীবন, জাতপাত সম্পর্কে তাঁর ক্রম-সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু লেখেননি, কিন্তু দলিত জীবনের যে পরিবেশে বড়ো হয়েছিলেন এবং কিছুটা আত্ম-সচেতনতা অর্জন করেছিলেন, তারই এক বর্ণনা রেখেছেন। তাঁর লেখার অনেকটা অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে লেখিকার শৈশবকাল এবং দলিত শ্রমিকদের কাহিনী। এস জে মার্ক-এর কথায়, ''প্রথম পাঠে মনে হয়, এটা একটা গ্রামের গল্প। অন্য কোণ থেকে এটা একটা আত্মজীবনী। আবার আর এক দৃষ্টিকোণে এটা উচ্চাঙ্গের এক উপন্যাস।''

৫

দলিত আন্দোলন গতি পাওয়ার সাথে সাথে, দলিতদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং দলিত সাহিত্য গুরুত্ব পেতে শুরু করলো। উত্তরপ্রদেশে দলিত রাজনীতির উত্থান এই প্রক্রিয়াটাকে দ্রুততর করে তোলে। ক্ষমতা ও জনসমাগমের মাপকাঠিতে যদি বিচার করা হয়, তাহলে উত্তরপ্রদেশে দলিত রাজনীতি সবথেকে সফল। এই বিপুল সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য জনগণের সাংস্কৃতিক মানসিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মায়াবতীর নেতৃত্বে বিএসপি কয়েক বছর ধরে খুব সতর্কভাবে

এই কাজটা করে গেছে। বিএসপি-র রাজনৈতিক জ্ঞানচর্চায় পৌরাণিক কাহিনী, নীতিবাক্য, উপকথা, যেগুলো দলিতদের সামগ্রিক স্মৃতিতে গেঁথে আছে, সেই সমস্ত দলিত সাহিত্য সম্পর্কে গর্ব প্রকাশ করা হতো। দলিত বীরবালাদের কথা ব্যাপকভাবে উত্থাপন করা হতো। উত্তরপ্রদেশে দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নেত্রী মায়াবতীর ভাবমূর্তি গঠনের উদ্দেশ্যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের বীরাঙ্গনাদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হতো। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রে মেয়েদের আত্মত্যাগকারী ও আত্মবিলুপ্তির চিরায়ত মা-বোন-এর যে ভাবমূর্তিকে মহিমান্বিত করা হতো, এই সমস্ত কাণ্ডকারখানার ফলে তাতে ফাটল ধরে। কাঁসিরাম ও মায়াবতী এর বিপরীতে, ১৮৫৭ বিদ্রোহে যে সমস্ত দলিত মহিলারা সাহস এবং যোদ্ধপ্রকৃতি প্রদর্শন করেছিলেন, বেছে বেছে তাঁদের তুলে ধরেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক যুদ্ধে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে, মায়াবতী এই সকল নায়িকাদের সঙ্গে নিজেকে সূত্রবদ্ধ করে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন।

উপকথা ও বাস্তবের যে সমস্ত দলিত নায়িকাকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তুলে এনে যত্ন সহকারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, ঝালকারিবাঈ এবং উদাদেবী তাঁদের অন্যতম। ঝালকারিবাঈ-এর কাহিনী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত। বুন্দেলখন্ড অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত। লৌকিক গানে, লোককথায় তিনি বেঁচে আছেন এবং গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় আলাপ-আলোচনায় তিনি স্থান করে নিয়েছেন। দলিতদের অধিকাংশ সম্প্রদায় তাঁকে দেবীর অংশ মনে করে। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত উপকথা সংক্ষেপে এই রকম—

> ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রাসাদে ঝালকারিবাঈ নামে এক দাসী ছিলেন। তিনি নীচু জাতের মহিলা। ব্রিটিশরা ঝাঁসি দুর্গ অবরোধ করার পর চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করলে, ঝালকারিবাঈ রাণীকে তাঁর শিশুপুত্রকে পিঠে নিয়ে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। তিনি নিজে রাণীর ভূমিকা গ্রহণ করে ব্রিটিশকে বোকা বানাবেন বলে রাণীকে বোঝান। রাণী তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়ে পুত্র সমেত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কৌশলটা কাজে দিয়েছিল... অনেক পরে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে যে 'রাণী' আসলে ঝালকারিবাঈ।

উদাদেবী ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে বেগম হজরত মহলের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে পাশি সম্প্রদায়ের 'আইকন'-এ পরিণত হয়েছেন। বাস্তবত সমগ্র দলিত সম্প্রদায় তাঁর প্রভায় প্রভাবিত। বিএসপি দাবি করে যে মায়াবতী তাঁরই অবতার। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে কাট-আউট, পোস্টার, হোর্ডিংয়ে মায়াবতীর পাশে উদাদেবীর ছবি প্রদর্শন করে এটাই মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

ভাঙ্গিরা নিজেরা যখন স্বসম্প্রদায়ের ইতিহাস লেখেন, তাঁরা 'মহাবীরীদেবী'র কথা খুব বড়ো করে বলেন। মহাবীরীদেবী সেই সব সাহসিনী মহিলাদের অন্যতম, যাঁরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ঝালকারিবাঈ এবং উদাদেবী-র মতোই দলিতরা মহাবীরীদেবীকে স্মরণ করেন।

এতৎসত্ত্বেও, কোন দলিত রমণী যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতালাভ করেন, তখন তাঁদের যে সমালোচনা হয় তার অনেকটাই হয় তাঁদের দেহ এবং চিরাচরিত নৈতিক বোধকে কেন্দ্র করে। দুজন প্রখ্যাত এবং শক্তিময়ী দলিত মহিলা মায়াবতী এবং ফুলন দেবী প্রসঙ্গে এভা মারিয়া হার্টম্যান 'দি দলিত মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থে বিষয়টির এক বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমজন ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং বহুজন সমাজ পার্টির সভাপতি। দ্বিতীয়জন ''দস্যুরাণী'' নামে কুখ্যাত ছিলেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের সমালোচনা অ-দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরাই করে থাকে, কিন্তু দলিত আন্দোলনের পুরুষদেরও প্রায়শ এই মহিলাদের ''শিথিল নৈতিকতা'' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে দেখা যায়। অল্প কিছু দলিত রমণী ক্ষমতাবান হয়ে উঠলে, তাঁদের বিরুদ্ধে যেরকম সমালোচনার ঝড় ওঠে তা ঐ সমালোচনার পেছনে দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতপাত-শ্রেণীগত দিকটি তুলে ধরে। প্রকাশ্যে মহিলাদের চরিত্র নিয়ে পুংখানুপংখভাবে কাটাছেঁড়া করা হয়। হিন্দু বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরেই নেওয়া হয় যে সংশ্লিষ্ট দলিত রমণী শিথিল চরিত্রের, কারণ তাদের চোখে সব দলিত মেয়েরাই তাই। আর দলিত সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে সাব্যস্ত হয়, নৈতিক বোধের দিক থেকে সংশ্লিষ্ট দলিত রমণীটি পতিত হয়েছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক হিংসা সমাজে এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে ঘরে ও বাইরে দলিত মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনে তার ছায়া পড়ে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্ষণ এবং ধারাবাহিক অবমাননা অদ্ভুত এক জাল নির্মাণ করেছে। এখন দলিত মহিলাদের বিভিন্ন সংস্থা নিজেরাই তাদের সমাজের বাইরে রাখার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ জুড়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে। স্বদেশে ও বিদেশে, তাদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে এবং তাদের সংগ্রামও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রয়াত পল্টু সেন

গত ৩০ জুলাই ২০১৩ বামপন্থী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের নেতা পল্টু (অমর) সেন-এর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে অনীক গভীর শোক প্রকাশ করছে।

প্রবন্ধ

আদিবাসী নারী, তখন ও এখন

শুচিব্রত সেন

আদিবাসী ইতিহাসের সিংহাবোলোচনে* নারী উঠে আসে এক ভিন্ন মাত্রায়, যা সচরাচর উচ্চবর্গ বা এমনকি তথাকথিত নিম্নবর্গের অবস্থান থেকে স্বতন্ত্র। পূর্ব ভারতের আদিবাসী বলতে অনেকগুলি জনজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৭৬ সালের সিডিউল্ড কাস্টস এন্ড সিডিউল্ড ট্রাইব অর্ডার (অ্যামেন্টমেন্ট) অ্যাক্ট অনুসারে ৩৮টি জনজাতি গোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। ভাষাগোষ্ঠীর দিক থেকে ভাগ করলে এদের দুভাগে ভাগ করা যায়। মুন্ডারি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল মুন্ডা, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি আর দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আসে ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশে সমস্ত জনজাতির উত্তরণ সমভাবে ঘটে নি। কিছু জনগোষ্ঠী সময়ের হিসাবে একই জায়গায় স্থিরীকৃত। যাকে বলা হয় 'frozen in time'। আবার কিছু আছে যারা হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে সংস্কৃতায়ন পদ্ধতিতে অনেকাংশে হারিয়েছে নিজস্বতা। মালপাহাড়িয়া থেকে সাঁওতাল সমাজ বা মুন্ডা, হো সমাজের স্বাতন্ত্র্য এক ইতিহাসের সত্য। বার্নাড কোন যাকে বলেছেন 'traditional past' ও 'historical past' এই দুইয়ের অভিধায় মুন্ডা, হো, সাঁওতালরা বিবেচ্য। কিন্তু সংস্কৃতায়ন থেকে নিজেদের একটা সময় (বিংশ শতাব্দীর প্রায় আশি-র দশক) পর্যন্ত দূরে রেখে একমাত্র সাঁওতালরাই পেরেছিল নিজেদের আদিবাসী সত্তা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে।[১]

রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'ভোলগা থেকে গঙ্গা'য় সমাজ বিকাশের যে অনবদ্য বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি-কেন্দ্রিক হলেও দ্রাবিড় বা প্রোটো অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠী সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য যে সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য ছিল বিদ্যমান। রাহুলের মতে এই সময়কাল ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ডের বিবরণ অনুসারে এরও আগে প্রায় ৮,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিশাল সময়কালে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বস্তু নির্ভর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে গেল। এই হাতিয়ারে জমি কর্ষণ হল সহজতর এবং চাইল্ডের গবেষণানুসারে এ সবই সম্ভব হয়েছিল মূলত নারীদের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায়। নব্যপ্রস্তর যুগের এই অবদানকে তাই তিনি চিহ্নিত করেছেন 'Mankind' বা 'Womankind'[২] এর অবদান হিসাবে । তাঁর মতে 'All the foregoing inventions and discoveries were, judged by the ethnographic evidence, the work of the woman'।[৩]

আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজে নারী

সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব বা 'কারাম বিনতি' হিসাবে বলা হয়—

বেড়ায় রাকাব আ অকাস্য রে
জানাম লেবানন
মানওয়া অনেতেরে, দূরয়া লাতার হাসা,
ইনৈয়াতে তাহে কানা ধ্যর্তি।

সূর্য যেদিকে ওঠে, ঠিক সেই দিকে আমাদের জন্ম হয়েছিল, তখন চারদিকে শুধু জল আর জল; আর জলের নিচে ছিল মাটি। মুন্ডাদের কাছে সবচেয়ে পূজ্য সিংবোঙ্গা বা সূর্য দেবতা, আর ইনকা সভ্যতায় তো 'সূর্য কাঁদলে সোনা'। 'কারাম বিনতি' অনুসারে আদম ও ইভের মতো প্রথম মানব ও মানবী ছিলেন পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি। এঁদের জন্ম হয়েছিল হাঁসের ডিম থেকে। হাঁস প্রসঙ্গ অন্যান্য বিদেশি লোক কাহিনীতেও খুঁজে পাওয়া যায়। পিলচু বুড়া বা পিলচু বুড়ির মধ্যে মিলন ঘটাতে সূর্যদেবের নির্দেশেই তৈরি হল ইলি বা সুরা। একদা ভাইবোন পরিণত হল স্বামী-স্ত্রীতে। আর এদেরই বারোজন পুত্র থেকে সাঁওতালদের বারোটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি।

সৃষ্টিতত্ত্বে মানব-মানবীর সমমর্যাদা দিয়েও দেবতত্ব থেকেই দেখা গেল পুরুষ প্রাধান্য। মারাংবুরু বা বোঙ্গারা সবাই পুরুষ। ধর্তী আবা বা পৃথিবী নারী হলেও তাকে মাঝে মাঝে পুরুষ দেবতা হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। একমাত্র 'জাহের থান' বা 'জাহের এরা' হলেন মাতৃকাদেবী। মাঘসীম বা বাহা পরবের সময় জাহের থানের উদ্দেশে যে সংগীত গীত হয় তা এক সময়কার মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আদিকৃষির কথা মনে করিয়ে দেয়।

Salutation to you, Mother Jaher Era
On the occasion of Baha Festival we offer you,
Young fowls, new flowers and freshly husked rice...
We take these new flowers and fruits
Let there be no diseases and sickness from them
Please make the animals before us.

প্রসঙ্গত বলা ভালো, জাহের থানে ফুল উৎসর্গের আগে সাঁওতাল নারীরা মাথার খোঁপায় ফুল গোঁজে না। এইসব গানে ফুটে ওঠে মায়ের কাছে সন্তানের চিরন্তন প্রার্থনা।[৪]

'জা' অর্থে বীজ বা অঙ্কুরোদ্গমনের সুপ্ত ক্ষমতা এবং 'হের' অর্থ বপন করা। রামদাস টুডু রেস্কা লিখছেন, 'মোড়েকো-তুরুইকা' শব্দের অর্থ হল পাঁচজন বা ছয়জন নারী। এখন এই শব্দদ্বয় দ্বারা গ্রাম-পরিষদ বা পঞ্চায়েত বোঝায়। এরাই প্রথম

* সিংহ চলার সময় ডান এবং বাঁ দিক দেখে নিয়ে তারপর পা ফেলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। ইতিহাস চর্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তববাদী পদক্ষেপ।

সাঁওতালদের গ্রাম পত্তন ও সামাজিক বিন্যাস করেছে বলে পরবর্তীকালে দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছে।[৫] অর্থাৎ পুরুষ প্রাধান্যে আদি দেবী রূপায়িত হলেন আদি দেবতায় সমাজ গঠনের শুরুতে।

সাঁওতাল গ্রাম সমাজের সাংগঠনিক পদে অবশ্য নারীর ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। বস্তুত পক্ষে সমাজ গঠনের সূচনাতেই গর্ডন চাইল্ড কথিত 'Mother Right' এর মূলে কুঠারাঘাত পড়েছিল। প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আদিবাসী সমাজ সংগঠন বা বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণ পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' আদিপর্বে এবং ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কাজেই সংস্কৃতায়নের বিপরীতে আদিবাসীয়নও যে বাঙালি সমাজে যে যথেষ্ট কার্যকর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর তাই সৈয়দ মুজতবা আলি যখন বলেন, "...ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য-অনার্যের সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণ-সঙ্করের ফলে" (*চাচা কাহিনী*, ১৫শ সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা), তখন সেখানে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক সত্যেরই প্রতিফলন ঘটে। এই বক্তব্যের অনুসরণে বলা যায় যে ভারতে প্রথম পঞ্চায়েত প্রথা আদিবাসীদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। যে কোনও বিচারালয়ে (পঞ্চায়েত) সাক্ষ্য দেবার আগে আদিবাসী মুন্ডা বা সাঁওতাল শপথ নেওয়ার সময় সাধারণত বলে থাকেন—

সিরমারে সিংবোঙ্গা
ওতেরে পঞ্চ।
(আকাশে সূর্য দেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়েত)

আদিবাসী বা সাঁওতাল সমাজে যে পঞ্চায়েত বা রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান, তার কার্যনির্বাহী ব্যক্তিরা হলেন যথাক্রমে মাঝি (Headman), জগমাঝি, পারানিক, জগ-পারানিক, গোডেৎ, নায়কে, কুডুম নায়েকে। কোনও নারী এইসব পদের অধিকারিণী হতে পারতেন না, বা এখনও পারেন না। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? সংসদে তো এখনও শতকরা ৩০ জন নারী প্রতিনিধিত্বের দাবি বাস্তবায়িত হল না।

সাঁওতাল সমাজকে এক egalitarian বা সর্বসমতাবাদী সমাজ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সন্দেহ নেই তথাকথিত হিন্দু বা মুসলমান সমাজের তুলনায় এরা অনেকটাই সমতাবাদী। লিঙ্গ বৈষম্য অনেকটাই কম, তবে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। পঞ্চায়েত পরিচালনাতেও যেমন নারীর কোনো ভূমিকা নেই, তেমনই তাদের পরবের দিন নির্ধারণের ক্ষমতা একান্ত-ভাবেই পুরুষের। এমনকি পরবের প্রথম দিনের পুজো দেখাটাও মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ কিন্তু পুজোর যাবতীয় উপচার, বিশেষত হাঁড়িয়া তৈরিতে তাদের একাধিপত্য। অন্যদিকে 'থুন্টু' উৎসব বা গোপ মাতার পুজোয় বাড়ির কর্ত্রীই সব কাজ করেন। উপকরণ অর্থাৎ ধান, দূর্বা, সিঁদুর, কাঁচা শালপাতা দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত প্রদীপ—সব কিছু কুলোর ওপর সাজিয়ে নিয়ে গোয়াল ঘরের দরজা খুলবে বাড়ির কর্ত্রী। ঠাট্টা করে ছড়া কেটে বলা হয়—

বউটা বাড়ির সব কাজ করে,
মাঝি তুই তার পুজো কর।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত[৬] এই ব্যঙ্গাত্মক ছড়াটির মধ্যে সাঁওতাল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বিশ্লেষণের এই সমাজে নারীর অবস্থানের তাৎপর্য অনেক গভীরে চলে যায়। যাঁরা এই সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন তাঁরা সবাই স্বীকার করেন এদের পুরুষরা কর্মের উপাসক যত না তার চেয়ে বেশি আনন্দের উপাসক। গ্রাসাচ্ছদনের মতন ব্যবস্থা হলেই সন্ধ্যা হলে হাঁড়িয়া পান করে নাচ-গানেই এঁদের বেশি উৎসাহ। আর সে কারণেই সময়ের মূল্যও এদের কাছে তুচ্ছ। সময় সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে আধুনিকতা, ইতিহাস ও আদিমতাকে মিশিয়ে প্রথমা বন্দ্যোপাধ্যায় 'Politics of Time' নামে বেশ জটিল এক পুস্তক উপহার দিয়েছেন Primitive বা আদিমতার নির্মাণ ও বহমান আধুনিকতার ভাবনার রাজ্যে। আধুনিকতার বিপরীতে এক 'অপর' সময়ের বাসিন্দা সাঁওতালদের "দেখে মনে হয় ওদের জন্য সময়টা যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে"।[৭] কিন্তু সময় পুরুষতান্ত্রিকতায় দাঁড়িয়ে থাকলেও জীবন ও সংসার চলমান। তাই সাঁওতাল সমাজে নারীর মূল্যের অন্য এক মাত্রা। এদের নারীরা শুধু ঘরে নয়, বাইরের কাজেও পুরুষের সমান বা তার চেয়ে বেশি সহযোগী। হালটাই শুধু পুরুষ চালায়, কিন্তু বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানি সংগ্রহ, ঘর গৃহস্থালি, শিশু পালন সবটাই মেয়েদের কাজ। সাঁওতালদের বিবাহে বরপক্ষ কন্যার পিতাকে পণ দেয়, যদিও তা একসময় ছিল প্রতীকী— ১২ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র। এর থেকে পঞ্চাশ পয়সা সম্মান দক্ষিণা হিসাবে পঞ্চায়েতের প্রাপ্য— বাকিটা নিজের। মেয়ে যে এমনি পাওয়া যায় না, তাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় এবং সে যে সমাজে সমাদৃত, এ বোধ এই সমাজে বিদ্যমান। বাল্যবিবাহ প্রচলিত নয় এদের মধ্যে এবং পরবের দিনে উন্মুক্ত মেলামেশার কারণে অনেক সময় পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করে, যদিও পিতামাতার দ্বারা নির্বাচিত বিবাহই এখনও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। মজার বিষয় হচ্ছে, বিবাহের সময় যাত্রাকালে ছেলেকে মা জিজ্ঞাসা করেন, 'ওকাতেন চালাকানা বাবু?" অর্থাৎ কোথায় যাচ্ছ বাবা? ছেলে উত্তর দেয়, "কাসি বাগি বগতে কড়মি আগু"। এর অর্থ 'তোমার কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে তাই বউ আনতে যাচ্ছি।' পাঠক স্মরণ করতে পারেন একদা বাংলার বিবাহে একইভাবে ছেলের উত্তর, 'মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি'। সাঁওতাল অবশ্য দাসী বলে না,

কারণ শ্রম বিভাজনের এ ধারণাই তাদের মধ্যে প্রচলিত নয়। সাঁওতাল সমাজ নারীর এই প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ রেখেই তাকে বেঁধেছিল কিছু প্রথার নিগড়ে। অবশ্য এ কথা বলা যেতেই পারে যে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদরা যে আদিবাসীদের চিহ্নিত করেছেন, 'encapsulatd society' হিসাবে।[৮] তারা বাঙালি হিন্দুদের প্রতিকূলতায় তৈরি করেছিল এই প্রথা। সাঁওতাল নারীদের স্ব-সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজে বিবাহ তাদের কাছে প্রতীয়মান হতো জাতিগত অপমান হিসাবে। আর সে কারণেই 'বিটলাহা' অর্থাৎ সমবেত হয়ে শত্রু নিকেশের প্রচলন। সাঁওতালদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে সেই অভিজ্ঞতা থেকে Culshaw জনৈক সাঁওতাল গ্রাম-প্রধানের জবানি উল্লেখ করে লিখেছেন, "...there are no others who are greater than us. You can see that from the fact that even to-day our womanfolk will not eat rice that has been cooked by Brahmins. Formerly, when our menfolk ate Hindu rice they were made to sleep outside for one night they could not sleep with their wives."। এই উক্তির অবস্থান একদিকে যেমন শ্রীনিবাসনের 'সংস্কৃতায়ন' তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতে, অন্যদিকে নৈতিকতার মানদণ্ডে নিজের সমাজে নারীর উচ্চাবস্থানের সঙ্গে হিন্দুদের তুলনা করে তারা বলে, "When the Deku (non-Santals) put out their lamps at night they have no sense of what is right or wrong. They respect no one, whether their younger brother's wife, elder brother's wife, their own sister or any one else, they do not respect any of their relations by marriage"।[৯] পাঠক ভেবে দেখতে পারেন হিন্দু নারীর অসহায়তা সম্পর্কে আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য।

এই সমাজে অলস পুরুষতন্ত্রে নারীর প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই তাকে সমাজভুক্ত করে রাখার বিভিন্ন প্রচেষ্টার শেষ ছিল না। আদিবাসী সমাজে নারী পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে এ কথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য নারীর নিজস্ব জগৎ সৃষ্টির বিরুদ্ধে বেড়াজাল। সাঁওতাল বিদ্রোহের আলোচনায় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে দেখিয়েছেন যে এই বিদ্রোহে পুরুষদের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও কোনো অংশে কম উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও ইতিহাসে সে কথা খুব কমই আলোচ্য। বাস্কে মহাশয়ের এ মন্তব্য খুবই সঙ্গত, "...দেখা যায় যে সাঁওতাল সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রধান ভূমিকা মেয়েদেরই।"[১০] বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে **শিকার** দলের অনুবর্তী হত মেয়েরা। অনেক সময় পুরুষের বেশে তারা সরাসরি লড়াই করেছে ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে। উপরন্তু আহতদের শুশ্রুষায় ও গুপ্তচরের ভূমিকাতেও তারা নিয়োজিত ছিল। সিধুর স্ত্রী সুমী মেঝেন কিংবা ডাটা মাঝির মেয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পিছপা হয়নি (*পূর্বোক্ত*)। বিদ্রোহের পর বন্দী হিসাবে পুরুষদের মতো শত শত নারী শিশুসন্তান সহ কারাবরণ করেছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অরণ্যবহ্নি* উপন্যাসে বিদ্রোহী নারীর ভূমিকার আরো কিছু পরিচয় পাঠক পাবেন।

কিন্তু বিদ্রোহ ইত্যাদি তো আকস্মিক ঘটনা, চলমান জীবনের নিত্যদিনে সাঁওতাল রমণীর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা কতটুকু? পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো বা ধর্মে নারীর স্থান নেই বললেই চলে। জনৈক গবেষকের এই মন্তব্য যথার্থ যে 'Santal religion is essentially a man's religion' (Devnatham and Goind Kelkar, *Gender and Tribe : Women Land and Forests in Jharkhand*, Kali for Woman, New Delhi, 1991, p. 91)। হিন্দু নারীদের সম্পর্কে সাঁওতালরা কটাক্ষ করলেও ধর্মের ক্ষেত্রে নারী দেবীর যে প্রাধান্য হিন্দু সমাজে বর্তমান তা কিন্তু সাঁওতাল সমাজ 'জাহের থান' ব্যতীত একেবারেই অনুপস্থিত। উপরন্তু স্বমহিমায় উজ্জ্বল সৌন্দর্য চেতনায় উদ্ভাসিত সাঁওতাল নারীকে অবদমিত রাখার অন্যতম উপায় বেছে নেওয়া হয়েছিল ডাইনি প্রথার মাধ্যমে। অলৌকিক বা আধিভৌতিক বিশ্বাস আদিবাসীদের মধ্যে প্রবল এ কথা ঠিক, কিন্তু পশ্চিমি ঐতিহাসিকরা যখন এই বিশ্বাসকে বর্বরতার অন্যতম উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেন তখন তারা ভুলে যান যে ইউরোপীয় ইতিহাসের একটা পর্যায়ে ডাইনি হত্যা ছিল এক স্বাভাবিক জিনিস। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের উৎপত্তির কারণ এদেশে বা ওদেশে একই। যুক্তিবাদের বিবর্তনের একটি স্তরে সাঁওতালরা যে আটকে আছেন তার দায়িত্বও বর্তায় পশ্চিমের জাত্যাভিমানী ঔপনিবেশিক শাসনে। সাঁওতাল উপকথা 'মারে হাপেরাম রেয়াক' কথায় বলা হচ্ছে যে, মারাংবুরু ডাইনি বিদ্যা পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন, কিন্তু সুকৌশলে মেয়েরাই সেটাই আগে শিখে নিয়ে পুরুষদের ওপর আধিপত্য চালাচ্ছে। নারী আধিপত্য অসহ্য হওয়ায় তারা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মারাংবুরুর কৃপাপ্রার্থী হয়। তিনি বলেন যে, রক্ত দিয়ে শালগাছকে চিহ্নিত করলে ইপ্সিত ফল লাভ হবে। ছদ্মবেশে গোপনে অনুসরণকারী নারীরা একথা শুনে ফেলে মারাংবুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং নারীরা পেয়ে যায় ডাইনি বিদ্যার গোপন হদিশ। বলাবাহুল্য, পুরুষ বেশধারী নারীদের মারাংবুরু চিনতে পারেননি। পরে নারীদের এই মিথ্যাচারে অসন্তুষ্ট হয়ে সাঁওতাল দেবতা পুরুষদেরই ডাইনি চিহ্নিত করার একমাত্র অধিকারী করেন আর তার ফলে 'ওঝা' মাত্রেই পুরুষ। আর ডাইনি মানেই নারী (*হরকরেন মারে হাপরামকো রিয়াক কথা* : পি. ও. বোদিং কর্তৃক অনূদিত, দিল্লি, ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪, পৃ. ১৬২-৬৪)।

সম্ভবত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের কোনও এক সময়ের কাহিনী এটি। সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, নারীশক্তির প্রাধান্যজনিত ভীতি থেকে উদ্ভব

ডাইনি চেতনা। মনে রাখা দরকার যে, ছোটোনাগপুরের মতো আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ছিল গভীর। জ্বালানি সংগ্রহ থেকে ওষধি বৃক্ষ সব বিষয়েই মেয়েরা ছিল বিশেষজ্ঞ। জ্ঞান ও কর্মের অপ্রতিরোধ্য এই শক্তিকে পরাহত করার জন্য ডাইনি হয়ে দাঁড়াল পুরুষতন্ত্রের এক অস্ত্র। ক্রমে তা কালান্তরে পরিণত হয় অন্ধ বিশ্বাসে যার থেকে মুক্ত ছিল না নারীরাও। ঈশ্বরের দ্বারা এই শক্তিশালিনীরা যাতে আরও শক্তিশালী না হয় তার জন্য ঈশ্বর প্রার্থনা এমনকি ধর্মাচরণেও নারীর প্রতি জারি হল নিষেধাজ্ঞা। তথাকথিত egalitarian বা সমতাভিত্তিক সাঁওতাল সমাজেও নারীপুরুষ সমতা হল সুদূর পরাহত।

ঔপনিবেশিক যুগের প্রতিক্রিয়ায় প্রথাভিত্তিক সাঁওতাল সমাজে যে ভাঙন সূচিত হয়, তার পরোক্ষ প্রভাবে নারী অধিকার আরও সংকুচিত করে ডাইনি চিহ্নিতকরণের পথ প্রশস্ততর এক পরিসর লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একদিকে যেমন ভূমির উপর সাঁওতালদের যৌথ মালিকানা স্বত্বে আঘাত হানে, অন্যদিকে বাজার অর্থনীতি ও মহাজন অনুপ্রবেশ নারীদের জমির উপর প্রথাসম্মত অধিকারেও হস্তক্ষেপ করে। এই সমাজে বিধবা বা নিঃসঙ্গ নারীর জমির উপর অধিকার ছিল এক স্বীকৃত প্রথা। এইসব নারীদের ডাইনি চিহ্নিত করে হত্যার ঘটনা আদিবাসী এলাকায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই হত্যাকারীরা হতো সেই নারীর আত্মীয়। Archer দেখিয়েছেন যে, সাঁওতাল পরগনায় ১৯০৬-এ ভূমি বন্দোবস্তের হিসাব অনুযায়ী জমির স্বত্বে নারীদের সংখ্যা ১৯২২-এর ভূমি বন্দোবস্তের তালিকায় কমে যায়। সেখানে অন্যান্য নারীদের বাদ দিয়ে শুধু বিধবা ও একক খোরপোশদের নারীদের স্বত্ব স্বীকৃত ছিল। এই সময় থেকেই অবশ্য বিধবা নারীদের কন্যারা এবং সাধারণ কন্যা সন্তানেরা মায়ের ও পিতার সম্পত্তির দাবিদার হয়ে আদালতে মামলা শুরু করে।[১১] কাজেই ডাইনি হিসাবে বিধবাদের হত্যা করেও সম্পত্তি হস্তগত করা ক্রমশ অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। অরণ্যের অধিকার সংকুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঝাদের পক্ষে ভেষজ বৃক্ষের মূল, পাতা বা ফল সংগ্রহ দুরূহ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু এতাবৎ কালের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার দায় থেকে তারা বিভিন্ন রোগ বা অপঘাত মৃত্যুর জন্য ডাইনিকেই চিহ্নিত করতে থাকে। আশ্চর্য এই যে ডাইন হিসাবে কদাচিৎ চিহ্নিত হতেন পুরুষরা।

শেষকথা

পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার দ্বান্দ্বিক পথেই উত্তরিত হয় ইতিহাস, আর আদিবাসী রমণীজীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। '৪৭ পরবর্তী ঘটনাবলীতে আদিবাসী জগতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শ্লথগতি হলেও ঘটতে থাকে পরিবর্তন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একদিকে নির্বাচনী রাজনীতি, অন্যদিকে শিক্ষার প্রসার তাদের অনেকটাই মূল স্রোতের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ছায়া ফেলতে শুরু করে। নির্বাচনী রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় সব রাজনৈতিক দলই কুপ্রথাকে আঘাত করতে ইতস্তত করলেও আদিবাসী সমাজের ভিতরেও আসছিল পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক যুগের সময় থেকেই আদিবাসী গ্রামসমাজের ভাঙন মাঝি প্রথাকে আঘাত করায় নারীর উপর সামাজিক নিপীড়ন অনেকটাই শিথিল হয়ে আসে। কয়লাখনি, খাদান বা চা বাগানের কর্মরতা নারীরা কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজের আধিপত্যের বাইরে চলে যায়। সেখানে অবশ্য তারা অন্য ধরনের শোষণের শিকার হয়, যে শোষণ সার্বিকভাবে আধুনিকায়িত ধনতান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য পরিণতি। ডাইন হিসাবে মৃত্যুর পরিবর্তে পতিতাবৃত্তির বিষপানে তারা বাধ্য হয়। জ্ঞানগুরু বা ওঝার পরিবর্তে সে সমাজ শাসন করে আড়কাঠি বা ঠিকাদার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরলালদের (*বীতংস*) ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়ে না। পঞ্চায়েতে আদিবাসী নারীদের যে ক্ষমতায়ন ঘটে, সেখানে দলতন্ত্র তার নিজস্বতাকে স্তব্ধ করে দেয়। শিক্ষার সুযোগে যে নতুন এলিট আদিবাসী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তারা গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরবাসী হন এবং অবশ্যই সেই সমাজের নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরনো ধারা থেকে অব্যাহতি পান। আর পিছনে যে গ্রামসমাজ পড়ে থাকে, যা কিনা ঘরেও নয়, পারেও নয়, সেখানে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ক্রমশই ঘনীভূত হতে থাকে এক সংকট। শুধু নারীর কথা নয়, সার্বিক। সে সংকট এক আত্ম-পরিচয়ের সংকট।

কিন্তু ধারাবাহিকতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সমাজে নারী সব সময়েই পুরুষের সহকর্মী। সংসার পরিচালনায় যেমন এদের প্রাধান্য, তেমনি সংকট বা বিপ্লবকালেও তারা পুরুষের সহযোগী যোদ্ধা। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে এরা ছিলেন পুরুষের পাশাপাশি এক শক্তি। বিদ্রোহ শেষে বহু নারী গ্রেপ্তার হন, তাদের সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুরাও রেহাই পায় নি। সিউড়ি জেলের তৎকালীন জেলার এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গিয়েও কয়েকজনের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আবার লালগড়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে বোমা বিস্ফোরণের পর যে পুলিশি অত্যাচার করা হয়, সেখানে এই অত্যাচারের শিকার বহু আদিবাসী নারী। গ্রেপ্তার করা হয় নীলিমা হাঁসদা, পদ্মমণি বাসকে, বিধু মুর্মু প্রভৃতি সাঁওতাল রমণীদের। পুলিশ অত্যাচার বিরোধী কমিটির পুরোভাগে থাকতেন আদিবাসী নারীরা। এইভাবে বোধহয় একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। কিন্তু ইতিহাসে বৃত্ত কি সত্যিই শেষ হয়?

এর পর ৯০ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

আলোকের যুগ ও নারী

সুচরিতা সেন

ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগ ইউরোপে আলোকের যুগ বা enlightenment নামে খ্যাত। মানবজাতির ইতিহাসে এই পর্বটির গুরুত্ব অসীম। নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ যখন লাঙল, চাকা, নৌকা ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিল, তারপর এটাই বৃহত্তম পরিবর্তন। আলোকের যুগ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায়। তবে সব ছেড়ে দিলেও এর সব চেয়ে বড় অবদান মানুষকে অলৌকিক থেকে লৌকিক বিশ্বাসের জগতে নিয়ে আসা। ভলতেয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়। "ভেড়াকে কালো যাদু দিয়ে হত্যা করা যায়, যদি তার সঙ্গে আর্সেনিক থাকে।" অর্থাৎ ভালো মন্দ যাই হোক, উদ্দেশ্য সাধনের উপায় লৌকিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি। যাদু, মন্ত্র তন্ত্র, শয়তান বা ঈশ্বরের কাছে জানু পাতা নয়। এ হেন চিন্তা না থাকলে কেবল বিজ্ঞানের প্রসার, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি সম্ভব হত না তাই নয়। আজও নির্দোষ মানুষকে পুড়িয়ে মারা হতো, সব অশুভের আকর ডাইনি রূপে। আমাদের দেশে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যে প্রথা আজও লোপ পায় নি।

তবে আলোর অন্য দিকও আছে। নারীবাদীদের একাংশ আলোকের যুগ এবং কিছু পরিমাণে তার পূর্ববর্তী রেনেসাঁসকে ভালো চোখে দেখেন না। অন্তত তার যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান সচেতন দিকগুলি। তাদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তি যে ভাবে প্রকৃতিকে করায়ত্ত করার নামে ধ্বংস করছে, পরিবেশকে দূষিত করে মানবজীবনকে প্রায় অসহনীয় করে তুলেছে, তার পথপ্রদর্শক আলোকের যুগের মনীষীরা। যদি নারী ও প্রকৃতি একাত্ম হয়— যা মনে করেন কিছু পরিবেশপন্থী নারীবাদী বা eco-feminist— তবে তো আলোকের যুগ নারী বিরোধী।

তাছাড়া সে যুগের মূল চিন্তাধারা পুরুষকেন্দ্রিক, যাকে বলে masculine discourse।

এ জাতীয় অভিযোগের মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্য নিহিত আছে। তবে এর একটা বিপজ্জনক দিকও আছে। এ ভাবে তর্ক করতে গেলে বলতে হয় যুক্তিবাদ বিজ্ঞানের মূলে আর বিজ্ঞান জন্ম দিয়েছে আণবিক বোমার। অতএব যুক্তিবাদ বর্জনীয়। আলোকের যুগে নারীর অবস্থা ও অবস্থান এক নজরে দেখা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স এবং ইউরোপ অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ প্রধান ছিল, প্রায় গোটা দুনিয়ার মতো। তবে পুরোনো জমানার (ancient regime) অর্থাৎ প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে উচ্চ সমাজে কিছু নারী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে মাননীয়া ও প্রভাবশালিনী ছিলেন। রাজ-রক্ষিতাদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। সাংস্কৃতিক জগতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে salon বা ফ্যাশনদুরস্ত ড্রয়িং রুম, এক একটি পরিচালনা করতেন কোনো অভিজাত মহিলা, যেমন মাদাম রাঁবুইয়ে, মাদাম দেফাঁ। তাঁদের বসার ঘর ছিল জ্ঞানীগুণীদের মিলনস্থান। সে যুগের সেরা লেখকরা নিজেদের লেখার বিষয়ে সালঁ কর্ত্রীদের পরামর্শ চাইতেন। তাঁদের প্রশংসা লাভ করলে ধন্য হতেন। কেবল সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান নয়। কোনো কোনো অভিজাত মহিলা নিজেরাও অত্যন্ত বিদূষী ছিলেন। যেমন ভলতেয়ারের বান্ধবী মাদাম দু শ্যাতালে। ইংরেজ চিন্তাধারা ফ্রান্সে আমদানি করে যারা আলোকের যুগকে বিস্তৃত ও জোরদার করেছিলেন, এই মহিলা তাদের একজন। যে কালে মেয়ে দূরে থাক, পুরুষদের মধ্যেও বিজ্ঞান চর্চার তেমন রেওয়াজ ছিল না, তখন মাদাম দু শ্যাতালে ছিলেন যথেষ্ট পারঙ্গম। অবশ্য এক পরিচিত মহিলা মন্তব্য করেছিলেন, যারা বিজ্ঞানের কিছুই জানে না, তাদের কাছেই মাদাম দু শ্যাতালে নিজের বিদ্যা জাহির করে। মেয়েরা মেয়েদের সব চেয়ে বড় শত্রু একথা সুবিদিত।

ইংল্যান্ডের সিনিকাল পত্রলেখক লর্ড চেস্টারফিল্ড ব্যঙ্গ ভরে মন্তব্য করেছেন, প্রাচীন ব্যাবিলনে প্রথা অনুসারে বছরে এক দিন এক দাসকে রাজ সিংহাসনে বসানো হতো। কিন্তু ফরাসিরা চিরকাল নারীদের রাণী করে রাখে। ব্যাপারটা, চেস্টারফিল্ডের মতে, আরো হাস্যকর। কারণ একজন দাস হয়েছে তা ভাগ্য বিড়ম্বনায়। কিন্তু নারীদের দাসত্ব প্রকৃতিগত।

আলোকের যুগে সব দার্শনিক অবশ্য এ বিষয়ে একমত ছিলেন না। দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) ছিলেন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দ্য গ্রেটের পরামর্শদাতা। নারী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি এক বিস্তারিত রূপরেখা পেশ করেছিলেন। তাঁর মতে, বালিকাদের শরীর বিদ্যা (physiology) শেখানো উচিত। সে যুগে অন্তত ভালো ঘরের কুমারীরা মনে করত, সারস পাখি নবজাত শিশুদের নিয়ে আসে। কিন্তু, দিদেরো দাবি করেছিলেন, এ জাতীয় 'পবিত্রতা' মোটেই সুফল দেয় না। অজ্ঞ, অনভিজ্ঞা মেয়েদের সহজেই কুপথে নিয়ে যাওয়া যায়।

সে যুগে বড় ঘরে অধিকাংশ বিবাহ ছিল প্রেমহীন। রাজনীতি ও সম্পত্তির তাসের খেলা। দিদেরো প্রেমহীন বিবাহের অভ্যন্তরে নারীদের অবস্থার কথা লিখেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়।

প্রখ্যাত নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক মারিভো (১৬৮৮-১৭৬৩) ছিলেন যাকে বলা যায় প্রোটো ফেমিনিস্ট। নারীবাদ ঘোষিত হওয়ার আগেই নারীবাদী। তাঁর এক নাটকের বিষয় লিঙ্গ দ্বন্দ্ব (gender fight)। এক নগরে নারীরা পুরুষ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শাসকরা 'ভাগ করো আর শাসন করো' নীতি অনুসরণ করে বুর্জোয়া ও অভিজাত নারীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন সৃষ্টি করে লিঙ্গ ঐক্য (gender solidarity) ভাঙেন। যেহেতু নাটকটি কমেডি, 'সব ভালো যার

শেষ ভালো' গোছের পরিণতি হল। তবে লেখকের বক্তব্য স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

মঁতেসকিউ আধুনিক (১৬৮৯-১৭৫৫) সমাজতত্ত্বের জনক গণ্য হন। তাঁর বিশাল বই L'Espirt der Lois (Spirit of the Laws) প্রাচীন ও আধুনিক সমাজব্যবস্থার ও নিয়মকানুন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা তুলে ধরেছে। মঁতেসকিউয়ের বক্তব্য, সমাজ, রাষ্ট্র, নরনারীর সম্পর্ক, সব কিছু নির্ভর করে ভূগোল ও আবহাওয়ার উপর। যেমন, গরম দেশে স্বাভাবিক ধর্ম ইসলাম (হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মকে তিনি গুরুত্ব দেন নি)। স্বাভাবিক রাষ্ট্র কাঠামো স্বৈরতন্ত্র। স্বাভাবিক পারিবারিক কাঠামো পুরুষের বহুবিবাহ ও অবরোধ প্রথা। মূলমন্ত্র, ভয়। মোটামুটি শীতল দেশে, যেমন ফ্রান্সে, স্বাভাবিক ধর্ম ক্যাথলিক গির্জা। স্বাভাবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢিলেঢালা রাজতন্ত্র। স্বাভাবিক পারিবারিক কাঠামো এক স্বামী এক স্ত্রী, কিন্তু সেই সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত প্রেম। মূলমন্ত্র, মর্যাদা (honour)। আরো শীতল দেশে, যেমন ইংল্যান্ডে, স্বাভাবিক ধর্ম মডারেট প্রটেস্টান্ট ধর্ম। স্বাভাবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাততন্ত্র। পারিবারিক কাঠামো একগামী বিবাহের পাশাপাশি গণিকা বিলাস। আরো শীতল দেশে, স্বাভাবিক ধর্ম চরমপন্থী প্রটেস্টান্ট ধর্ম। স্বাভাবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্র। পারিবারিক কাঠামো একনিষ্ঠ বিবাহ। মূলমন্ত্র, সচ্চরিত্রতা (virtue)।

মঁতেসকিউ দাবি করেছেন, পূবের দেশগুলিতে, এশিয়া আফ্রিকায় মিশনারি পাঠিয়ে একনিষ্ঠতা প্রচার করে লাভ নেই। ঐ সব দেশের জলহাওয়ায় বহুবিবাহ অনিবার্য। গরম দেশে মেয়েরা ফুলের মতো তাড়াতাড়ি ফোটে ও তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে। অন্যদিকে পুরুষ অনেক বেশি দিন সচল ও সক্ষম থাকে। ধরা যাক, এক কুড়ি বছরের যুবকের সঙ্গে এক ষোড়শীর বিবাহ হলো। দশ বছর পর স্বামী রইবে জীবনরসে ভরপুর। আর স্ত্রী রূপান্তরিত হবে দেহে মনে বৃদ্ধায়। এমন অসম দাম্পত্য অসহনীয় হতে বাধ্য। বিয়ে ভেঙে অথবা না ভেঙে নতুন তরুণী স্ত্রী ঘরে আনা ছাড়া স্বামীর উপায় কী? আবার বহু স্ত্রী আর তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অবরোধ ছাড়া পথ নেই।

মঁকেসকিউয়ের এহেন বক্তব্য এশিয়া আফ্রিকায় কতখানি সমাদৃত হয়েছিল জানা নেই। তবে তাঁর স্বদেশে দুই গোষ্ঠীর মানুষ মোটেই খুশি হন নি। এক, শক্তিশালী ক্যাথলিক গির্জা। খ্রিস্টান ধর্ম ও নীতি সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, ভূগোল অনুসারে ন্যায় অন্যায় পাল্টায়, পোষাকের মতো, এ কথা মানা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা মেয়েরাও কেউ কেউ অবরোধ প্রথা সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এশিয়ান বোনদের দুর্গতির দরুন ইউরোপীয় নারীদের অবস্থার অবনতি হতে পারে, এমন ভয় তাদের ছিল।

মঁতেসকিউ মনে করতেন, বিবাহিত পুরুষের ব্যভিচারের তুলনায় বিবাহিত নারীর অনুরূপ অপরাধ অনেক বেশি গুরুতর। কারণ স্বামীর অবৈধ সন্তান বিষয়সম্পত্তি লাভ করে না। অন্যদিকে স্ত্রীর অবৈধ সন্তান স্বামীর উত্তরাধিকারী হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য মঁতেসকিউ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতের প্রতিধ্বনি করেছিলেন। কিন্তু তিনি নারীদের দুর্বল লিঙ্গ মনে করতেন বলেই তাদের একটি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। স্বামী নয়, কেবলমাত্র স্ত্রীর অধিকার থাকবে বিবাহবিচ্ছেদ মামলা দায়ের করার। তাঁর যুক্তি এই রকম। বিয়ে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ বা স্বার্থ মেয়েদের দিক থেকে ঢের বেশি। একেবারে অসহনীয় অবস্থা না হলে সাধারণভাবে কোনো নারী বিয়ে ভাঙতে চাইবে না। একজন পুরুষ সহজেই আবার বিয়ে করতে পারে। কিন্তু প্রথম স্বামীর ঘর করে রূপ যৌবন নিঃশেষ করে স্ত্রীর— মঁতেসকিউ মনে করতেন মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি— দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে স্বাগত হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা কতখানি? অতীত আনন্দের স্মৃতিই স্বামীকে সদয় করে তোলে বিগতযৌবনা স্ত্রীর প্রতি। আজ ওর মুখ বলিরেখায় ভরা, কিন্তু প্রথম যখন আমার ঘরে এসেছিল তখন তো ছিল ফুলের মতন। এখন ওর চুল সাদা। কিন্তু একদিন তো ছিল সোনালি। দ্বিতীয় বিবাহে এমন স্মৃতিজড়িত কোমলতার সুখ কোথায়?

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে মতেঁসকিউকে খুব বেশি নারীবান্ধব বলা যায় না। যদিও তিনি হয়ত জবাব দিতেন, ভালোমন্দের প্রশ্নই নেই। ভৌগোলিক ভাবে যা অবধারিত তা অনিবার্য। কিন্তু মঁতেসকিউয়ের অন্য দিকও আছে। তাঁর কম বয়সের লেখা পত্রোপন্যাস 'পারসিক পত্র' (Letters Persian) সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। উপন্যাসের কাহিনী এই রকম।

কিছু শিক্ষিত ও অভিজাত পারসিক ইউরোপ প্রবাসী। তারা ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ঘুরছে, সব কিছু দেখছে, মত প্রকাশ করছে। ইউরোপ ও এশিয়া, পূব পশ্চিম উভয়কেই বিচার করা হয়েছে আলোকের যুগের যুক্তির আলোয়। এখানে আমরা কেবল কাহিনীর নারী সংক্রান্ত দিক নিয়ে আলোচনা করব।

পরিব্রাজকদের মধ্যে একজন উজবেক, দেশে তার হারেম ফেলে এসেছে। সেখানে আছে অন্তত তিনজন স্ত্রী, অগণ্য রক্ষিতা ও দাসী। খোজারা হারেম পাহারা দেয়। মজার কথা হলো, উজবেক গণতন্ত্র, মানব মুক্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তার হারেম একটি ক্ষুদ্র স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রধান খোজা স্বৈরতন্ত্রের সহচর, মন্ত্রণাদাতা, চার দেওয়ালের মধ্যে উজীর। স্বৈরতন্ত্র শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে, কী রাষ্ট্রে, কী সরকারে। উজবেকের প্রিয়তমা পত্নী রোকসান, যে সব চেয়ে বেশি সংযম ও বাধ্যতার ভান করে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হয়। তার প্রেমিক খোজাদের হাতে নিহত হয়। রোকসান মৃত্যু বরণ করে বিষপানে। মৃত্যুর আগে স্বামীকে লেখা পত্রে প্রকাশ করে তার প্রকৃত বিদ্রোহের মনোভাব। "তুমি যদি যা খুশি করো আমি তোমার হাতের পুতুল হয়ে থাকব কেন?"

আর এক বিদ্রোহিনী হারেমবাসিনীর কাহিনীও উপন্যাসে

দ্রষ্টব্য। বিদ্রোহের মূল্য সে দেয় জীবন দিয়ে। মৃত্যুর পর তার স্থান হয় বেহেস্তে। সেখানে তার মনোরঞ্জনের জন্য নিযুক্ত হয় ক'জন রূপবান ফেরেস্তা। আমরা জানি, মুসলিম বেহেস্তে প্রতি পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট আটাত্তর জন হুর। মেয়েদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা নেই। মঁতেসকিউ বোধহয় ভেবেছিলেন, What is sauce for the gander should be sauce for the goose.

একটি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত কাহিনীর পটভূমিকা, প্রাচীন পারস্যে অগ্নি উপাসক ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ। অগ্নি উপাসনার যুগে নারীরা অধিক সুখী ও সম্মানিত ছিল, এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সে কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য কিনা সে প্রশ্নে আমরা যাচ্ছি না। লেখকের মনোভাবই বিচার্য।

এমনকি উজবেকও বহুবিবাহ ও অবরোধের কুফল স্বীকার করেছে। এর জন্যই তার ধারণা, দেশে জনসংখ্যা কমছে। কথা আপাত দৃষ্টিতে আশ্চর্য মনে হতে পারে। হারেম মালিকরা তো অজস্র সন্তান পৃথিবীতে আনবে। কিন্তু উজবেক লক্ষ্য করেছে, বাস্তবে তেমনটা হয় না। অত্যধিক উপভোগ এনে দেয় ক্লান্তি ও বন্ধ্যাত্ব। ধর্মের বিধান, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র। তাতে তোমরা উপগত হও।" কিন্তু একসঙ্গে বহু ক্ষেত্রে উপগত হলে ফসল তেমন উৎপাদন হয় না। তাছাড়া বহুসংখ্যক খোজা ও দাসী স্বাভাবিকভাবেই নিঃসন্তান থাকে। মনে রাখতে হবে, আলোকের যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণভাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধির সূচক গণ্য হতো।

মঁতেসকিউয়ের রচনার মধ্যে আমরা দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি দেখি। কোথাও পুরুষ প্রাধান্য মেনে নেওয়া হয়েছে অবধারিত বলে। আবার কোথাও পুরুষপ্রাধান্য স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক। রূপক। দুই-ই বিপর্যয় ডেকে আনে।

আলোকের যুগ প্রকৃতির বিধানে (laws of nature) বিশ্বাসী ছিল। এই আইন কাগজে কলমে লেখা নয়! প্রকৃতি তা প্রোথিত করেছে প্রতিটি মানব হৃদয়ে। এই তথাকথিত প্রকৃতির আইন দিয়ে নারী স্বাধীনতা বিচার করেছেন। রোকসান তার বিদ্রোহের সপক্ষে এই যুক্তিই দেয়। মঁতেসকিউ আরো উদাহরণ দেন, মধ্যযুগের এক ফরাসী আইনের। এই আইন অনুসারে কোনো নারী বিবাহের বাইরে অন্তঃস্বত্বা হলে, সে কথা স্থানীয় আইনরক্ষক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে। পাছে সে সুনাম রক্ষা করতে অবৈধ সন্তানকে হত্যা করে, তাই এই সতর্কতা। কিন্তু মঁতেসকিউ দাবি করেন, প্রত্যেক মানুষের নিজের জীবন বাঁচানোর অধিকার আছে, এটাই প্রকৃতির আইন। একজন নারীর সুনাম ও সম্মান তার জীবনের তুল্য। সে নিজে থেকে তা বিসর্জন দেবে, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, এমনটা দাবি করা যায় না।

মঁতেসকিউ ফুটিয়ে তুলেছেন নারী সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকের যুগের দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি। নারী সংক্রান্ত প্রশ্ন নানা ভাবে আলোকের যুগে ডিসকোর্সের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তা বোঝা যায়।

রুসো (১৭১২-১৭৭৮) সম্ভবত আলোকের যুগের সর্বাপেক্ষা র‍্যাডিকাল মুখ ছিলেন। তাঁকে সমাজতন্ত্রের জনক পর্যন্ত বলা হয়। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? রুশো কি নারী বিদ্বেষী ছিলেন? আক্ষরিক অর্থে, অবশ্যই নয়। তাঁর জীবনে একাধিক নারীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তাঁর প্রিয়তমা সোফি, যাকে তিনি কখনো পান নি, ছিল ধ্রুবতারার মতো। কিন্তু নারীর অধিকার ছিল অন্য রঙের ঘোড়া। নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করলেও তিনি তাকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবেন নি।

ধরা যাক তাঁর বিখ্যাত 'এমিল'-এর কথা। বইটি যাকে বলে শিক্ষা সংক্রান্ত উপন্যাস। লেখক/কথক এমিল নামে বালককে আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ মানুষে ক্রমে রূপান্তরিত করছেন। কিন্তু আদর্শ পুরুষের প্রয়োজন আদর্শ সঙ্গিনী। লেখক/কথক তার জন্য ছাঁচ ঢেলে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি করছেন এক বালিকাকে। রুশোর প্রিয়তমার নাম অনুসারে তার নামকরণ হয়েছে সোফি। সোফি এমিলের যোগ্য হবে, কিন্তু সমতুল্য নয়। তার শিক্ষাও হবে নিখুঁত, কিন্তু এমিলের শিক্ষা থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক প্লেটো পরিবার বস্তুটি তুলে দিয়েছিলেন। বদলে কিছু নারীকে স্থান দিয়েছিলেন প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদে। অবশ্য সবটাই কল্পনায়, বাস্তবে নয়। ভবিষ্যত ইউটোপিয়া বা কল্পরাজ্যের রূপরেখা রূপে। কিন্তু এ হেন ইউটোপিয়া রুশোর না-পসন্দ্। তিনি বলেছেন, পরিবার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পর নারীদের নিয়ে কী করবেন, প্লেটো বুঝতে পারেন নি। তাই তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার করেছেন। কিন্তু পরিবারই রাষ্ট্রের ভিত্তি। প্রতিটি পরিবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, সেখানে পারিবারিক কর্তব্য হয় নাগরিক কর্তব্য শেখার পথ। রুসো ভুলে যান, প্রাচীন নগর ব্যবস্থায় প্রকৃত অর্থে পরিবারই ছিল না। কারণ তার অভ্যন্তরে কোনো সমতা বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক যোগাযোগ ছিল না। আমরা 'পারসিক পত্রে' দেখেছি, অবরোধ ও বহুবিবাহ ভিত্তিক মুসলমান পরিবার রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল বটে, তবে তা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। গ্রিসে অবস্থা অতখানি চরম বা ভয়াবহ ছিল না। মাসিদন বাদে বাকি গ্রিসে বহুবিবাহ চালু ছিল না। ছিল না খোজার অস্তিত্ব। মেয়েরা কখনো কখনো আত্মীয়দের বাড়ি যেতে পারত। অংশগ্রহণ করতে পারত বিবাহে, শ্রাদ্ধে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তবে সাধারণভাবে ভালো ঘরের গ্রীক মহিলারা ছিল গৃহবন্দিনী ও গৃহকর্মে ব্যস্ত। পক্ষান্তরে, পুরুষেরা বেশির ভাগ সময় কাটাত রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চায়। দুজনে দুই মেরুর মানুষ। হয়ত পরিবারের অভ্যন্তরে মানসিক বন্ধন এত শিথিল ছিল বলেই প্লেটো এত সহজে পরিবার ব্যবস্থা নাকচ করার কথা বলতে পেরেছিলেন। শ্রমজীবী শ্রেণীর মেয়েরা অবশ্য খেটে খেত বলে কিছুটা স্বাধীন ছিল। অন্য দিকে উচ্চ শ্রেণীর গণিকারা ছিল কিছু পরিমাণে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারিণী। আসপেলিয়া রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসকে পরামর্শ দিতেন। দিওডিমা খোদ

সক্রেটিসের সঙ্গে দার্শনিক বিতর্ক করতেন। কিন্তু এরা কোনো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এই পরিবার, এই সমাজ ছিল রুসোর আদর্শ। তবে তিনি স্বীকার করতেন, এক প্রাচীন সরল সমাজে মেয়েরা গৃহকর্ম ভিন্ন কিছু না শিখলেও চলতে পারে, আধুনিক জটিল 'সফিস্টিকেটেড' সমাজে তা সম্ভব নয়। আজকের দিনে নারীদের কিছু শিক্ষা দিতেই হবে। কিন্তু সে শিক্ষা হবে নারীসুলভ। সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছেন, মেয়েরা আপেক্ষিক জীব (relative being)। রুসোর তাই বক্তব্য, তবে তিনি বিষয়টি দেখেছেন ইতিবাচক ভাবে। অর্থাৎ, এমনটাই হওয়া উচিত। মেয়েদের কর্তব্য পুরুষের অবসর বিনোদন, অসুখের সময় সেবা করা, দুঃখের কালে সান্ত্বনা দান। প্রত্যেক নারীর জীবন আবর্তিত হবে বাপ-ভাই, স্বামী-পুত্রকে নিয়ে। যেমন, মেয়েরা গান নাচ বাজনা শিখবে। তার উদ্দেশ্য, শিল্পী হওয়া বা খ্যাতি অর্জন নয়। এমনকি নিজের তৃপ্তিসাধনও নয়। স্বামীকে আনন্দ দান। প্রাচীন গ্রিসে পুরুষরা এই আনন্দ লাভ করত গণিকাদের কাছ থেকে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর উঁচু নীতিসম্পন্ন রুসো গণিকা গমন অনুমোদন করতে পারেন না। বৈধ পত্নীই হবে আনন্দদায়িনী।

সমরকেন্দ্রিক স্পার্টার নারীদেরও কিছু পরিমাণে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। কারণ, মনে করা হতো, বীরাঙ্গনারা বীর-প্রসবিনী। রুসো এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। তবে তিনি মেয়েদের কিছুটা শরীর চর্চা অনুমোদন করতেন। সোফি ও এমিল পরস্পরের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামে আর এমিল স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করে।

এমিল সোফির নীতিও এক নয়। একজন বালক অন্যায় তিরস্কার সহ্য করে না। একটি বালিকা সহ্য করে, কারণ তার জীবনের ব্রতই হলো সহ্য করা, মেনে নেওয়া। এমিল নিজে সৎপথে চলে। অন্যরা তাকে নিয়ে কী বললো না বললো তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু সোফিকে কেবল নিজের দোষগুণ সম্পর্কে নয়, সুনাম সম্পর্কেও সতর্ক হতে হবে।

রুসো অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। এমিল বিয়ের সময় শপথ করে, সে সোফির ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করবে না। আমরা দেখেছি, দিদেরো প্রেমহীন দাম্পত্য মিলনকে প্রায় ধর্ষণের সামিল মনে করতেন।

রুসোর অন্য একটি উপন্যাসের নাম 'নব এলোয়াজ'। নায়িকা জুলি শিক্ষিতা। বস্তুত, নিজের গৃহ শিক্ষকের প্রেমাসক্ত। জুলি ও তার স্বামী এক আদর্শ গ্রামীণ সমাজ (community) গড়ে তুলেছে। সেখানে মেয়েদের কিছুটা শিক্ষার সুযোগ আছে, কিন্তু তাদের প্রধান কাজ সন্তান ধারণ ও পালন। জুলির বক্তব্য, প্রত্যেক নারীকে অন্তত তিনজন সন্তান পৃথিবীতে আনতে ও মানুষ করতে হবে। না হলে জনসংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে যাবে। 'পারসিক পত্রে'ও জনসংখ্যা হ্রাস চিন্তার ব্যাপার, যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে। কিন্তু মৃত্যুর উচ্চ হারের যুগে এ যুক্তি একেবারে ফেলনা ছিল না।

আর এক সমস্যা ছিল, মেয়েদের ধর্ম কী হবে? এ বিষয়ে রুসো দৃঢ় ও নিঃসন্দেহ ছিলেন। একজন কুমারী কন্যা অনুসরণ করবে তার মা'র ধর্ম। এক বিবাহিত রমণী তার স্বামীর ধর্ম। সে ধর্ম ঠিক না ভুল, ভালো কি মন্দ তাতে যায় আসে না। কিন্তু এখানেও সমস্যার সমাধান হয় না। রুসো মনে করতেন, প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রে একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকা উচিত। এই ধর্ম হবে উদার, সহনশীল। বহু মত ও পথ ধারণের উপযুক্ত। তবে প্রতি নাগরিককে সেই ধর্ম মেনে চলতে হবে। কেবল বাইরের আচরণে মান্য নয়, মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। আদর্শ প্রজাতন্ত্রে নাস্তিকের স্থান নেই। যদি কোনো নাস্তিক তার প্রকৃত মনোভাব গোপন করে প্রজাতন্ত্রের মধ্যে রয়ে যায় আর তার প্রকৃত মনোভাব ধরা পড়ে তবে তার পাওনা চরম দণ্ড।

রুসোর মতো মানবতাবাদী, জনদরদী মনীষীর কলমে কিন্তু এ হেন ফতোয়া বিস্ময়কর। এর জন্য তাঁকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। বারট্রান্ড রাসেল রুসোকে ফ্যাসিবাদের এক পূর্বসূরী রূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে আমরা বিষয়টি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কী পাব? স্ত্রী কি কোনো স্বামীর ধর্মের নয়, ধর্মহীনতার শরিক হবে? সেও কি হবে গুপ্ত নাস্তিক?

রুসোর নারী সংক্রান্ত চিন্তার আরো পরিচয় মেলে 'দ্যালাঁবেয়ারকে পত্র' নামক রচনায়। দ্যালাঁবেয়ার ছিলেন আলোকের যুগের এক মনীষী। বিতর্কের বিষয় ছিল এই রকম। রুসো ফ্রান্সের বাসিন্দা হলেও জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন সুইস প্রজাতন্ত্র জেনিভার মানুষ। জেনিভায় থিয়েটার ছিল না। তবে অনেকে একটি থিয়েটার স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্যালাঁবেয়ার তেমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রুসো সে প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। নিজে একজন অপেরা লেখক হলেও রুসো থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন না। অনেকটা আজকের দিনে অনেকে যেমন টিভি-কে মনে করে 'ইডিয়ট বক্স'। রুসোর থিয়েটার বিরোধিতার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি কিছু বিচিত্র। থিয়েটার নাকি নারী পুরুষের মধ্যে মেলামেশা বাড়াবে।

এ কথা সত্য যে থিয়েটার সে যুগে ছিল সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্র। অনেক সময় লোকে সেখানে যেত নাটক দেখতে ততটা নয়, নিজেদের দেখাতে। বিশেষ করে মেয়েরা উদগ্রীব থাকত নিজেদের রূপ ও সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে। নাটকের মধ্যে কথাও চলত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ প্রাবন্ধিক অ্যাডিসন এ বিষয়ে কৌতুক কাহিনী শুনিয়েছেন। রুসোর ভয় ছিল, নারীরা (অবশ্যই বড়ো ঘরের নারীদের কথাই বলা হচ্ছে) পুরুষদের টেনে আনবে নিজেদের অলস, বিলাসী, উদ্দেশ্যহীন জীবনের মধ্যে। আবার রুসো তুলনা টেনেছেন প্রাচীন

গ্রিসের সঙ্গে। সেখানেও থিয়েটার ছিল কিন্তু ছিল না অনাত্মীয় নারী পুরুষের মেলামেশার সুযোগ। সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সারা দিন ব্যস্ত থাকত নিজের বা রাষ্ট্রের কাজে। ঘরে যেত কেবল খেতে ও ঘুমোতে। আর এটাই ছিল রুসোর মতে আদর্শ। রুসো মন্তব্য করেছেন, কুমারী কন্যারা বৃহত্তর সমাজে বের হতে পারে। কারণ তাদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে হবে। কিন্তু বিবাহের পর তারা পারতপক্ষে বের হবে না। ঠিক মুসলমান হারেমের মতো না হলেও প্রাচীন গ্রিক অবরোধের মতো অবস্থায় বাস করবে। একজন নারীর নাম পরপুরুষ উচ্চারণ করবে, এমনকি প্রশংসা করেও, এটা অসম্মানের কথা। ঘরের মধ্যে বসেও মেয়েরা লেখালেখি বা কোনো স্বাধীন কাজ করবে, তা রুসো চাইতেন না। যা করবে পতিদেবতার মনোরঞ্জনের জন্য।

রুসো যেন মনে করতেন, নারী স্বভাব এক রকম ভাইরাস যা পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের নাগরিকসুলভ গুণ নষ্ট করে দেবে। পুরুষদের নাগরিক থাকার অর্থ, মেয়েদের নাগরিক কর্তব্য ও অধিকার থেকে দূরে থাকা। তবে নারীদের একেবারে বঞ্চিত করেন নি। কুমারীরা নানা ধরনের প্রকাশ্য pageant বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। যা, রুসোর মতে থিয়েটারের তুলনায় শ্রেয়। নিষ্ক্রিয়ভাবে আমোদপ্রমোদ উপভোগের চেয়ে নিজেরা যৌথভাবে বিনোদন গড়ে তোলা ভালো। ফরাসি বিপ্লবের কালে সত্যিই এমন অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছিল।

এছাড়া নারীরা তাদের মহত্ত্ব, দেশপ্রেম প্রকাশ করতে পারে পরোক্ষে। প্রিয়জন হারাবার বেদনা বহন ক'রে। রুসো (তিনি বার বার গ্রিসে ফিরে আসেন অনুকরণীয় উদাহরণ তুলে ধরতে) প্রাচীন স্পার্টার এক জননীর কথা বলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এলো, তাঁর পাঁচ পুত্র নিহত হয়েছে কিন্তু দেশ জয়লাভ করেছে। তিনি মন্দিরে ছুটলেন দেবতাদের ধন্যবাদ দিতে। এখানে নাগরিক সত্তা রমণী ও জননী সত্তার অধিক। অবশ্য জননী সত্তা একেবারে চাপা পড়ে নি। তিনি হয়ত পুত্রদের জন্য অলক্ষ্যে অশ্রুপাত করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, রুসোর নারী বিষয়ক বক্তব্যকে অনেকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িক মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট (১৭৫৯-১৭৯৭), যাকে আধুনিক নারীবাদের পথপ্রদর্শক মনে করা হয়, থেকে মার্কিন নারীবাদী তাত্ত্বিক কেট মিলেট, বাংলাদেশের হুমায়ুন আজাদ। মেরির সমালোচনার ধারা এইরকম। তিনি যে career women বা মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন তা নয়। যদিও তিনি নিজে উপার্জন করতেন। অন্তত সচ্ছল ঘরের মেয়েরা আদর্শ গৃহবধূ হয়ে দায়িত্ব পালন করবে এ কথা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু রুসোর আদর্শে মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাও হবে না। রুসো বলেছেন, মেয়েদের কাজ পুরুষদের আনন্দ দান, নিজেদের পুরুষ দৃষ্টিতে মনোরমা করে তোলা। এই নীতির কুফল স্পষ্ট। ফরাসি মেয়েরা ছোটবেলা থেকে নিপুণ হয়ে ওঠে সাজগোজ আর ফ্লার্ট করার হাবভাবে। অবশ্য রুসো বলেছেন, মেয়েরা মনোযোগ দেবে সৎ ও বুদ্ধিমান পুরুষদের প্রতি। যারা সত্যিকারের মূল্য বোঝে। কিন্তু এতখানি বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল কি? সোফির জন্য রুসো তৈরি করে রেখেছেন আদর্শ এমিলকে। কিন্তু সাধারণভাবে সোফির মতো ভালো ঘরের যৌতুকহীন কুমারীদের অবস্থা খুব ঈর্ষণীয় ছিল না। তাদের জন্য বিকল্প সন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

মেরি দাবি করেছেন, সোফির শিক্ষা আদৌ সঠিক নয়। তার সযত্নে গড়ে তোলা চরিত্র বৃহত্তর বিশ্ব ও প্রলোভনের মুখোমুখি হলেই ভেঙে পড়বে। রুসোও বোধ হয় শেষ দিকে তাই মনে করতেন। তিনি 'এমিল'-এর পরবর্তী উপন্যাস বা sequel-এ সোফির এই পরিণামই দেখিয়েছিলেন। রুসো কি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন?

যুগসন্ধিক্ষণের কিছু শ্রেষ্ঠ মনীষী নারী সম্পর্কে যে জটিল ও বহুমুখী চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন, তা আজকে নারীবাদের ও নারী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণযোগ্য। তাঁদের চিন্তাজগতের নারীরা কেউবা নতি স্বীকার করে, তার মধ্যেই জীবনের সন্ধান পায়। কেউ পুরোদস্তুর লিঙ্গ যুদ্ধ শুরু করে। কেউ হারেমের অন্ধকারে বিদ্রোহ ও মৃত্যুর মাধ্যমে নিজেদের অবদমিত মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি আদায় ক'রে।

আদিবাসী নারী, তখন ও এখন

৮৫ পৃষ্ঠার পর

তথ্যসূত্র

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, *The Santals of Jungle Mahals : Through the Ages*, Suchibrata Sen, Ashadeep, 2013
২. Gordon Childe : *What Happened in History*, Penguin, 1942, Re-print 1964, p. 65
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৪. Sitakant Mahapatra in Giti Sen edited *Indigenous Vision*, New Delhi, 3rd ed., 1998, p. 71
৫. রামদাস টুডু রেস্কা : *খেরওয়াল বংশা ধবম পুঁথি*, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৩
৬. ধনপতি বাগ : *সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৮. G. Somers : *The Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society*, Delhi, 1977, p. 51
৯. W. J. Culshaw : *The Tribal Heritage, A Study of the Santals*, London, 1949, p. 16
১০. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : সাঁওতাল বিদ্রোহে নারী সমাজের ভূমিকা, *গণশক্তি*, ৩০, ৭, ২০০৭
১১. W. G. Archer : *Tribal Law and Justice, A Report on the Santals*, New Delhi, 1984, p. 684-5

পুলক চন্দ সম্পাদিত 'নারীবিশ্ব', গাংচিল, ২০০৮-এ বর্তমান লেখকের একটি প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধ

সমসাময়িক নারীবাদে তাত্ত্বিক বিতর্ক : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

শান্তনু সরকার

নারী আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে এর মধ্যের নানান প্রবণতা আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে এই আন্দোলন থেকে যে দার্শনিক প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে তার বেশিরভাগের চরিত্রই রাজনৈতিক অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলি টিকে থাকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষমতার বিন্যাসকে শুধুমাত্র সামাজিক বৈষম্যের রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই চিহ্নিত করেনি, আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই অবস্থানগুলি সমাজ পরিবর্তনের কথাও বলেছে। বিশেষ করে গত তিরিশ বছরে নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যেই তাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন ধারা তৈরি হয়েছে। তার ফলে এতদিন পর্যন্ত প্রায় নিয়ন্ত্রক অবস্থানে থাকা 'পশ্চিমী নারীবাদ' বাধ্য হয়েছে উত্তর আটলান্টিক-কেন্দ্রিক নারীবাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের, বিশেষ করে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে, তাত্ত্বিক ভাবনাকে স্বীকৃতি জানাতে। ফলে এই সময়ের নারীবাদ যথাযথ অর্থেই অনেকখানি সার্বিক চরিত্র পেয়েছে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তত্ত্ব হিসেবে নারীবাদী ভাবনা অনেক ঋদ্ধ হয়েছে। এর পাশাপাশি অবশ্য অন্য একটা ব্যাপারও ঘটেছে। গত তিন দশকে বিশেষত বিদ্যাচর্চায় নারীবাদী তত্ত্বের দার্শনিক প্রশ্নে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে এমন ভিন্ন মত তৈরি হয়েছে যে সবগুলিকে হয়তো 'নারীবাদ' নামে এক ছাতার তলায় আনাও যাবে না।

এই সময়ের নারীবাদী ভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের জায়গা 'নারী' নামক বর্গ (category) টিকে নিয়েই। লিঙ্গ পরিচয় নারীর অবস্থান ব্যাখ্যানে আদৌ কোনো সহায়ক বর্গ কিনা তা নিয়েও একেবারে বিপরীত মত আজকের নারীবাদী তত্ত্বে বর্তমান। ফলে আজ নারীবাদ বলতে বোঝায় ভিন্ন অবস্থান থেকে খোঁজা এক বহুমুখী অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। আজকের নারীবাদ এক গতিশীল বহু অবস্থানের সমাহার।

'লিঙ্গ' বিষয়ক ভাবনা

নারীবাদী তত্ত্বে নানান বিষয়ে ভাবনার বহুমুখিনতা থাকলেও একটা বিষয়ে মোটামুটি সকলেই একমত ছিলেন যে, নারী পুরুষের জন্মগত যৌন পরিচিতির পার্থক্যের সাথে লিঙ্গ নির্মাণের বিষয়টি যুক্ত। এই ভাবনাটি আসলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বিকশিত প্রজননজনিত শরীর বিজ্ঞানের ভাবনার অনুসারী, যে বিজ্ঞান নারী-পুরুষের যৌন পরিচয়ের পার্থক্য সূচিত করে শরীরের গঠনের (anatomy) সূত্রে। শরীরের যৌন পরিচয়ের সূত্রে লিঙ্গ পরিচয়ের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস, তাকে প্রথম প্রশ্ন করে 'নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ' (Second Wave Feminism)। প্রসঙ্গত বোভোয়া'র সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে— "One is not born a woman, but, rather, becomes one"। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভাবনাকে একটি আলোচনার বর্গ হিসেবে প্রথম ব্যাখ্যা করেন রুবিন্স (১৯৭৫)। ফ্রয়েড, লেভি-স্ট্রস এবং লাকঁ (Lacan)র ভাবনাকে গ্রথিত করে তিনি দেখান কিভাবে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার মধ্যে দিয়ে শারীরিকভাবে পুরুষ এবং নারীকে লিঙ্গগত পুরুষ-নারীতে পরিণত করা হয় এবং ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাসে তাদের ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করে নারীকে অবনমন করা হয়।

লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে যে 'স্বাভাবিক' যৌন পরিচয়ের কথা বলা হয় পরবর্তী সময়ে এই ভাবনাকে প্রশ্ন করা হয়। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যেই কেউ কেউ (বাটলার) বলেন যে— লিঙ্গ পরিচয়ই শুধু নির্মাণ নয়, এর ভিত্তি যে স্বাভাবিক যৌন পরিচয়, অর্থাৎ 'ছেলে' এবং 'মেয়ে', সেই স্বাভাবিক যৌন পরিচয়টিও একটি নির্মাণ। শুধু তা-ই নয় নারীবাদীরা আজ 'লিঙ্গ' ভাবনাকে একটি বর্গ হিসেবে দেখার পক্ষপাতীও নয় এবং পুরুষত্ব/নারীত্ব যে দ্বিত্ব ভাবনাকে হাজির করে দার্শনিকভাবে তারও বিরোধী নারীবাদ।

লিঙ্গ পরিচয় থেকে বিষয়ীর অবস্থান :
'নারী' যখন বিতর্কের কেন্দ্র

১৯৮০-৯০ সময় পর্বে বহুমুখী দর্শনভাবনা ও তীব্র বিতর্কের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদী তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে কীভাবে নারী-কেন্দ্রিক নারীবাদী 'বিষয়ী' নির্মাণ করা যায়। এই বিতর্ককে দুটি মূল প্রশ্নের জায়গা থেকে বোঝা যেতে পারে। ১) নারীর দৃষ্টিভঙ্গি অথবা নারী স্বার্থ ঠিকভাবে বোঝার আগেই কি নারী সম্পর্কে কোনো সমসত্ত্বের ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব? ২) আমাদের প্রতীকী নির্জ্ঞানে নারীত্ব বিষয়ক কোনো ধারণা কি আগে থেকেই বর্তমান?

বিশ শতকের শেষ দুই দশকে 'নারী' বা 'বিষয়ী' কেন্দ্রিক বিতর্ক মূলত আবর্তিত হয়েছে তাত্ত্বিক ভাবে তিনটি অবস্থান থেকে— ১) Difference feminism (ভিন্নতার নারীবাদ), এটির আবার দুটি ভাগ— Social (সামাজিক) এবং Symbolic (প্রতীকী); ২) Diversity feminism (বহুস্বরিক নারীবাদ); ৩) Deconstruction feminism (বিনির্মাণপন্থী নারীবাদ)

ভিন্নতার নারীবাদের দুটি উপধারাই 'নারী' বা 'নারীত্ব'র ধারণাকে পুনর্মূল্যায়ন করে, যৌন পার্থক্যের কারণে সমাজে নারীকে যে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে বদলাতে

চায়। এই দুই উপধারার ধারকরাই নারীকে সামাজিকভাবে অবদমিত করে রাখার কৌশলের অঙ্গ হিসেবে সামাজিক যে প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রিয়াশীল সেগুলিকে চিহ্নিত করেন অথবা মনস্তাত্ত্বিক গঠনে এর শিকড় কীভাবে আছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। এই দুই উপধারার ধারকদের কাছেই এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা নারীর সার্বিক অবদমনকে বোঝার ক্ষেত্রে, 'নারী শরীর' এক অন্যতম আলোচ্য। যদিও দুই উপধারার মধ্যে এ বিষয়ে গুরুত্বের কিছু হেরফের আছে।

সামাজিক ভিন্নতার নারীবাদের বিপরীতে বহুস্বরিক নারীবাদ দর্শনগত ভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে 'নারী বিষয়ী' ভাবনা এবং সমসত্ত্ব নারী-র ধারণার বিরোধিতা করে। সমসত্ত্ব 'নারী' ধারণাকে সমস্যায়িত করতে চেষ্টা করে বর্ণ, শ্রেণী, জাতিসত্ত্বা, যৌনতা ও অন্যান্য সত্ত্বার ধারণাকে নিয়ে এসে। ফলত বহুস্বরিক নারীবাদ যৌন পরিচয়ের প্রাথমিক গুরুত্বকে অস্বীকার করে।

বিনির্মাণপন্থী নারীবাদ লিঙ্গভাবনায় নারী-পুরুষের দ্বিকোটিক অবস্থানের নির্মাণের বিরোধিতা করে। এই প্রেক্ষিতটি প্রাক-যৌন শরীরে কোন পূর্বতসিদ্ধ 'নারী বিষয়ী' বা নারী ভাবনা তৈরি হওয়ার সম্ভাব্যতাকেই অস্বীকার করে, শুধু তা-ই নয় যৌন পার্থক্যের কারণে নারীত্ববাচক গুণ বা স্বতঃসিদ্ধ বিসমকামিতাকেও এই ভাবনা বিরোধিতা করে। বিনির্মাণপন্থী ভাবনা অনুযায়ী যৌন পরিচয় (শারীরিক) বা শরীর কোনোটিই আগে থেকে স্থিত থাকে না, বা নিষ্ক্রিয় নয়। এগুলি আসলে এক ধরনের উপস্থাপন, যা সমাজে একধরনের মূল্যবোধ, ও সামাজিক তাৎপর্য্যের সৃষ্টি করে। ফলে যৌন পরিচয়কে শারীরিক বা মনস্তাত্ত্বিক বা নির্দিষ্ট স্থিত একটি বর্গ এবং লিঙ্গ পরিচয়কে সামাজিক নির্মাণ হিসেবে না দেখে এই ধারার নারীবাদীরা যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়ের বৈপরীত্যকে/ এসেনশিয়ালিজমকে এবং নির্মাণবাদকে বিরোধিতা করে।

তবে বৌদ্ধিক চর্চায় যে নারীবাদী তত্ত্বের চর্চা হয়, সেখানে শুধুমাত্র ভিন্নতার নারীবাদই নয়, বহুস্বরিক নারীবাদ এবং বিনির্মাণপন্থী নারীবাদের অভ্যন্তরেও ভাবনার ভিন্নতার নানা দিক আছে। ফলে 'নারী' বলতে কী বোঝায় বা কোন্ নারী এই আন্দোলনের 'বিষয়' এবং 'বিষয়ী', এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা ধরনের ঐক্যমতে না পৌঁছতে পারা সমসাময়িক নারী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা।

নারীবাদে 'বিষয়ী' সমস্যা : ভিন্নমত

নারীবাদী তত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের জায়গা হল 'লিঙ্গ' (gender) বিষয়ক তত্ত্ব বা যৌন পরিচয়ের ভিন্নতা ভাবনা। এ বিষয়ে দুটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। প্রথমটি হল সামাজিক ভিন্নতার নারীবাদী ভাবনা, যা শুরু হয়েছিলো অ্যাংলো-আমেরিকান নারীবাদীদের তাত্ত্বিক ভাবনায়, যাদের মতে লিঙ্গ পরিচয় নির্মিত হয় এক ধরনের সামাজিকীকরণের বা মনস্তাত্ত্বিকতার মাধ্যমে আত্মস্থকরণের (internalisation) মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত ফরাসি নারীবাদীদের অবদান। এই 'প্রতীকী' ভিন্নতার নারীবাদী ভাবনা শুরু হয় মনোবিকলন দিয়ে, নির্জ্ঞানে যে যে প্রতীকী (symbolic) এবং কাল্পনিক (imaginary) স্তর সেখানে যৌন পরিচয়ের ভিন্নতার ফল এদের চর্চার বিষয়। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আসলে বাস্তবতার দুটি ভিন্ন স্তরে ক্রিয়া করে। একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার (historical-material) স্তরে, অপরটি প্রতীকী মনোবিকলনের (symbolic-psychic) স্তরে। ফলে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দুটি আলাদা অবস্থান থেকে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। সামাজিক ভিন্নতার নারীবাদকে বিরোধিতা করে বহুস্বরিক নারীবাদ এবং প্রতীকী ভিন্নতার নারীবাদী বিরোধ করে বিনির্মাণবাদী নারীবাদ।

ভিন্নতার নারীবাদ ১ :

সামাজিকীকরণের ফল লিঙ্গপরিচয় ও নারীবাদী অবস্থান

সাত-এর দশকের শেষে আশির দশকের শুরু থেকে অ্যাংলো আমেরিকান নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ এগিয়ে গিয়ে নতুন রূপ নিতে শুরু করে, যার মধ্যে নানান ধারার ভাবনার প্রভাব থাকে।

যেমন বোভোয়া'র (১৯৪৯) অস্তিত্ববাদী নারীবাদ, ফ্রিডান-এর (১৯৬৩) উদারনৈতিক নারীবাদ, মিলেট-এর (১৯৭০) বিপ্লবী নারীবাদ, রোবথম-এর (১৯৭২) মার্কসবাদী নারীবাদ, মিশেল-এর(১৯৭৩) মনোবিকলনবাদী নারীবাদ ইত্যাদি। এই নানান ধারার নানান প্রধান ভাবনা (patriarchy, Androgyny, Misogyny consciousness raising sisterhood) বা সমাজ ব্যাখ্যা এবং পরিবর্তনের বিভিন্ন বর্গগুলি ও মার্কসবাদী নারীবাদীদের পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্রের তত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল বোভোয়াবাদীদের তত্ত্ব, সন্তান ধারণ পরিবার জীবন সম্পর্কিত ধারণা বা পরিবার স্ত্রী-মাতার ভূমিকাকেই নারীশোষণের অন্যতম বিষয় বলে যে ভাবনা, সে সব নানা অবস্থান এ সময়ের নারী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনাকে হাজির করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা নানা বাক্যবন্ধ দিয়ে হাজির হলো— ফেমিনিস্ট স্ট্যান্ডপয়েন্ট থিওরি, স্ট্যান্ডপয়েন্ট এপিস্টেমোলজি, কালচারাল ফেমিনিজ্‌ম, সোশ্যাল ফেমিনিজ্‌ম, গাইনিসেন্ট্রিক ফেমিনিজ্‌ম, উইমেন সেন্টারড থিওরি ও ডিফারেন্স থিওরি। সামাজিক ভিন্নতা ভিত্তিক নারীবাদের বিকাশ ঘটলো নানান দার্শনিক অবস্থানের সহায়তায়। যেমন দ্বন্দ্বমূলক ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (ওব্রায়েন ১৯৮১, হার্টস্ক ১৯৮৩, ম্যাকিনন ১৯৮৩)। বস্তুকেন্দ্রিক মনোবিকলনবাদী তত্ত্ব (চোডোরো ১৯৭৮, ফ্ল্যাক্স ১৯৮০, হার্টসক ১৯৮৩)। নৈতিকতার মনস্তত্ত্ব (গ্যালিগান ১৯৮২), সমাজমনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব (মিলার ১৯৭৬, স্মিথ ১৯৮৭), ও আরো নানা মতবাদ। সামগ্রিকভাবে এই তাত্ত্বিকদের লক্ষ্য ছিল নারীর জীবনের বাস্তবতায় নারীবাদের শিকড়ের মূল জায়গাটিকে চিহ্নিত (thematize) করা ও নারীর অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা জ্ঞানের পদ্ধতিতে বোঝা।

সামাজিক ভিন্নতার নারীবাদের জ্ঞানতত্ত্বকে সব থেকে প্রণালীবদ্ধভাবে হাজির করেছেন হার্টসক (১৯৮৩,১৯৮৭), যার নামের সাথে 'ফেমিনিস্ট স্ট্যান্ডপয়েন্ট' শব্দবন্ধটি সব থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই নারীবাদী অবস্থানের তত্ত্বনির্মাণে হার্টসক একদিকে মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির সাহায্য নিলেন কিন্তু শ্রেণী বিশ্লেষণের বদলে লিঙ্গ সম্পর্কের বিশ্লেষণ তার প্রধান বিচার্য বিষয় হল। অন্যদিকে চোডরো (১৯৭৮) ও ফ্ল্যাক্স (১৯৮০) বস্তুকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিলেন। এর সাথে সাথেই হার্টসক দেখান কীভাবে এই পুংলিঙ্গ শাসিত এবং বাধ্যতামূলক বিসমকামী সমাজ কাঠামোতে পুরুষ ও নারীর যাপন— বাস্তবতার কাঠামোগত পার্থক্য বিরাজ করছে। এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই তিনি 'সামাজিক সম্পর্কের বোধগম্যতা' ও 'পুংলিঙ্গের সামাজিক সুবিধা'— নারী জীবনের এই দুই মূল বৈশিষ্ট্যে পৌঁছোন যার মধ্যে দিয়ে তিনি এই পুংলিঙ্গ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান এবং মতাদর্শ যা পুঁজিবাদী সমাজ সৃষ্ট, তার এক ব্যাপক সমালোচনা হাজির করেন। তাঁর মতে, নারীবাদের অন্যতম প্রধান কাজ হল নারী অভিজ্ঞতার পুনর্মূল্যায়ন করা। অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে থেকে মিলের জায়গাগুলি চিহ্নিত করা। এবং এর মধ্যে দিয়ে এমন এক অবস্থানকে হাজির করা, যার মধ্যে দিয়ে যথার্থ অর্থে একটি 'মানবিক গোষ্ঠীর কল্পনা' করা যাবে যার অন্যতম ভিত্তি হবে নারী অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জ্ঞানের বিশ্লেষণ।

সামাজিক ভিন্নতার নারীবাদের অভ্যন্তরে মতের নানা মাত্রা থাকলেও তিনটি তাত্ত্বিক অবস্থানকে এই ধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, এই ধারা সামাজিক সম্পর্কের স্তরে নারীর যথাযথ বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক বাস্তবতাকে খোঁজার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত এই তত্ত্ব মনে করে লিঙ্গ পরিচয়ের মূল গ্রোথিত আছে যৌন পরিচয়ের ভিন্নতায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানবসমাজ পুরুষ এবং স্ত্রী লিঙ্গ পরিচয়ে বিভক্ত। এই তত্ত্ব এই দ্বিকোটিক নির্মাণের যৌক্তিকতা বা বাস্তবতাকে প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করে বিশ্লেষণ করে ক্ষমতা সম্পর্কের বিন্যাসের সঙ্গে এই লিঙ্গ পরিচয়ের সম্পর্কটিকে। তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব শুধু নারী-পুরুষের পার্থক্যের বিষয়টিকেই চিহ্নিত করে না, বরং জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে নারীর জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াকে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে।

ভিন্নতার নারীবাদ ২ : যৌন পার্থক্য ও মনোপ্রতীকী গঠন

বিশ শতকের আটের দশকে গঠনবাদ (লেভি স্ট্রস), মনোবিকলন তত্ত্ব (লাকঁ), আকরণোত্তরবাদ (ফুকো, ডিল্যুজ) এবং বিনির্মাণবাদ (লিওতার, দেরিদা) ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় নারীবাদীদের ভাবনাকে প্রভাবিত করল। সামগ্রিকভাবে এর ফল হিসেবে নারীবাদে এক অন্যরকম অবস্থান তৈরি হয়, যার নাম ফরাসি নারীবাদ (French Feminism)। প্রাথমিকভাবে যাদের দার্শনিক এবং সাহিত্যিক লেখার মধ্যে দিয়ে এই অবস্থান সামনে এলো তারা হলেন Cixous, Irigaray, Le Docuff ও Kristeva— এছাড়াও উত্তর মার্কসীয় প্রভাবে এই ধারায় আরো কিছু তাত্ত্বিককে পাওয়া গেল। বিশ শতকের শেষ দুই দশকে পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানান শাখার মানুষ এই তত্ত্ব নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছেন বা চর্চা করেছেন। ফরাসি নারীবাদের সাথে বিনির্মাণবাদী নারীবাদের অনেক মিল আছে; যদিও যৌনতা সম্পর্কিত ভিন্নতার ভাবার জায়গা থেকে একে ভিন্নতার নারীবাদের অধীনে দেখা হয়।

ফরাসি নারীবাদীদের মধ্যে ক্রিস্তেভা ও ইরিগারে-র লেখায় যৌনতার ভিন্নতাকে সমাজবিশ্লেষণের প্রাথমিক অঙ্গ/বর্গ হিসেবে দেখা হয়েছে। এর সাথে লাকঁ-এর মনোবিকলনবাদী ভাবনার 'প্রতীকী শৃঙ্খলা'কে আত্মস্থ করে এই ধারা যৌনতার ভিন্নতার শিকড় হিসেবে প্রাক্-ভাষী, প্রাক্-ইডিপাল শিশুশরীর যা মায়ের সাথে সংযুক্ত সেই ইমাজিনারি স্তরকে চিহ্নিত করে। যার সাথে ক্রিস্তেভা তার Jouissance-র ধারণাকেও নিয়ে আসেন। ত্রিস্তেভা মানবমনে প্রতীকী শৃঙ্খলা ও চিহ্নের স্তরকে ভাষার ক্ষেত্রে ভিন্ন যৌনতার পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেন। ত্রিস্তেভার মতে, 'নারীত্ব' আসলে নারীর ভিতরে প্রোথিত হয়ে থাকা এক বিদ্রোহীসত্তা, যা বাস্তবে দেখা না গেলেও ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক সত্তা হিসেবে টিকে থাকা নারীর মধ্যে রয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে ক্রিস্তেভার ভাবনায় 'নারী বিষয়ী'কে চিহ্নিত করা যায় মানসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যবর্তী পর্যায়ে (interface between the Psychic and the Political), যা আসলে পুরুষ আধিপত্যকেন্দ্রিক ভাষাব্যবস্থার মধ্যে কাব্যিক অন্তর্ঘাত (subversion) ঘটিয়ে চলেছে।

বিষয়ীর বহুবিভক্তি : বহুস্বরিক নারীবাদ

সামাজিক ভিন্নতার নারীবাদ 'নারী'র ধারণাকে যেভাবে এক সমতত্ত্ব, সর্বজনীন, চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে আত্তীকরণ করে সে জায়গা থেকেই এই ভাবনাকে এসেনসিয়ালিজম-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। স্পেলম্যান (১৯৮৯) নারীবাদের সমকালীন ধ্রুপদী সাহিত্যগুলি আলোচনা করে দেখান যে প্রথমত বোভোয়া-র সময় থেকে নারীবাদীরা জাতিসত্তা, শ্রেণী, বর্গ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কম গুরুত্ব দিয়েছে, দ্বিতীয়ত এই নারীবাদ বিসমকামী যৌনভাবনা, সাদা, মধ্যবিত্ত এবং বিসমকামী নারী অভিজ্ঞতাকেই সমস্ত নারীর অভিজ্ঞতা বলে মনে করেছে/ধরে নিয়েছে। Spellman-র মতে শ্রেণী, বর্ণ, বর্গ-র মত সমাজ নির্মিত সত্তা পরিচিতিগুলি লিঙ্গ সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, নারীসত্তাকে কীভাবে জটিল করেছে, তা নারীবাদী তত্ত্বের মূল ধারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বহুস্বরিক নারীবাদীদের মতে, ভিন্নতার নারীবাদ নারীদের মধ্যে পৃথক জায়গাগুলিকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নতাকে না

ধরতে পারার ফলে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মসচেতন নারী-বিষয়ীকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে প্রাত্যহিক বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে বা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতার নারীবাদের আবেদন নারী সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের অভিজ্ঞতাকেই সারসংকলন করতে পেরেছে, এবং এর মধ্যে দিয়ে শুধু সুবিধাভোগী সাদা নারীর চেতনাই স্বীকৃতি পায়নি, লিঙ্গবৈষম্য ছাড়া যে অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য আছে তাও এদের বোধ্যতার বাইরে থেকে গেছে।

অ্যাংলো আমেরিকান নারীবাদীদের বিরোধিতা করে এ ধারার নারীবাদীরা মনে করেন বিষয়ী হিসেবে নারীকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। রিচ-এর মতে তা 'Politics of Location'। ক্রুক্স বলেন, 'a politics of identity affirmation'। এই ধারার নারীবাদীরা চলমান নারী আন্দোলনে শ্রেণী প্রশ্নটাকে ক্রমাগত সামনে নিয়ে আসেন ও মূলস্রোতের নারীবাদী তত্ত্বের মধ্যে যে সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে, এই বক্তব্য তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে নানান পরিচয়ের নারীস্বরের/নারী অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির জন্য ক্রমাগত লড়াই চালাতে থাকেন (লর্ড ১৯৮৪, ট্রিন ১৯৮৯, আনজালদুয়া)। যেমন কলিনা-র (১৯৯১) 'আফ্রোকেন্দ্রিক নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব' বা 'কালো মেয়েদের অবস্থান' জনিত তত্ত্ব আসলে মূলধারার নারীবাদী তত্ত্বের মধ্যে সাদাদের প্রতি পক্ষপাতের সংগঠিত বিরোধিতা। 'ক্ষমতায়নের রাজনীতি'র নামে এরা প্রান্তিকায়িত এবং কালো মেয়েদের স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলেন (হাল, স্মিথ, হুক্স)। এছাড়াও মূলধারার ভিন্নতার নারীবাদে লিঙ্গ ও যৌনভাবনা কীভাবে আধিপত্যকারী বাধ্যতামূলক বা 'স্বাভাবিক' বিসমকামী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত তা রিচ এবং বাটলার-এর লেখায় দেখা গেল। পশ্চিমী নারীবাদের এই সাদাকেন্দ্রিক ভাবনা, লিঙ্গবিষয়ক ভাবনা, যৌনপৃথকতার ভাবনা ও বিষয়ীভাবনা উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকদের দ্বারা (Spivak) সমালোচনার মুখে পড়ল। ঔপনিবেশিক নানা অনুশীলনকে তারা বিশ্লেষণ করলেন (আলেকজান্ডার মোহান্তি) এবং দেখালেন কীভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক বর্গ থেকে উঠে আসা নির্দিষ্ট অঞ্চলের এবং সময়পর্বের নারীগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকেই সাধারণ অর্থে নারী-অভিজ্ঞতা বলে হাজির করা হয়েছিল এবং এদেরকেই নারীসত্তার প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এছাড়াও হারাওয়ে (১৯৯০) ফেমিনিস্ট স্ট্যান্ডপয়েন্ট তত্ত্বকে সমালোচিত করলেন— unintended eraser of polyvocal, unassimilable, radical difference বলে।

বহুস্বরিক নারীবাদীদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্বরের অস্তিত্ব থাকায় (যা এদের মতে এই ধারার শক্তি), এই ধারার নির্দিষ্ট দার্শনিক এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা, যা তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ মতবাদ হিসেবে হাজির করে, একটি কঠিন কাজ। যেমন এই ধারার কলিন-এর (১৯৯১) স্ট্যান্ডপয়েন্ট সংক্রান্ত ভাবনা, হার্টসক-এর এই সম্পর্কিত ভাবনার অনেক ঘনিষ্ঠ, অথচ হারাওয়ে-র সামাজিক সত্তার নির্মাণ সম্পর্কিত যে ভাবনা, যা ভঙ্গুর, বৈপরীত্যে ভরপুর, তা বিনির্মাণবাদী নারীবাদীদের ঘনিষ্ঠ। আনজালডিউ-র (১৯৮৭) সাংস্কৃতিক/গোষ্ঠীসত্তার রাজনীতি সংক্রান্ত ভাবনা মোহান্তি-র (১৯৯১) ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সমালোচনার তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন।

তা সত্ত্বেও বহুস্বরিক নারীবাদের চারটি মূল প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়—

১) এই ধারা নারীবাদী তত্ত্বে/প্রকল্পে/আলোচনায় ভিন্নতা, বহুস্বর/বহুত্ব, অ-সমসত্ত্বতা এবং 'নারী'র তত্ত্বায়নে বহুমতের আমদানি করে এবং 'নারী' বলতে কোনো ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী বা একমাত্রিক লৈঙ্গিক বর্গের ধারণাকে বিরোধ করে।

২) এই ধারা নির্দিষ্ট দেশ-কাল এর সাপেক্ষে নারী বিষয়ীকে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী এবং অন্যান্য সমাজ সাংস্কৃতিক সত্তা যেমন ধর্ম, বর্ণ, যৌনতা, শ্রেণী ইত্যাদি পরিচিতিগুলিকেও এই বিষয়ী নির্মাণে গুরুত্ব দিতে চায়।

৩) ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক প্রকল্প হিসেবে এই ধারা সুবিধাভোগী সাদা পুরুষ, বিসমকামী, পশ্চিমী, ইউরোপ-কেন্দ্রিক বিষয়ীর দ্বারা শোষিত, প্রান্তিকায়িত, অপসারিত, বহিষ্কৃত অপর সত্তাদের হয়ে কথা বলতে চায়।

৪) এই ধারায় পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী সেইসব অপসারিত, বিলুপ্তপ্রায়, নিমজ্জিত, অস্বীকৃতদের উচ্চারণকে তুলে নিয়ে আসা ও মূলধারার নারী বিষয়ী ভাবনায় এদের স্থান তৈরি করার কাজটি কেন্দ্রীয় প্রতিরোধমূলক একটি অবশ্যকর্ম হিসেবে ভাবা হয়।

পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে মার্কসীয় নারীবাদীদের মধ্যে যে অবস্থানগত বিতর্ক তার কিছুটা আলোচনা করা যাক।

মার্কসীয় নারীবাদ

সাধারণভাবে মার্কসীয় তত্ত্ব নারীর যৌনজীবনের সমস্যার তুলনায় শ্রম-সম্পর্কিত সমস্যার বিষয়েই মূলত আলোকপাত করতে চায়। তার ফলে মার্কসীয় নারীবাদীদের কাছে আলোচ্য হয়ে ওঠে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবার ব্যবস্থার ভূমিকা বা পারিবারিক শ্রমকে কীভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদনশীল শ্রমের তুলনায় নিচু চোখে দেখা হয় সেটি এবং নারীকে কীভাবে সাধারণভাবে সবচেয়ে একঘেয়ে ও কম মজুরির কাজ দেওয়া হয় এই বিষয়গুলি।

শিল্প পুঁজিবাদী সময়পর্বের আগে মূলত পরিবারই ছিল উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল। বাবা-মা। তাদের সন্তানেরা, আত্মীয়েরা সকলেই নানানভাবে এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিত যা তাদের বেঁচে থাকার যোগান দিত, এবং পরিবারে মেয়েরা যে অতিরিক্ত কাজগুলি করত অর্থাৎ রান্না, ঘরোয়া কৃষিকাজ, খাদ্যসংরক্ষণ, সন্তানের জন্ম দেওয়া, সন্তান পরিচর্যা করা—

এগুলি পরিবারে পুরুষের কাজের মতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করা হত। কিন্তু শিল্পায়নের মধ্যে দিয়ে উৎপাদন কুটিরশিল্প বা ব্যক্তিগত পরিসর থেকে সরে গেল গণপরিসরে। কারখানাগুলি হয়ে উঠল বস্তু (পণ্য) উৎপাদনের প্রধানকেন্দ্র। প্রাথমিক ভাবে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা এই প্রক্রিয়ায় কম যুক্ত হল ফলে মজুরি প্রাপ্ত 'উৎপাদনশীল' পুরুষদের বিপরীতে মেয়েদের অনুৎপাদনশীল হিসেবে দেখা হতে লাগলো।

নারীর একটি কাজ— সন্তান উৎপাদন করাকে পুরুষের কাজ পণ্য উৎপাদন করার তুলনায় যে অনুৎপাদনশীল মনে করা হল একে মার্কসীয় নারীবাদীরা এঙ্গেলস-র তত্ত্বের সাহায্যেই খারিজ করার চেষ্টা করলেন।

> বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী চূড়ান্ত অর্থে ইতিহাসের চালিকাশক্তি হল চলমান জীবনের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন। এটির আবার দুরকম বৈশিষ্ট্য আছে। একদিকে বেঁচে থাকার উপকরণগুলি, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের এবং এগুলি উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদন। *অন্যদিকে মানুষ হিসেবে নিজেদের উৎপাদন, মানব প্রজাতির সৃষ্টি। ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়পর্বে যে সমাজ-সংগঠনের অধীনে মানুষ বাস করে তা এই দুরকমের উৎপাদন দ্বারাই নির্ধারিত হয়।* (*পরিবার ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*)।

এঙ্গেলস-এর দেখা এই বিশেষ জায়গাটিকে প্রায় সর্বত্রই এক ধরনের এড়িয়ে যাওয়ার ঝোঁক দেখা যায়। ফলে এমন কি ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও সন্তান উৎপাদনকে 'অনুৎপাদনশীল' কাজ বলে মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। যে কারণে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' যেখানে গৃহশ্রম এবং সন্তানপালনের একটা মাত্রায় সামাজিকীকরণও করা হয়েছে সেখানেও এই খাতে বাজেটের টাকা ব্যয় আদৌ প্রয়োজন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক দেখা গেছে।

মার্কসীয় নারীবাদীদের একাংশের মতে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যেমন সন্তান উৎপাদন ও পালনকে কাজ বলে গুরুত্ব দেয়নি, পুঁজিবাদও গৃহশ্রমকে বিনা মজুরিতেই করিয়ে নিতে চায়। মার্কস-এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণ ছিল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী শিশু সহ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী গণপরিসরে শ্রমবাজারে পারিবারিক মজুরি রোজগারের জন্য নিজেদের শ্রমবিক্রির চেষ্টা চালাবে। ঘরে আলাদা করে শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য কেউ না থাকায়, সময় না পাওয়ায় প্রত্যেকে নিজের বাঁচার রসদ জোগাড়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে মজুরি শ্রমিক হিসেবে শোষিত হবে। আর এই শোষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের সমাজ বিপ্লবের দিকে এগিয়ে দেবে।

পুঁজিবাদে নারীশ্রমের যে অমর্যাদা, সেই বিষয়টি মার্কসীয় নারীবাদীদের একটি আপত্তির জায়গা। নারীকে মূলত ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা বা উপভোক্তা হিসেবে দেখার একটা প্রবণতা পুঁজিবাদে দেখা যায়। কিন্তু মার্গারেট বেনস্টন-এর মতো মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে, নারী প্রথমত উৎপাদক, এবং উৎপাদক হিসেবে একটি শ্রেণী গঠনও করে। এমন একটা শ্রেণী যার সদস্যরা গৃহ এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত একধরনের উৎপাদক, যে উৎপাদনের শুধু ব্যবহারিক মূল্য (use value) আছে। যেমন যে খাবারটা বাড়িতে রান্না হচ্ছে তা বাজারে গিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে বিক্রি হওয়ার বদলে পরিবারের লোকেরাই খেয়ে নিচ্ছে। Benston-র মতে, নারী তার শ্রমজাত দ্রব্য বিক্রি করছে না (বিনিময় মূল্য যুক্ত হচ্ছে না) বলেই তার 'কাজ' বা 'শ্রম' কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর মতে, যতক্ষণ না নারী তার সন্তানপালন সহ অন্যান্য গৃহকর্তব্য থেকে মুক্ত হয়ে শ্রমবাজারে নিজেকে যুক্ত করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার মুক্তির প্রাথমিক শর্তই পূরণ করছে না। তাঁর মতে—

> প্রায় সবসময়ই ঘরের কাজ মূলত নারীরাই দায়িত্বে থেকেছে। এমন কী যখন তাঁরা বাড়ির বাইরে কর্মক্ষেত্রেও যুক্ত হয়, তাঁদেরকে যে করেই হোক সাধারণত বাইরের কর্মক্ষেত্র এবং ঘরের কাজ দুটিই সামলাতে হয় (অথবা কারুর সাহায্যে ঘরের কাজ করিয়ে তার দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়)। মহিলারা, বিশেষ করে যাদের স্বামী-সন্তান আছে, আবার বাড়ির বাইরে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত, তারা আসলে দুটো কাজই করে। শ্রমবাজারে তাঁদের অংশগ্রহণ তখনই সম্ভব হয় যখন তাঁরা তাঁদের প্রথম দায়িত্ব অর্থাৎ ঘরের/সংসারের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে পারে। এমন কী রাশিয়া বা পূর্ব-ইউরোপের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি ছিল, সেখানে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ বৃদ্ধি নারীমুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সমানভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। ঘরের বাইরে চাকরিক্ষেত্রে সমানাধিকার নারীমুক্তির শুধুমাত্র প্রাক্‌শর্ত (Precondition), বা প্রয়োজনীয় শর্তই। নারীমুক্তির যথেষ্ট শর্ত নয় (not sufficient)। যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহশ্রম ব্যক্তিগত উৎপাদনের স্তরে থাকবে এবং মূলত নারীর দায়িত্বে থাকবে, ততক্ষণ নারী দ্বিগুণ কাজের ভার নিয়ে চলতে বাধ্য থাকবে। (*মান্থলি রিভিউ*, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, 'দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অফ উইমেন্স লিবারেশন')

বেনস্টন-এর মতে, যতক্ষণ না রান্না করা, সন্তান পালন করা জাতীয় কাজগুলির সামাজিকীকরণ ঘটছে ততক্ষণ নারীকে শিল্পশ্রমিক তৈরি করার দরজা খুলে দেবার অর্থ শোষণকে আরো বাড়িয়ে তোলা।

তাঁর মতে গৃহশ্রমের সামাজিকীকরণ হয়ত নারীকে একই রকম কাজ করতেও বাধ্য করবে, যেমন আগে যে একজনের জন্য রান্না করত, সামাজিকীকরণের ফলে যৌথ রান্নাঘরে সে হয়তো অনেকের জন্য রান্না করছে, তবুও ঘর থেকে বেরিয়ে এই আসাটাও তার মধ্যে প্রগতির দিকে এক ধরনের পরিবর্তন

আনবে। গৃহশ্রমের সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে নারীমুক্তি হবে না, কিন্তু এই কাজগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি তৈরি হবে। সমাজে যদি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পায় তবে সমাজ আর নারীকে পরজীবী, নিচু কাজের অধিকারী বলে মনে করবে না। তাঁর মতে, গৃহশ্রমের সামাজিকীকরণের ফলে গোষ্ঠী হিসেবে নারীর শোষণ কমবে এবং প্রত্যেক নারী ব্যক্তিগতভাবে যথাযোগ্য সম্মানের অধিকারী হয়ে উঠবে।

বেনস্টন যদিও এঙ্গেলস-এর মতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নারীকে ব্যাপকভাবে শিল্পশ্রমিকে পরিণত করার বদলে জোর দিয়েছিলেন গৃহশ্রমের সামাজিকীকরণের, তবুও তাকে পুরনোপন্থী মার্কসবাদী হিসেবেই দেখা হয়। 'উইমেন অ্যান্ড দ্য সাবভার্সন অফ কম্যুনিটি'-তে মারিয়া রোসা ডেলা কোস্টা ও সেলমা জেম্‌স দাবি করেন যে নারীর গৃহশ্রম শুধু চলতি অর্থেই ব্যবহারযোগ্য নয়, মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ীও এই গৃহশ্রম 'উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি করে'। কোনো নারীকেই নতুন করে শ্রমের বাজারে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। সমগ্র নারীজাতিই আসলে শ্রমবাজারের অংশ হিসেবেই কাজ করে। যে শ্রমশক্তিকে শোষণ করে পুঁজিবাদীরা উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করে সেই শ্রমশক্তির যোগানে নারীর শ্রমশক্তি আবশ্যক। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে শ্রমিকশ্রেণী যুক্ত সেই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শ্রমিকশ্রেণীকে শুধুমাত্র খাদ্য, বস্ত্র দিয়েই নয়, মানসিক এবং গার্হস্থ্য আরাম দেওয়ার মধ্যে দিয়েও নারী আসলে পুঁজির কলের চাকাই ঘুরতে সাহায্য করে।

নারীর গৃহশ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করার মধ্যে দিয়ে এই দুজন নারীবাদী এঙ্গেলস এবং বেনস্টন দুজনের ভাবনা থেকেই কিছুটা দূরে সরে আসেন। এদের মতে যে নারীরা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত তাদের দিন শুরু হয় কারখানায় স্বীকৃত মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিক হিসেবে, আর দিন শেষ হয় ঘরে অস্বীকৃত, বিনা মজুরিতে খাটা শ্রমের মধ্যে দিয়ে। ফলে তাঁদের মতে নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য দূর করতে প্রথম প্রয়োজন গৃহশ্রমের জন্যেও মজুরির দাবি তোলা। তাঁদের মতে ব্যক্তিপুরুষ (স্বামী, পিতা, প্রেমিক) নয়, রাষ্ট্র ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকেই এই গৃহশ্রমের জন্য মজুরির দাবি তোলা উচিত। কারণ চূড়ান্ত অর্থে নারীর শ্রমের বিনিময়েই পুঁজি মুনাফা তৈরি করে।

তাঁদের মতে, যে সমস্ত নারী বাড়িতে সংসার সামলায়, সন্তান প্রতিপালন করেন তাঁদের প্রত্যেককেই মজুরি দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র যদি মজুরি দিতে অস্বীকার করে তবে এদের হরতাল করা উচিত।

তবে এরা ছাড়া অন্যান্য মার্কসীয় নারীবাদীরা গৃহশ্রমের জন্য মজুরির বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে এই দাবি বাস্তবসম্মতও নয়, বা নারীমুক্তির জন্য কাম্য নয়। যেমন বারবারা বারম্যান তাঁর 'দ্য ইকনমিক এমারজেন্স অফ উইমেন'-এ বলেছেন, গৃহশ্রমের বিনিময়ে মজুরির দাবি প্রথমত নারীকে আরো বেশি গৃহবন্দী করে ফেলবে, যেখানে তার প্রতিদিন একঘেয়ে কাজ ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। দ্বিতীয়ত, গৃহশ্রমের বিনিময়ে মজুরির দাবির মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদের যে চাহিদা, অর্থাৎ সমস্ত কিছুর পণ্যায়ন, সেই কাজ আরো ত্বরান্বিত হবে, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী সহ সন্তান-মায়ের সম্পর্কেরও পণ্যায়ন ঘটবে। তৃতীয়ত, গৃহশ্রমের জন্য মজুরি দেওয়া হলে বাইরের কাজে তাকে আর উৎসাহ দেওয়া হবে না। এবং এর মধ্যে দিয়ে শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজন আরো চূড়ান্ত রূপ নেবে। যেখানে পুরুষ 'নারীর জন্য নির্ধারিত কাজ' করার জন্য কোন রকম দায়বোধ করবে না, নারীও 'পুরুষের জন্য নির্ধারিত' কাজে যোগদান করতে পারবে না।

যেহেতু শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজন রোধ করা মার্কসীয় নারীবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য, গৃহশ্রমের বিনিময়ে মজুরির দাবি আসলে মার্কসবাদবিরোধী বলে এরা মনে করেন, তাদের মতে বরং বেনস্টন প্রস্তাবিত গৃহশ্রমের সামাজিকীকরণ এর থেকে বেশি কাম্য।

গৃহশ্রমের বিনিময়ে মজুরির দাবির বিরুদ্ধে আরেকটা যুক্তি হলো সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর যোগদানের পক্ষে মার্কসবাদীদের যে মত, এটি তার বিপরীত।

ন্যান্সি হমস্টর্ম-এর মতে, বেনস্টন, ডেলা কোস্টা, জেম্‌স-এর লেখায় একাধিক সমস্যা আছে। প্রথমত মার্কসীয় ভাবনায় শ্রেণীর যে ধারণা, সেই ভাবনা অনুযায়ী সব নারীকে কোনো একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তারা সব শ্রেণীরই অংশ। যদিও নারী হিসেবে প্রত্যেকেই এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা শোষিত, তবুও সবাই সমান শোষিত নয়। হমস্টর্ম-এর মতে, শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত নারীর শোষিত হওয়া আর মধ্য-উচ্চবিত্ত নারীর শোষিত হওয়ার মধ্যে প্রচুর ফারাক আছে। তাঁর মতে,

> শ্রমজীবী নারীরা মজুরি শ্রমিক হিসেবে বিশেষ ভাবে শোষিত হয় আর ঘরের কাজে আরেকভাবে শোষিত হয়। তারা যৌনগতভাবেও মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত নারীর তুলনায় বেশি শোষিত হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তাদের তুলনামূলক স্বাধীনতা কম। শুধু তাই নয়, জন্ম-নিরোধক ব্যবহার, অ্যাবরশন, সন্তানধারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের স্বাধীনতা কম। নির্বীজকরণের ক্ষেত্রেও তাদের ওপর অনেক বেশি জোর করা হয়। কর্মক্ষেত্রে এবং রাস্তায় তুলনামূলকভাবে বেশি যৌন হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়। ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীর তুলনায় ধারাবাহিকভাবেই শ্রমজীবী নারীর অবস্থান অনেক বেশি পুঁজিবাদ ও লিঙ্গ কেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিরোধী।

আরো একটি জায়গা থেকে নারীদের একটি শ্রেণী হিসেবে ভাবার মধ্যে গলদ আছে। গৃহশ্রমের মধ্যে দিয়ে নারী পুঁজির স্বার্থসিদ্ধি করছে বলে তারা মনে করেন, কিন্তু পুঁজি নারীকে শ্রমবাজারের

শ্রমশক্তির অংশ হিসেবেও দেখতে চায়। বাস্তব জীবনধারণের প্রয়োজনেই শ্রমবাজারের আওতায় বাইরে থেকে শুধুই গৃহকর্ম করা নারীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। একদিকে যেমন অতীতের তুলনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উন্নতির কারণে যে নারী সন্তান চায় সে কখন তার সন্তানের জন্ম দেবে সে বিষয়ে আগের থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, তেমনি ঘরের কাজের জন্য নানান যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে গৃহকর্মের জন্যও তুলনামূলকভাবে কম সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। একদিকে এই দুটি কারণ, অন্যদিকে ৬০-এর দশকের নারীমুক্তি আন্দোলনের ফলে পরিবারে দুজনের আয়ের প্রবণতাই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রাথমিকভাবে ইউরোপ-আমেরিকা, ও পরে অন্যত্রও, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যাগতভাবে নারীর শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। *মান্থলি রিভিউ* ১৯৮৩ সালের একটি লেখাতেই দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশ।

এই তথ্যের মধ্যে দিয়ে এটাই বোঝা যায় যে পুঁজি নারীকেও শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, যদিও এ তথ্যে এই সত্য জানা যায় না যে পুঁজি যে নারীকে শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে চায় তার একটা কারণ পুরুষের তুলনায় নারীকে কম মজুরিতে কাজ করানো যায়। এ তথ্য এটাও জানায় না যে পুঁজিবাদ নারীকে পরিবার পরিচালনায় খুব বেশি অতিরিক্ত সুবিধা দিতে চায় না। ফলে শ্রমজীবী নারীকে বাইরের সাথে ঘরের সব কাজও প্রায় নিজেকেই করতে হয়।

বিষয়ীর ভঙ্গুরতা : বিনির্মাণপন্থী নারীবাদ

নারী নামক বর্গের (ক্যাটাগরির) অধীনে বিষয়ীর তত্ত্বনির্মাণে যে জটিলতা তা সম্ভবত সব থেকে বিখ্যাত এবং বিতর্কিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে বাটলার-এর (১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৩) প্রথম পর্বের লেখাগুলিতে, বিশেষত 'জেন্ডার ট্রাবল : ফেমিনিজ্‌ম অ্যান্ড সাবভার্সন অফ আইডেন্টিটি'-তে)। তাঁর মতে, বহুস্বরিক নারীবাদ চেষ্টা করেছে, পূর্বস্থিত কোন বিষয়ীর অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতার যে ভাবনা তার পেছনে আছে নারীবাদের সঙ্গে আধুনিকোত্তরবাদের (লভিবন্ড ১৯৮৯, বরদো ১৯৯০, নিকলসন ১৯৯০) ও অকরণোত্তরবাদের (অ্যানকফ ১৯৮৮, ফ্রেজার ১৯৯৫) সম্পর্ক এবং টানাপোড়েনের ইতিহাস। যদিও আধুনিকোত্তরবাদী ধারণার সঙ্গে নারীবাদী এই ধারার সম্পর্ক নিয়ে এই ধারার মধ্যেই অনেক বিতর্ক আছে। এই ধারার মূল তাত্ত্বিক জুডিথ বাটলার। বাটলারের তাত্ত্বিক ভাবনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ধারণাগতভাবে 'বিষয়ী', 'শরীর', 'যৌন পরিচয়', 'লিঙ্গ পরিচয়', 'যৌনতা' এবং 'বাস্তবতা'র ধারণাগুলি যে পরিপ্রেক্ষিতে অবদমনের যন্ত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল সেখান থেকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে এগুলিকে স্থানচ্যুত করা। স্বাভাবিকভাবেই এই ভাবনার পিছনে দর্শনগতভাবে আছে অনিশ্চিতির জ্ঞানতত্ত্ব অথবা কোনো সত্তা বা বস্তুর স্থির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ভাবনার বিরোধিতা, যে ভাবনা নারীবাদী তত্ত্বের অন্য দুই ধারায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল। বাটলার শুরু করেন ফুকো'র লেখার কিছু মূল উপাদান দিয়ে, এবং এই উপাদানগুলিকে বিস্তৃত করে দেখান কীভাবে, যৌন-লৈঙ্গিক বিষয়ীর ধারণা নারীবাদের মধ্যেই নির্মিত এবং অবদমিত হচ্ছে 'বিসমকামিতার সূত্রে', যা শেষ পর্যন্ত এমন কিছু শৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, এমন কিছু অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করছে, যা নারীবাদের মূল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। বাটলার নিজের এই তাত্ত্বিক প্রকল্পকে বলছেন 'নারী' বর্গের অধীনে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ফ্রয়েড, বোভোয়া, ফুকো, লাঁক, ক্রিস্তেভ, ইরিগেরের বিভিন্ন লেখার এক জটিল ব্যাখ্যা দেন। এগুলি থেকে আমরা বাটলারের বিনির্মাণপন্থী নারীবাদ এর তিনটি মূল জায়গাকে চিহ্নিত করতে পারি।

প্রথমত, এই রকম কোন 'স্বাভাবিক' অথবা পূর্বস্থিত বা প্রাক্‌নির্মিত যৌন পরিচয় বা লিঙ্গ পরিচয় থাকে না যার ওপর ভিত্তি করে কোনো গোষ্ঠীসত্তা নির্মিত হতে পারে। বাস্তবতা লিঙ্গ পরিচয়ের মতো যৌন পরিচয়ও সাংস্কৃতিক ভাবে নির্মিত, যৌন পরিচয়ও আসলে একটি লৈঙ্গিক বর্গ।

দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ পরিচয়ের ভাবনা ক্ষমতা সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত, ও 'বাধ্যতামূলক ও স্বাভাবিক বিসমকামিতার প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা দ্বারা পরিচালিত। যা এই থাক্‌বন্দী (hierarchial) শোষণমূলক পুরুষত্ব-নারীত্ব দ্বিত্ব ভাবনার অধীনে নির্মিত।

তৃতীয়ত, যে রাজনৈতিক নিয়মনীতি এবং অনুশাসিত অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে লিঙ্গভাবনা নির্মিত হয় তাকে 'চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়' (displaced from view) অনুপস্থিতির চিহ্নায়নের (Play of Signifying Absence) মধ্যে দিয়ে। বাটলারের মতে, লিঙ্গপরিচয় হল এক ধরনের উপস্থাপন (performative), এক সচেতন ক্রিয়া বা কৌশল, যা এক ধরনের নাটকীয় বা শর্তসাপেক্ষ অর্থ নির্মাণ করে (dramatic and contingent construction of meaning)। এই উপস্থাপন এক ধরনের চর্চা, যার মধ্যে দিয়ে সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নকে প্রযুক্ত করা হয় পুনরাবৃত্তি বা প্যারোডির অন্তর্ঘাতী বয়ানের সাহায্যে।

এই ধারা অনুযায়ী নারীবাদী তত্ত্বের কাজ হল বিনির্মাণ করা। যেমন বাটলারের ধারণা অনুযায়ী 'লৈঙ্গিকতার উপস্থাপনের' (Performing of Gender) চর্চা, যার মধ্য দিয়ে আমাদের শরীর, যৌন পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেগুলি প্রভাবিত হয়। এই চর্চার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি আমাদের সামনে আসে যে, সামাজিক তাৎপর্য এবং মূল্যবোধযুক্ত অনুশীলনের আগে কোনো লিঙ্গগত সত্তাপরিচিতিই থাকতে পারে না। বরং, যৌন পরিচয়, শরীর, বিষয়ী লিঙ্গ পরিচিতি— এগুলি সবই নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে বিশেষ ধরনের চর্চার মধ্য দিয়েই তৈরি হয়।

প্রবন্ধ

নারী প্রশ্ন: উত্তরণ কোন পথে?

গৌতম সেন

১। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে পরিবারের আদর্শ রূপ হল নিউক্লিয়ার পরিবার। সেটা এরকম— স্বামী বাইরে কাজ করে রোজগার করবে, এবং সেটা এমন হবে যাতে পরিবারের বাকি সদস্যদের ভরণপোষণ করা যায় (শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় 'পারিবারিক মজুরি')। আর নারী হবে গৃহবধু এবং সর্বক্ষণের জন্য গৃহকর্মে নিবেদিত থাকবে। যেখানে সেটা সম্ভব হয় না, সেখানে এমনকী চাকরিজীবী মহিলাদের সুবিশাল অধিকাংশকেই শিশুপালন সহ গৃহস্থালি কাজের প্রায় পুরো বোঝাটাই বইতে হয়; পাশাপাশি ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে শ্বশুরঘর করার রীতি অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে কাজ করে। এইসব কারণে বৃহত্তর সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করা থেকে তারা বঞ্চিত হন। (যদিও ধনী পরিবারের মহিলারা এই কাজের বোঝা থেকে মোটামুটি মুক্ত থাকেন; বরং বহু ক্ষেত্রেই তাদের অধীনে একগুচ্ছ পুরুষ বা/ও নারী ভৃত্য কাজ করে।)

২। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার হার তুলনামুলকভাবে বেশি। কী উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, কী 'মর্যাদাপূর্ণ' চাকুরির ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা অনেক কম। পাশাপাশি বধু-হত্যা, বধু-পীড়ন, পণপ্রথা এবং ধর্ষণ আজও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

৩। শিশু বয়স থেকে পরিবারের মধ্যে ও বাইরে থেকে মেয়েদের প্রস্তুত করা হয়ে যাতে তারা আদর্শ স্ত্রী, মা এবং গৃহকর্মে নিপুণ হিসাবে গড়ে ওঠে। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুরুষ-শিশুর তুলনায় বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনে তার প্রতি কম যত্ন নেওয়া হয়। এমনকী যখন তারা লেখাপড়া করে, তখনও পরিবারের মধ্যে তার প্রতি বৈষম্য করা হয়। তার উপর কী পাঠ্যপুস্তকে, কী সামাজিক সহবত শিক্ষায় তার উপর নারীসুলভ যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়, তা তাকে বহির্জগতে পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে দেয়।

৪। মহিলারা যখন কাজের খোঁজে চাকরির বাজারে আসে, তখন প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেছিয়ে-পড়া অবস্থানে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত কম মাইনের/মজুরির এবং শেষ সারির কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ-প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে, পুরুষের পারিবারিক মজুরি/বেতন দেওয়ার রীতি নারীর প্রতি বৈষম্য এবং নারীর ভুমিকার অবমূল্যায়ন টিকে থাকতে সাহায্য করে।

নারীর প্রতি এহেন চলতে-থাকা বৈষম্য এবং নারীর ওপর অবদমনের প্রতিটি প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, লড়াই করা প্রতিটি সংবেদনশীল মানুষের, প্রতিটি প্রগতিশীল মানুষের কর্তব্য। গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে চলে-আসা নারী আন্দোলন ও নারী সংগঠন এবং নারীমুক্তি আন্দোলনকে ধন্যবাদ, তারা আলোচ্য সমস্যাকে সজোরে সমাজের সামনে তুলে ধরেছে।

এই সমস্ত ঘটনা ও প্রক্রিয়ায় 'পিতৃতন্ত্র'/'পুরুষতন্ত্র'র দগদগে ঘা বিসদৃশভাবে প্রকট। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত সহজেই টানা হয়ে থাকে যে, চলতি সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক এবং পুরুষ-শাসিত। ওপর-ওপর এই মূল্যায়ন যত গ্রাহ্যতা ও জনপ্রিয়তা পাক না কেন, একটু গভীরে পর্যালোচনা করলে তা ধোপে টেকে না। কেননা—

১। বহু পুরুষ শিশু পালনের নানা দায়িত্ব সহ গৃহস্থালির নানা কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করছে। একটা আধুনিক নিউক্লিয়ার পরিবারে, বিশেষত যেখানে স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই চাকরি করে, এই ঘটনা বেশি বেশি করে চোখে পড়ে যে, একদিকে নানাভাবে গৃহস্থালি কাজকর্ম কমিয়ে আনা হচ্ছে, অপরদিকে কাজটা দু-জনে ভাগ করে নিচ্ছে।

২। যদিও এখনও সংখ্যায় কম, তবু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, উপাচার্য, বিচারক, ম্যানেজার, পুলিশ ও প্রশাসনিক উচ্চপদ, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মায় রাষ্ট্রপ্রধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি বেড়েই চলেছে। এই ঘটনা ও প্রক্রিয়াকে স্রেফ ব্যতিক্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, যদি না এবং যতক্ষণ না এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে যে, আলোচ্য সমাজে ও রাষ্ট্রে (বা অন্যান্য ক্ষেত্রে) এমন কোনো রক্ষাকবচ আছে, যাতে উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে একটা পর্যায়ের পর স্তব্ধ করা যায় কিংবা উলটো পথে চালু করা যায়।

৩। অধিকাংশ দেশেই নারী-পুরুষের সমান অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সমাজ অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রথিত নেই যাতে পুরুষ (পুরুষ বলেই) কোনো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী যাতে সে নারীকে (নারী বলেই) আধিপত্য বা শাসন করতে পারে।

৪। এ-কথা ঠিক, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নানা ক্ষেত্রে নারীর ওপর অবদমন মহিলাদের অবস্থাকে আরও অসুবিধাজনক করে তোলে— তবু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা

লেখাটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর নির্যাস হিসেবে প্রস্তাব আকারে লিখিত। এটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। অবশ্য পরবর্তীকালে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা লেখকের আছে।

যায়, নারীর এই দুঃসহ অবস্থা সমগ্র সমাজের কাছে (পুরুষের কাছেও) বোঝা ও সমস্যা।

৫। সমস্ত পুরুষ প্রকৃত (অথবা সম্ভাব্য) বধু-পীড়নকারী, বধু-হত্যাকারী, পণ-লিপ্সু, ধর্ষণকারী নয়; বরং অনেকেই এসব জঘন্য আচরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সে-সবের প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে। উপরোক্ত কাণ্ডসমূহের একটিও আজকের সমাজ এবং দেশের আইন কর্তৃক অনুমোদিত নয়, প্রতিটিই সমাজের চোখে ধিকৃত এবং আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সুতরাং, পিতৃতন্ত্র-র তত্ত্ব অথবা পুরুষ-শাসিত সমাজের মূল্যায়ন আমাদের লক্ষ্যকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করে। তবে, শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে, নয়া শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রামের সহযাত্রী হিসাবে আমাদের সকলের দায়িত্ব পিতৃতন্ত্র/পুরুষতন্ত্রের, নারীর ওপর চলতে-থাকা অবদমনের প্রতিটি প্রকাশ ও প্রয়াসের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখা।

পরিবারের ক্রমবিকাশ

১। আদিম সাম্যবাদ থেকে মানবপ্রজাতির নানা বিচিত্র রূপের পরিবার প্রথার বিকাশ আমরা দেখেছি। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রমবিকাশের একটা পর্যায়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারপ্রথা টিকে থাকার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু তা-ই নয়, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থা অধ্যয়ন করে কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন, শ্রমিকদের মধ্যে পরিবারেরই অবসান ঘটতে চলেছে। সেই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত হল না, বরং শ্রমিকদের মধ্যে যে নিউক্লিয়ার পরিবার গড়ে উঠল, তাতে পিতৃতন্ত্রের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমরা জানি, পুঁজিবাদের উষা লগ্নে কীভাবে নারী-পুরুষ ও শিশু শ্রম বাজারে নাম লেখাল, পরিবার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বিশেষ করে প্রসূতি-মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকল, তার বর্ণনা বহু গবেষকদের লেখায় পাওয়া যায়। অবস্থার ভয়াবহতায় সমাজ-চূড়ামণিদের টনক নড়ল। ক্রমশ মহিলাদের সুরক্ষার নানা আইন চালু হল, পুরুষদের জন্য পারিবারিক মজুরির ব্যবস্থা হল, নারীর স্থান গৃহে ও গৃহকর্মে এই সংস্কৃতি চালু হল। পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের কাছেও তা সমাধান হিসাবে গ্রহণযোগ্য হল।

২। পুরুষের জায়গা বাইরে ও বৃহৎ কর্মকাণ্ডে এবং নারীর স্বাভাবিক স্থান অন্তঃপুরে ও গৃহকর্মে— বাস্তবে অধিকাংশ শ্রমজীবী পরিবারের কাছে এটা মরীচিকা ও মিথ। তবু এটা এক কেন্দ্রাভিমুখী বল হিসাবে এবং সর্বক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। পাশাপাশি নানা দিক থেকে এই লিঙ্গ বিভাজন ও বিরোধকে নিজ স্বার্থে লাগানোর ক্ষেত্রে পুঁজিকে সুবিধা প্রদান করে।

৩। নারীকে গৃহে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস অবশ্যই নারী দমনের প্রকাশ ও শর্ত; পাশাপাশি পুরুষকেই যে সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে হবে, এটাও পুরুষের ওপর দমন। তবে, পুঁজিবাদী সমাজে গৃহশ্রমের সামাজিক মর্যাদা যেহেতু কম, তাই গৃহশ্রমের দায়িত্বে-থাকা নারীর সামাজিক মর্যাদাও কম। আমাদের বুঝতে হবে, এই লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন অথবা নারীর আপেক্ষিক মর্যাদাহানি কোনোমতেই পুরুষ ও পুঁজিবাদের যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল নয়।

৪। পুঁজিবাদ, তার বিকাশ ও তার অভিঘাত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। পুঁজিবাদে বাবা-মা-(নিজেদের)সন্তান ভিত্তিক নিউক্লিয়ার পরিবারের যে মডেল চালু ছিল, তা এখন আর পরিবারের একমাত্র রূপ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইয়োরোপের দেশে দেশে অন্য ধরনের পরিবার (যদি তাকে 'পরিবার' অ্যাখ্যা দেওয়া যায়) হু হু করে বেড়ে চলেছে। যেমন সন্তান সহ একলা-বাবা বা একলা-মা, বিবাহবিচ্ছিন্ন স্বামী বা স্ত্রী, অবিবাহিত মা ও সন্তান, দত্তক-নেওয়া সন্তান সহ বাবা-মা, পুরুষ বা নারীর আগের বিবাহের সন্তান সহ পুনর্বিবাহের ফলে নয়া পরিবার, সমকামী পরিবার প্রভৃতি প্রভৃতি। ধীরে এবং পরিমাণে কম হলেও এদেশেও সে-সবের প্রসার ঘটেছে।

৫। নিউক্লিয়ার পরিবারের মধ্যেও নানা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। ঘর ও বাইরের কাজ নারী-পুরুষ সমানভাবে ভাগ করে নিচ্ছে এবং তার ফলে একটা সমতাবাদী সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, এই সংখ্যা আজ কম হলেও তা নিঃসন্দেহে বাড়ছে। এমন পরিবারও দেখা যাচ্ছে যেখানে স্ত্রীর রোজগার স্বামীর থেকে বেশি।

৬। গর্ভনিরোধ ব্যবস্থার বিকাশ ও প্রয়োগ যেভাবে বাড়ছে, সমাজের সর্বস্তরে নারী যেভাবে পুরুষের সমান জায়গা করে নিচ্ছে, তার পাশাপাশি শিশুপালন এবং বয়স্ক ও অশক্তদের দেখভালের যদি সামাজিকীকরণ ঘটে, তবে সেই আদিম সাম্যবাদ থেকে আজ পর্যন্ত পরিবারের যে ভাঙা-গড়া আমরা দেখেছি, তাতে নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়, নর-নারী সম্পর্কের এবং তাদের যৌথ জীবনের বন্দোবস্তের (পরিবারের?) এক নতুন প্রথা গড়ে উঠবে।

উপসংহার

১। যদি সংখ্যা দিয়ে বিচার করি, তাহলে সর্বক্ষেত্রে, এখনও ঘরে ও বাইরে মহিলাদের অসুবিধাজনক, পশ্চাৎপদ, অমর্যাদাকর অবস্থাটা সত্যিই ভয়াবহ। কিন্তু যদি এই অবস্থাটা স্থিতিতে নয়, গতিতে বিচার করি, তাহলে নারী-পুরুষের আপেক্ষিক অবস্থানের যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই।

২। বর্তমান সমাজটা যদি পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক অ্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে বহু চলমান ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না আরও দু-একটি বিষয় ব্যাখ্যা করার। আমরা যদি মনে করি, আদি-অন্তকাল থেকে পুরুষতন্ত্র চালু ছিল এবং আর্থ-সামাজিক বনিয়াদের যে পরিবর্তনই হোক

না কেন, সেই অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই, তাহলে লড়ার আগে আমাদের হেরে যেতে হবে; ইতিমধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই অর্থহীন হয়ে পড়বে। যদি সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুরুষ-শাসিত হিসাবে অ্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র নারীকে শাসিত হিসাবে মেনে নিতে হয় এবং তার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে সমগ্র শাসক-পুরুষের বিরুদ্ধে সমগ্র শাসিত-নারীকে (ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিত নির্বিশেষে) ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান রাখতে হয়। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া সেটা অবান্তর ও অবাস্তব।

৩। প্রসঙ্গত, গার্হস্থ্য শ্রমের জন্য মহিলাকে মজুরি প্রদানের দাবি (যেটা নারীবাদীদের একাংশের পক্ষ থেকে করা হয়) কয়েকটি দিক থেকে আপত্তিকর। প্রথমত, তা মহিলাদের ঘরে আটকে রাখার দিকে ঠেলে দেবে। দ্বিতীয়ত, তা গার্হস্থ্য শ্রমের মজুরি নির্ধারণের এক অবাস্তব প্রয়াসের জন্ম দেবে। তৃতীয়ত, তা পুরুষদের স্বাভাবিক স্থান বহির্জগতে, আর মহিলাদের অন্তঃপুরে, এই মতাদর্শকে শক্তিশালী করবে। চতুর্থত, তা গার্হস্থ্য শ্রমের সামাজিকীকরণের দাবিকে দুর্বল ও দিগ্‌ভ্রষ্ট করবে।

৪। পুঁজিবাদ তার ধর্ম অনুযায়ী নারী-পুরুষ কারোর প্রতি পক্ষপাতমূলক বা বৈষম্যমূলক নয়, তা হতেও পারে না। নারী (অথবা) পুরুষ বিদ্বেষী হওয়ার জন্য পুঁজির কোনো অন্তর্নিহিত স্বার্থ নেই। বরং, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন ও পিতৃতান্ত্রিক উপাদানকে পুঁজি তার স্বার্থে সুচতুরভাবে ব্যবহার করে এসেছে; আর তার মধ্য থেকেই নারী-সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবার পুঁজিবাদের গতিময়তাতে তার প্রাথমিক সমাধান-ছক উলটে-পালটে গেছে এবং নারী-সমস্যা সমাধানের উপাদান সৃষ্টি করেছে। এদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রর পক্ষ থেকে সেরকম কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আজকের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের পক্ষে তা করাটাও অসম্ভব। (স্বাভাবিকভাবেই সেই সমাধান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অ্যাজেন্ডা হয়ে উঠেছে।) অবশ্য, আধা-খেঁচড়াভাবে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও সমাজটা সেইদিকেই এগোচ্ছে। ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক বিচারে পুঁজিবাদের সীমানাতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, যদিও আশু বাস্তবতার বিচারে তা অসম্ভব। তবে, চলমান বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির আধিপত্যের বিরুদ্ধে, গার্হস্থ্য শ্রমের সামাজিকীকরণের স্বপক্ষে তলা থেকে লড়াই যত তীব্র ও প্রসারিত হবে, তত সেই কাঙিক্ষত উত্তরণ হবে তাড়াতাড়ি, কম বেদনাদায়ক ও কম ক্ষতিকর।

৫। আজ পুঁজিবাদের আবর্তে শ্রমজীবী পুরুষ যেখানে অবদমিত, শোষিত ও শৃঙ্খলিত, সেখানে পুরুষের সমান অধিকার নারীকে মুক্তি দেবে না, বড় জোর শোষণ-নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে তাকে পুরুষের সমান নিষ্পেষিত করবে। তাই শ্রমজীবী নারীর মুক্তি নিহিত রয়েছে সহযাত্রী পুরুষের মুক্তির সঙ্গেই।

প্রবন্ধ

ভারতবর্ষে নারী সমস্যা এবং মুক্তি প্রসঙ্গে

ঈপ্সিতা সামন্ত

নারীমুক্তি ব্যতিরেকে সামগ্রিক মানবমুক্তি সম্ভব নয়। মানবমুক্তির সাধারণ শর্তগুলির পাশাপাশি মহিলাদের বিশেষ শোষণের জায়গা থেকে মুক্তির জন্য আরো কিছু শর্তের আবশ্যিকতা রয়েছে। কিন্তু নারী মুক্তি আন্দোলন কখনোই বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা সামগ্রিক মানবমুক্তি আন্দোলনের পথে সম্পৃক্ত। অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের মতো নয়া ঔপনিবেশিক নীতি দ্বারা পরিচালিত আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের সমস্যা, চরিত্র এবং দিশা কীরূপ হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা আমরা বর্তমান প্রবন্ধে করবো।

মেয়েদের সমস্যা: সমাজচরিত্র এবং পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি

আমাদের সামনে বিচার্য বিষয় হলো সামন্ততন্ত্রের অর্থে লালিত বিকৃত পুঁজিবাদ যা আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা কীভাবে মহিলাদের সামগ্রিক স্বাধীনতার পথে আক্রমণ হেনেছে। ভারতে জাতিভিত্তিক (caste) আধাসামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্র বৃটিশ আমলেই সাম্রাজ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। '৪৭ পরবর্তী সময়ে সামাজিক ভিত্তিতে এই যোগাযোগ পিছিয়ে পড়া সামাজিক সম্পর্কগুলির উজ্জীবন ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের প্রয়োজনেই পিছিয়ে থাকা আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলি টিকিয়ে রাখে, তা দেখা যায়। ফলত বর্ণভেদ, জাতপাতের বিভিন্নতা, নানাপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধ, অপ্রয়োজনীয় অবৈজ্ঞানিক রীতি রেওয়াজ বরণ করে নিতে হয় মেয়েদের। উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যের কারণে সামাজিক উৎপাদনে মেয়েদের প্রায়-অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ফলে সামাজিক উপরিকাঠামোতেও নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাজ করে ভারসাম্যহীনতা। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মেয়েদের অনুপস্থিতি বা পুরুষের তুলনায় কম উপস্থিতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ। ফলত, মেয়েদের এক্ষেত্রে গৃহের মধ্যে পুরুষের অধীন, তার নির্ভরশীল লেজুড় বিশেষ হয়ে থাকতে হয়। উপরিকাঠামোতে মেয়েদের এই অবনমিত অবস্থান তাদের নানাবিধ হেনস্থা/গৃহস্থালি হিংসার কারণ।

অন্যদিকে পুঁজিবাদ তার নিজের স্বার্থেই মহিলাদের সামাজিক শ্রমের জায়গাটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলো। পুঁজিবাদী পিতৃতন্ত্র মেয়েদের পণ্যায়িত করার প্রক্রিয়াকে এবং বিপুল সস্তা শ্রমশক্তি হিসেবে তাদেরকে যোগানের পথকে মসৃণ করেছে। শ্রমশক্তিকে পুনরুৎপাদন করার জন্য গার্হস্থ্যশ্রম, অন্যদিকে পুরুষের চাইতে কম মজুরির সস্তা শ্রমিকের যোগান— এই দুই ভাবে পুঁজিবাদ নারী-শ্রমশক্তিকে মূল্যায়িত করে। যদিও কয়েক দশক জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত উন্নয়ন মডেলে মেয়েদের বিশেষায়িত কোনো ভূমিকা ছিল না। অসংগঠিত শ্রমের ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিলো সর্বাধিক। এখানে মেয়েরা দুভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিলেন— ১) অর্থনৈতিক কার্যাবলীর জায়গা থেকে কম মজুরি, দীর্ঘ সময় শ্রম দান; ২) অর্থনীতি বহির্ভূত শোষণের জায়গা থেকে মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, যখন তখন কাজ থেকে বহিষ্কার, কাজের জায়গার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যৌন হেনস্থা ইত্যাদি। আমরা অর্থনীতি বহির্ভূত শোষণের জায়গার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্রের দম-বন্ধ বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েরা সাম্রাজ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের খপ্পরে পড়ে। তার সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন প্রকার জাতপাতভিত্তিক হেনস্থা, সামাজিক বয়কট, নিচু জাত হলে বাধ্যতামূলক যৌনদাসত্ব ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যভাবে সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্রের সাথে রফাকৃত সাম্রাজ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের শিকার হয় তারা।

আসলে আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্রের মূল বিরোধ কোথায়। সাম্রাজ্যবাদী পিতৃতন্ত্র যেখানে মেয়েদের পণ্যায়িত করে, ভোগের বস্তুতে পরিণত করে এবং সামগ্রিক মানবিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিনিময় মূল্যের জায়গা থেকে মূল্য নির্ধারণ করে, সেখানে আধা সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্র মেয়েদের ঘরে টেনে আনে। ঘরে টেনে আনার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে মেয়েদের অবস্থান তাদের প্রজনন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মেয়েরা একপ্রকার প্রজনন ক্ষমতা যুক্ত এস্টেট মাত্র, সেই জায়গা থেকে সমগ্র সম্প্রদায়ের সম্মান মেয়েদের গর্ভে বিরাজ করে। ফলত, ঘরের বাইরে যাওয়া মানে সম্মান হানি/সম্পদ হানির আশঙ্কা রয়েছে, ফলে ঘরে থাকাই যুক্তিযুক্ত। এরূপ যুক্তি কাঠামোয় সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্র মহিলাদের পায়ে শিকল পরিয়ে রাখে। একদিকে পিছিয়ে থাকা সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে মহিলাদের 'সম্মান' রক্ষা একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। তেমনি সাম্রাজ্যবাদ মেয়েদের টেনে এনেছে বিকিকিনির বাজারে। এখানে তার ভোগ্যমূল্য/শ্রমশক্তির মূল্য ছাড়া অন্য কোন মূল্য নেই। ফলত, তরবারির এই দুই ফলা মেয়েদের ক্ষতবিক্ষত করছে অনবরত। এবং নয়া উদারনীতি আমাদের দেশে এই দুই পিতৃতন্ত্রকে কাজে

লাগিয়ে মেয়েদের শোষণের নয়া নয়া পথ আবিষ্কার করছে।

মেয়েদের যৌন হেনস্থার পেছনে রয়েছে ক্ষমতার সমীকরণ। এই সমীকরণ নির্মিত যে সমাজে, তার ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে, পিছিয়ে থাকা যে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি কায়েমি স্বার্থ নিয়ে প্রাধান্য করছে, তা-ই উপরিকাঠামোতে এই ক্ষমতার সমীকরণ নির্মাণ করে। ফলে বিশ্বায়নী অর্থনীতির ভারতবর্ষে দুই প্রাধান্যকারী পিতৃতন্ত্রের মিলনক্ষেত্র হলো তার ভেঙ্গে পড়া সমাজব্যবস্থায়। নয় উদারনীতি যে ভোগবাদের কথা বলে, তা সংস্কৃতির পরতে পরতে ঢুকে পড়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন (যা আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক দেশের বৈশিষ্ট্য) সংগঠিত এবং অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার পথকে রুদ্ধ করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর যে রাজনীতি সমাজ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিমূর্তায়নের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক মানবমুক্তির পথ নির্দেশ করে, তা অনেকাংশেই শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রতিদিনকার সংগ্রামের সাথে নারীমুক্তি আন্দোলনের সংযুক্তিকরণ এখানে ঘটানো যায়নি। ফলে পিছিয়ে থাকা আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক-জাত চেতনা এগিয়ে থাকা দর্শনের জায়গা নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ঘটে চলা ধর্ষণ এবং হত্যা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থিত কাঠামোগত হিংসারই প্রতিফলন। তার সাথে জুড়েছে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্যগত কারণে চেতনার দুর্বৃত্তায়ন। এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের দেশে মেয়েদের লগ্নিপুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের মধ্যেকার নিহিত হিংসা এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিংসা, এই দুইয়েরই সম্মুখীন হতে হয়। তাদের সামনে রয়েছে তিনটে পাহাড়ের বাধা— ১) সামন্ততন্ত্র, ২) সাম্রাজ্যবাদ, ৩) পুরুষতন্ত্র।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন মহিলাদের উপর নির্যাতনের আরেকটি বিশেষ দিক, যা উল্লেখ না করলেই নয়। কম মজুরির শ্রম এবং পরিবেশ জনিত দায়িত্ব এড়াতে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, যেমন ভারতবর্ষে, তার নয়া উৎপাদন ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। ফলে পশ্চাৎপদ অংশের সাথেও বিশ্ববাজারের একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এবং বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ক্ষুদ্র চাষির জমিজিরেত চলে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী হাঙ্গর এবং তার দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার হাতে। এক বিপুল সংখ্যক মানুষ বিস্থাপিত হচ্ছেন। অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দেওয়া এই বিশ্বায়নী নীতি শুধুমাত্র পশ্চাৎপদ গ্রামীণ বা জঙ্গল এলাকার ভূমিপুত্র, ভূমিকন্যাদের উচ্ছিন্ন করছে না। JNNURM-এর আওতায় থাকা শহরাঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ, যারা ঝুপড়িবাসী, প্রান্তিক 'সৌন্দর্যায়নে'র স্বার্থে বুলডোজারের নিচে চাপা পড়ছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়নের শিকার হন মহিলারাই। উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে তাই মহিলাদের অংশগ্রহণ দেখবার মতো। তাদের রুজি রোজগার, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বার্থে মাথার উপর ছাদ, এসবেরই দাবিতে তারা জোটবদ্ধ হয়েছেন সরকারের 'উন্নয়নে'র বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে তাই সরকারি আক্রোশও বেশি। তারই প্রতিফলন আমরা সরকারি বাহিনীর হাতে নির্বিচারে ধর্ষণ, পুলিশ কাস্টডিতে অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে দেখতে পাই। উত্তরে কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বে মণিপুর-নাগাল্যান্ডে মেয়েদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সংগ্রাম চমকপ্রদ। শুধু আন্দোলনকারী নারীরাই নয়, সাধারণ মেয়েরাও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্ত নয়। ভারত রাষ্ট্র তাদের ছেড়ে কথা বলেনি। সামাজিকভাবে মেয়েদের প্রতি হিংসার একটি বৈধতা আছে। রাষ্ট্র মেয়েদের উপর যে নিপীড়ন চালায় তা এই পিতৃতান্ত্রিক বৈধতা-জাত হিংসারই নামান্তর। অর্থাৎ বিষয়টি পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্রের ক্রমাগত হিংসার শিকার হয় মেয়েরা। এবং একাজে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করে সমাজস্থিত পিছিয়ে থাকা আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলি।

নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও আমাদের বক্তব্য

নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত পুঁজিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিস্তারের সাথে সাথে লিবারেল ফেমিনিজম একটি প্রভাবশালী ধারা হয়ে ওঠে ভারতবর্ষে। বিশেষত উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে, যেহেতু এগুলি একটি লিবারেল বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রভাবিত নারীমুক্তির ধারণা যা যৌথ মুক্তির চাইতে ব্যক্তি মুক্তিকেই প্রাধান্য দেয় বেশি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শক্ত ভিতের ওপর না দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ইতিহাসে মেয়েদের গুরুত্ব, বা মেয়েদের পরাধীনতার ঐতিহাসিক কারণগুলি কী কী, সেসব বিষয়ে এই নারীবাদ নীরব থাকে। রাষ্ট্র চরিত্র সম্বন্ধেও লিবারেল ফেমিনিজম মনে করে এটি নিরপেক্ষ। ফলে স্বভাবতই নারীর সাধারণ দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য লিবারেল ফেমিনিস্টরা রাষ্ট্রের প্রতি প্রচারাভিযান চালাতে থাকেন সেই সময়। কিন্তু নির্দিষ্ট সামাজিক শর্তগুলি, যেমন জাতপাত ব্যবস্থা, যা কিনা নারী নিপীড়নের একটি প্রধানতম জায়গা ছিলো, তা তাদের নজরের বাইরে থেকে যায়। আরেকটি যেটি লক্ষ্যণীয় বিষয়, তা ছিলো শুধুমাত্র উচ্চজাত এবং বিত্তশালী/মধ্যবিত্ত মেয়েদের নিয়ে সংস্কারমূলক ভাবনা চিন্তা।

বিংশ শতকের শেষের দিকে ব্যাপক পরিমাণে শ্রমজীবী মহিলারা এবং ছাত্রীরা যারা সমাজতান্ত্রিক এবং মার্কসবাদী ভাবনায় প্রভাবিত ছিলেন, তারা নারীমুক্তি আন্দোলনকে নতুন দিশায় চালিত করেন। ১৯৭০ পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। মেয়েরা যেমন দৈনন্দিন জ্বলন্ত বিষয়, যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তেমনি জমিদার কর্তৃক গরিব ভূমিহীন চাষিদের উপর নিপীড়ন তাঁদের

এর পর ১০৮ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী নির্যাতন

শর্মিষ্ঠা চৌধুরী

দিল্লি ধর্ষণকান্ডের চার অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর গণতান্ত্রিক মহলে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একটা অংশ এই সাজাকে গণ-আন্দোলনের ফসল বলে অভিহিত করছে, আরেকটি অংশ মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুলছে যে এই বর্বর সাজা কি আদৌ সমাজে ধর্ষণ ও সামগ্রিক ভাবে নারী নির্যাতন রোধ করতে পারবে? ঘটনা হল, যারা এই সাজাকে গণ-আন্দোলনের ফসল বলে অভিহিত করছে তারা কিন্তু এটা মনে করছে না যে আদালতের এই রায়ের ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা নারীর অবমাননা মুহূর্তে লোপ পাবে বা নারী-বিরোধী সমস্ত ধরনের অপরাধের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। উভয়পক্ষই এই ব্যাপারে একমত যে সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে, একটি মামলায় একটি রায় এই সার্বিক অবস্থাকে মোটেই বদলাতে পারবে না যদি না সেই শিকড় পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। আমরা এই লেখায় মৃত্যুদণ্ডের ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা করব না, বরং খোঁজার চেষ্টা করব সেই শিকড় যা সমাজ জুড়ে ঘটে চলা নারী নির্যাতন ও সাধারণভাবে নারীর হীন অবস্থানের মূলে আছে।

আজকাল খবরের কাগজ খুললেই যে কোনো সুস্থ মানুষের মনে হয় যে আশেপাশের লোকজন— বিশেষ করে পুরুষরা— যেন উন্মত্ত হয়ে গেছে। কন্যা-শিশুরা হামেশাই নৃশংসভাবে ধর্ষিত হচ্ছে, ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পৈশাচিক শারীরিক নিগ্রহ, অল্পবয়সী ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বাজি ধরে কোনো মেয়ের শ্লীলতাহানি করছে, কথায় কথায় নারী শরীরের ওপর যৌন আক্রমণ যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অসংখ্য অপরাধীদের বয়স, বিত্ত, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি ভীষণ রকম আলাদা, ফলে এদের কোনোভাবে 'ক্যাটেগোরাইজ' করা সম্ভব নয়। দেখে মনে হয় যে প্রায় গোটা পুরুষকুলই এক ভয়ানক অসুখে আক্রান্ত— নারীর ওপর বল্গাহীন ক্রোধ, নিজের ওপর চূড়ান্ত হতাশা ও বিকৃতকাম-জনিত অসুখ। কোথা থেকে আসছে এত অন্ধকার?

আমাদের সমাজে একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে তার ভূমিকা বা অবস্থান দিয়ে। সহজ করে বলতে গেলে, একজন শিল্পপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি— তিনি থানায় গেলে দারোগাবাবু 'স্যার, স্যার' করে, কোনো সরকারি দপ্তরে তাঁর কদরই আলাদা, একজন শ্রমিকের মতো তাঁর একটিই ভোট থাকা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য বা মতামতের দাম-ই আলাদা। অন্যদিকে একজন শ্রমিক সমাজে কীরকম সম্মান পেয়ে থাকেন, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার শ্রমিকদের মধ্যেও স্তরবিভেদ আছে। জুটমিলের একজন স্থায়ী শ্রমিকের মাইনে আইটি সেক্টরের ঠিকা শ্রমিকের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি হলেও সামাজিক মানমর্যাদা অনেক কম, কারণ আইটি সেক্টর জুটমিলের চেয়ে উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে অনেক উন্নত। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই— আশা করি বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান বিচার করা যাক। নারীরা আক্ষরিক অর্থেই সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সাধারণ ভাবে উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে তাদের অবস্থান একেবারেই পিছনের সারিতে। নারীরা সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের সাথে কী পরিমাণে যুক্ত সে প্রসঙ্গে পরে যাচ্ছি। তার আগে দেখা যাক সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের সাথে যুক্ত থাকাটা নারীর জীবনের প্রধান দিক কি না। বেশি তত্ত্বকথায় না গিয়ে খোলা চোখে তাকালেই বোঝা যায় যে এর উত্তর 'না'। না সমাজের চোখে, না দেশের সরকারের চোখে। সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কের সাথে যুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা একজন পুরুষের আছে, কিন্তু নারীর নেই। আমাদের সমাজে নারীর প্রধান ভূমিকা তার পরিবারে। তার প্রধান 'কর্মক্ষেত্র'ও তার পরিবার, যেখানে তার দায়িত্ব সন্তানের জন্ম দেওয়া ও প্রতিপালন করা এবং পরিবারের দেখভাল করা। এটাই তার অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় দিক। যদি সে বৃহত্তর সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ও, সেটা সাধারণত থাকে তার অস্তিত্বের প্রান্তিক দিক। এক্ষেত্রে আমাদের সরকার তথা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো বোঝা যায় এ থেকে যে যখন সরকার দেশে বেকারির পরিমাপ করে, তখন যে অসংখ্য 'গৃহবধূ' কোনো চাকরিবাকরি করেন না তাঁদের সেই পরিসংখ্যান থেকে বাদ রাখা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চোখে একজন তরুণী 'গৃহবধূ' মোটেও বেকার নয়, কারণ পরিবার তার 'কর্মক্ষেত্র'! স্পষ্টতই সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে ব্যক্তির অবস্থান যখন তার সামাজিক অবস্থানের মাপকাঠি, তখন যারা সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কে অবস্থিতই নয় তাদের সামাজিক অবস্থান প্রধানত অধীনতার। আর যে অল্পসংখ্যক নারী সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কে, এমনকী উন্নত উৎপাদন-সম্পর্কে উন্নত অবস্থানে অবস্থিত, তাদের ক্ষেত্রেও সেটা তাদের জীবনের গৌণ দিক হিসেবেই সমাজে স্বীকৃত।

যারা এই সরল সত্যটি নিয়ে তর্ক করতে চাইবেন, অজস্র উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলিয়ে তাদের সামনে একটি উদাহরণই রাখব। সরকারের বয়স্ক-শিক্ষার বা নারী-শিক্ষার

বিজ্ঞাপনের সাধারণ স্লোগান মনে আছে তো? 'সাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর হবে না'। নারীদের স্বাক্ষর করার সার্থকতা সরকার দেখছে এইভাবেই! রাষ্ট্র যখন জনকল্যাণকারীর ভেক ধারণ করছে, তখনও এটাই রাষ্ট্রের চিন্তা! অতিরিক্ত মন্তব্য নিঃসন্দেহে নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় এই দর্শনের প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক তা বোঝা যায় এমনকী বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক মহলের সংস্কৃতি-চর্চায় এর ছাপ থেকেও। 'ও নকশাল নকশাল নকশালবাড়ির মা...' এই মনকাড়া লড়াইয়ের গানটি এখনও বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আগের মতোই সমাদৃত। কারা এই নকশালবাড়ির মায়েরা? তাঁরা নকশালবাড়ি আন্দোলনের চিরস্মরণীয় বীর শহীদ— তাঁরা ছিলেন নারী কৃষক, মাঠে পুরুষের সাথে সমানতালে গতর খাটিয়ে ফসল উৎপাদন করতেন, জোতদার ও পুলিশের বিরুদ্ধে অসমসাহসী লড়াইয়ের সামনের সারির সৈনিক হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব পরিচয় গৌণ হয়ে তাঁদের 'মা' পরিচয় নিয়েই গান বাঁধা হল! কৃষক হিসাবে, লড়াইয়ের সৈনিক হিসাবে তাঁদের পরিচয় সমাজের চোখে— এমনকী বিপ্লবীদের চোখেও— গৌণ হলো, প্রধান হলো 'মা' হিসাবে তাঁদের পরিচয়। আচ্ছা, 'নকশালবাড়ির বাবা'দের নিয়ে কোনো গান শুনেছেন কি? মনে পড়ে, 'জননী গো আরো কাঁদো, শত শহীদের মা...'? তাহলে কি শহীদেরা সকলেই পিতৃহীন ছিল? বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক মহলেই যখন এই অবস্থা, তখন বাস্তব চিত্রটা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না।

মূল আলোচনায় ফেরা যাক। এতক্ষণ যে বিষয়টা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে তা এই যে সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিযুক্ত অবস্থানই সমাজে নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের জন্য প্রথমত দায়ী। অনেকে বলতে পারেন যে পরিবারে নারীদের ভূমিকা সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ারই অঙ্গ, ফলে তা তাদের অধীনতার কারণ হতে পারে না। ঘটনা তা নয়। পরিবারে নারীর ভূমিকা সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, এবং সর্বোপরি, পরিবারে নারী ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগত সম্পর্কের অধীনে, সরাসরি সামাজিক সম্পর্কের অধীনে নয়, সুতরাং পরিবারে তার শ্রম সামাজিক ভাবে পরিমাপযোগ্য নয়, এমনকী মূল্যবান বলে গণ্যও নয়।

নারীকে পরিবারের মধ্যে বেঁধে ফেলা ও সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা— এটাই পুরুষতন্ত্রের শিকড়।

যখনই ব্যাপক নারীরা সমাজ স্বীকৃত— ও অবশ্যই রাষ্ট্র স্বীকৃত— এই ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঘরের বাইরে বের হন, সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কে শুধু নিজেদের জায়গা করে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না, ক্রমশ ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করেন, সমাজের কাছে দাবি করেন সেই অবস্থান জনিত সকল সুযোগ-স্বাধীনতা, তখনই পুরুষতন্ত্র আক্রমণ শানায়। সেই আক্রমণের 'সর্বোৎকৃষ্ট' রূপ কী? অবশ্যই যৌন আক্রমণ। কারণ অন্য সব ধরনের আক্রমণের তুলনায় যৌন আক্রমণই নারীকে তার সমাজ-রাষ্ট্র স্বীকৃত প্রধান ভূমিকায়, অর্থাৎ কন্যা বা মা বা স্ত্রীর ভূমিকায়, সবচেয়ে জোরালোভাবে আঘাত করবে, তার 'সম্মানহানি' ঘটাবে, তাকে ভূমিকাচ্যুত করে সমাজে চূড়ান্ত অসহায় করবে, তাকে 'উচিত শিক্ষা' দেবে। ছাঁটাইয়ের অস্ত্র যেমন একজন (পুরুষ) শ্রমিককে বেকার বানিয়ে, তাকে তার সামাজিক ভূমিকা-চ্যুত করে চূড়ান্ত অসহায় করে তোলার হাতিয়ার, তেমনি ধর্ষণও নারীকে সামাজিক ভূমিকা-চ্যুত করে চূড়ান্ত অসহায় করে তোলার হাতিয়ার। ছাঁটাই যেমন মালিকের আধিপত্যকে প্রশ্নহীন করার হাতিয়ার, তেমনি ধর্ষণ পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করার হাতিয়ার।

ফলে আজ ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন, নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন, এই মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

আন্দোলনের চাপে আজ যখন রাষ্ট্র নারী নির্যাতন বিরোধী নতুন আইন এনে নারীমুক্তির কাণ্ডারী হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চাইছে, তখন নারীর সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে অবস্থান-গত প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার প্রকৃত পুরুষতান্ত্রিক চরিত্রকে উদঘাটিত করছে। ন্যাশন্যাল স্যাম্প্‌ল সার্ভে অফিসের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উৎপাদন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার ২০০৪-২০০৫-এ ২৯.৪ শতাংশ থেকে কমে ২০০৯-১০-এ হয়েছে ২৩.৩ শতাংশ এবং ২০১১-১২-তে গোত্তা খেয়ে নেমেছে ২২.৫ শতাংশে। (ন্যাশনাল স্যাম্প্‌ল সার্ভে অফিসের এর আগের দফার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলে নারীদের লেবার ফোর্স-এ অংশগ্রহণের হার ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৯.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০০৪-এ ২৮.১ শতাংশ হয়েছিল এবং শহরাঞ্চলে তা যৎসামান্য বেড়েছিল— ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৩.৯ শতাংশ থেকে ২০০৪-এ ১৪ শতাংশ।) ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস্ ২০১৩ রিপোর্ট অনুযায়ী, যে ১৩১-টি দেশের এই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে ভারতের স্থান তলা থেকে ১১ নম্বরে! এই রিপোর্টের ওপর বলতে গিয়ে আইএলও-র অর্থনীতিবিদ্ স্টিভেন কাপসোস বলেছেন যে ভারতে লেবার ফোর্সে নারীদের অংশগ্রহণের হার সার্বিকভাবেই কমেছে— এই হ্রাস সকল বয়সের, বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার, এবং শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল উভয় এলাকার নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অথচ দেশের জনগণনার রিপোর্ট দেখায় যে নারী শিক্ষার হার মৃদুগতিতে হলেও ক্রমবর্ধমান। ২০০১ সালের আদমসুমারি রিপোর্টে নারী সাক্ষরতার হার ছিল ৫৩.৬৭ শতাংশ, যা ২০১১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫.৪৬ শতাংশে। আপাতদৃষ্টিতে এ ভারী অদ্ভুত তথ্য। গত এক দশকে নারী-

সাক্ষরতা বেড়েছে, নারীশিক্ষা বেড়েছে, কিন্তু দেশের শ্রমবাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণের হার কমেছে। এর থেকে একটাই সিদ্ধান্ত টানা যায়, তা হল নারীকে সাক্ষর করার, এমনকী উচ্চশিক্ষিত করার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য হলো তাকে তার পারিবারিক ভূমিকায় আরো মোহিনী করে তোলা— সাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর থাকবে না, উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের এনআরআই স্বামী বাঁধা। শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের যে স্বাভাবিক যোগ থাকে, তা নারীদের ক্ষেত্রে নেই। নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে যোগ আছে দক্ষ মা হওয়ার, সুচারু স্ত্রী হওয়ার।

১৯৪৭-এর পর থেকে আজ অবধি ধারাবাহিক ভাবে দেখলে অবশ্যই দেখা যাবে যে কয়েক দশক আগের তুলনায় আজ নিশ্চয়ই বহুগুণ বেশি সংখ্যায় মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হচ্ছে, স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, নিজের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে (অথবা অপ্রত্যাশিত ভাবে) যে হারে নারী সাক্ষরতা ও শিক্ষা বেড়েছে, শ্রমবাহিনীতে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি তার ধারে কাছেও আসে নি। রাষ্ট্র এর জন্য কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরের কথা, বিপরীত প্রচেষ্টাই করেছে। সমকাজে সম বেতন এখনো অধরা, নারীদের জন্য কাজের বাজার আজো খুব সীমাবদ্ধ, সবচেয়ে কম মজুরির ও কম দক্ষতার কাজ নারীদের জন্য বরাদ্দ, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীদের সামাজিক কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটা অদৃশ্য কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য মতাদর্শগত প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখি সাক্ষর মায়ের সাক্ষর সন্তানের স্লোগানে।

ফলে আপাত নারী স্বাধীনতার আড়ালে অধীনতার মূল জায়গাটি অটুট থেকে গেছে, বরং নতুন রূপে আরো শক্তিশালী হয়েছে। সুবর্ণলতাকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ওর ঠাকুমা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল, আর আজকের সুবর্ণলতাদের বিশ্ববিদ্যালয় অবধিও পড়ানো হয় সেই বিয়ের কথা মাথায় রেখেই। সেযুগের সুবর্ণলতা সারা জীবন বিদ্রোহ করে গিয়েছিল, আর আজকের সুবর্ণলতাকে কলেজে পাঠিয়ে সৎ পাত্রের হাতছানি দেখিয়ে বোঝানো হয় যে তার বিদ্রোহ করার কোনো সঙ্গত কারণই অবশিষ্ট নেই, কারণ সে 'স্বাধীন'।

কিন্তু আসলে সে তো স্বাধীন নয়। সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে অবস্থান করাটা সমাজের যে অংশের অস্তিত্ব বা পরিচয়ের প্রধান দিক, সে অংশের নিরিখে সে তো চূড়ান্ত ভাবে পরাধীন, বলা ভালো মূল্যহীন। ফলে তার উপর যে আধিপত্য ফলানো হবে, সেটাইতো স্বাভাবিক। আধিপত্যকারী ও আধিপত্য-পিষ্টের মধ্যে যুগ যুগ ধরে আসা সংঘাতের ফলে আধিপত্যের রূপ বদলায়। যেমন, এক-দেড়শো বছর আগে অসূর্যম্পশ্যা রাখা, (পুরুষের) বহুবিবাহ, শিক্ষা-ভোটাধিকার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত রাখা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি ছিল এই আধিপত্যের অন্যতম রূপ। বিভিন্ন কারণে, অবিরত চলমান সংঘর্ষের কারণে, এই রূপ আজ অনেক বদলেছে। নারীকে অবদমিত রাখার পুরোনো হাতিয়ারগুলো যত তামাদি হয়ে গেছে, তত অন্যতম প্রধান ও মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে উঠে এসেছে সরাসরি যৌন আক্রমণ। একসময় সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন নারীদের ঘরে বন্দী রেখেই জব্দ রাখা যেত, কিন্তু আজ যখন সেটা আর সম্ভব নয় তখন সরাসরি যৌন আক্রমণ দিয়েই নারীকে তার অধীনতার জায়গাটা ভুলতে দেওয়া হয় না।

ধর্ম-জাত-শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে নারীর মূল পরিচয় যেহেতু পরিবার-কেন্দ্রিক (আগেই দেখানো হয়েছে যে আধুনিক রাষ্ট্র এই পরিচয়কেই অটুট রেখেছে) ও পুরুষের মূল পরিচয় যেহেতু সমাজ-কেন্দ্রিক, তাই পুরুষের বহুগামিতা যেমন সমাজ অনুমোদন করে তেমন নারীর ওপর চাপিয়ে দেয় কঠোর একগামিতার দায়। এটাই যৌন আক্রমণের বাস্তব জমি। ফলে যৌন আক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রমণকারীর যেমন থাকে বহুগামিতার স্বীকৃতি, আক্রান্তের থাকে একগামিতা তথা তার অস্তিত্বের মূল দিক রক্ষা করার দায়। ফলে অন্য যে কোনো ধরনের আক্রমণের (যেমন নিগ্রহ) সাথে যৌন আক্রমণের পার্থক্য হল যে এখানে প্রতি-আক্রমণের ধারণাটাই অবাস্তব। একজন মেয়েকে কোনো পুরুষ একটা চড় মারলে সে-ও পাল্টা চড় মারতে পারে, কিন্তু মেয়েটিকে যদি পুরুষটি ধর্ষণ করতে যায় তাহলে মেয়েটি পাল্টা ধর্ষণ দিয়ে সেই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, নারীর ওপর যৌন আক্রমণের যে বাস্তব জমি তা সমাজ-রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত। তাই শুধু ব্যক্তি পুরুষই নয়, এমনকী রাষ্ট্রযন্ত্রটাই নারীর সাপেক্ষে তার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায় যৌন আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। দিল্লি বা কামদুনির কিছু পিশাচ কাশ্মীর-মণিপুর-ছত্তিশগড়-জঙ্গলমহলের উর্দিপরা পিশাচদের ছায়ায় ঠেলে দিতে পারে না। মনোরমা থেকে সোনি সোরি, সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র শিক্ষা দেয় কীভাবে নারীকে সবচেয়ে ভালোভাবে পদপিষ্ট রাখা যায়। আবার নারী তার হীন সামাজিক অবস্থানের জায়গা থেকে যেহেতু তার পরিবারের— বা পুরুষের— সম্পত্তি, তাই কোনো বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে দমন করার প্রকৃষ্ট হাতিয়ারও হল সেই জনগোষ্ঠীর 'সম্পত্তি'র ওপর আক্রমণ বা তার নারীদের ধর্ষণ। মহাভারতের যুগ থেকে নকশাল দমনের অত্যাধুনিক যুগে এর কোনো পরিবর্তন হয় নি।

তাই আজ দামিনীর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় গণ আন্দোলনের চাপে দিল্লির আদালত দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও, কামদুনি কাণ্ডে সরকার নির্লজ্জ ভাবে দোষীদের আড়াল করার

এর পর ১০৮ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

ভারতীয় সমাজ বদলের সংগ্রামে নারী ও নারীমুক্তির প্রশ্ন

শ্যামল দাস

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের অবশেষের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতি মানুষের বৈপ্লবিক সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শ্রমজীবী নারী সমাজ। শ্রেণীগত নিপীড়নের সঙ্গে নারীর জীবনে যুক্ত হয় পিতৃতন্ত্রের নিপীড়ন। সমাজের অর্ধাংশের উপর নিপীড়নকারী এই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় অবস্থান এবং এর বিরুদ্ধে মেহনতি নারী সমাজের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ব্যতীত সমাজ পরিবর্তনের লড়াই অসম্ভব। পিতৃতন্ত্র হলো পৃথিবীর আদিমতম অগণতান্ত্রিক মতাদর্শ। রূপের কিছু পরিবর্তন হলেও সব ধরনের শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পিতৃতন্ত্রের মতাদর্শ সমাজে আধিপত্য স্থাপন করে। পিতৃতন্ত্র শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল পিতার শাসন। পুরুষের তুলনায় নারী অক্ষম— এই মৌলিক ভ্রান্তির ওপর গড়ে উঠেছে পিতৃতন্ত্রের ধারণার সৌধ। পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার, বংশপরস্পরা, যৌন আকা**ঙ্খা,** মানসিক ও শারীরিক তৃপ্তি চরিতার্থ করার জন্য নারীদের দাসসুলভ শ্রমদান ও বশ্যতা— এই হলো পিতৃতন্ত্রের মূল কথা। যুগ যুগ ধরে এই মতাদর্শ সমাজের গভীরে এমন ভাবে প্রোথিত হয়ে রয়েছে যে শুধু পুরুষেরা নয়, নারীরাও, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিসহ শ্রমিকশ্রেণীর অন্য সব সংগঠনও এর দ্বারা আক্রান্ত থাকে।

পিতৃতন্ত্র : নানা রূপে

সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শ ও সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট ও চরিত্রায়িত পিতৃতন্ত্রের এক দীর্ঘ ইতিহাস ভারতীয় সমাজজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মনুসংহিতা নির্দেশিত পথে ভারতীয় সমাজে একদিকে যেমন জাতিধর্ম ব্যবস্থা সূত্রবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুশীলিত হয়েছে, পাশাপাশি সমস্ত বর্ণের নারীদের উপর চেপে বসেছে ধর্মীয় নানা বিধির নির্মম অনুশাসন, যা মেনে জীবনযাপন করতে তারা বাধ্য হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুধর্মে পিতৃতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বৈধব্যদশার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা সমাজে আধিপত্য করেছে। ভারতের সমাজ জীবনে ও সংস্কৃতিতে, বিশেষত গ্রামীণ জীবনে এখনও সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শ আধিপত্য করে চলার দরুণ পিতৃতন্ত্রের পুরনো রূপগুলি যেমন টিকে রয়েছে, তেমনি অন্যান্য নানা রূপ বিস্ময়কর সব সংমিশ্রণে বহুবিচিত্র চেহারায় আমাদের সামনে উপস্থিত, যেমন পণ প্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, বাল্য বিবাহ, বধূ নির্যাতন, ধর্ষণ, পরিবারের ভিতরে ও বাইরে যৌননিগ্রহ।

ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে সাথে পিতৃতন্ত্রের রূপগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পিছনে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নারী আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে, তেমনি বুর্জোয়াদের নিজস্ব স্বার্থও ক্রিয়াশীল রয়েছে। মুনাফাবৃদ্ধির তাড়নায় তাড়িত থাকে বলে বুর্জোয়ারা এক ধরনের নমনীয়তা দেখাতে বাধ্য হয়। পিতৃতন্ত্রের সেই রূপগুলি তারা বজায় রাখে যেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা ও শ্রেণীশাসনের স্থিতিশীলতা টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার, যেমন বিবাহ ব্যবস্থা। অন্য অনেক রূপ আছে যেগুলি তাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। তাদের তত্ত্বাবধানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে, পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন হয়েছে, আইন হয়েছে ঘরোয়া হিংসা ও বধূ নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সংসদ-বিধানসভা-পঞ্চায়েতে হয়েছে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ। নানা ধরনের আন্দোলনের চাপে পড়ে এই আইনগুলি করতে তাদের যেমন আপত্তি নেই। অন্য দিকে তাদের মুনাফার জন্য তারা পিতৃতন্ত্রের পুরনো অনেক রূপের বদলে নিয়ে এসেছে নতুন নতুন রূপ। পুঁজির বাজারের সম্প্রসারণের জন্য তার প্রয়োজন হয়েছে যৌনপণ্য হিসাবে নারীদেহের ব্যবহার। আন্তর্জাতিক পুঁজির তত্ত্বাবধানে এর এক আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে উঠেছে, যার বাণিজ্যিক মূল্য বহু বৃহৎ শিল্পের বাণিজ্যিক মূল্যকে বহু পেছনে ফেলে দিয়েছে। তাই অবাধে গড়ে উঠেছে রূপচর্চা কেন্দ্র, ফ্যাশন শিল্প, বিনোদন শিল্প, সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা, পর্ণোগ্রাফি, সেক্স ট্যুরিজম, সেক্স জার্নালিজম ইত্যাদি। এই শিল্পকে যথাযথ রূপ দিতে বুর্জোয়াদের প্রয়োজন বেশ্যাবৃত্তির সামাজিক ও আইনি স্বীকৃতি আর যৌনতার চর্চাকে বর্ণময়, আকর্ষণীয়, প্রকাশ্য ও লাভজনক একটি কাজ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

পরিবারে নারী

সামন্ততন্ত্রেই হোক, বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় হোক, পিতৃতন্ত্রের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হল বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা। জন্মকাল থেকে আজও পর্যন্ত বিবাহ নারীর জীবনে পরাধীনতার এক শৃঙ্খল হিসাবে রয়েছে। শৈশব থেকে নারী সামাজিক বাধানিষেধের যে পরিমণ্ডলে বড় হয়, বিবাহে তা চূড়ান্ত রূপ পায়। বিগত দেড়শো বছর ধরে নারী আন্দোলন বিবাহব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক, বৈষম্যমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও, কখনই ব্যক্তিগত মালিকানা ও শ্রেণীবৈষম্যের সাথে এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নির্ণয় করতে পারেনি এবং তার অবসানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিবাহব্যবস্থাকে এবং নারীদের অনুকূলে ডিভোর্স আইন শিথিল করার দাবি ওঠার কারণে কিছু বুর্জোয়া সংস্কার হয়েছে। তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক

কায়দায় বিবাহিত নারীদের উপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে কিছু আইনি বাধা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু পুঁজিপতিশ্রেণী বা আধুনিক রাষ্ট্র বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য নারীর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে আজও রাজি নয়। বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর দায়িত্ব নিতেও রাষ্ট্র রাজি নয়। বিবাহব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভূত মিল, কারণ এই সেই প্রতিষ্ঠান যা পুরুষদের বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। তাই সব কটি ধর্মের অনুশাসনকে টিকিয়ে রাখতে বুর্জোয়াদের এত আগ্রহ।

নারীর যৌনতার উপর অধিকার হরণ করতেও বিবাহব্যবস্থা এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আইনের বিভিন্ন ধারায় আর সামাজিক স্বীকৃতিতে বিবাহিত জীবনে নারী যৌন সম্পর্কে বাধ্য। স্বামীর আকাঙ্ক্ষা পূরণই নারীর যৌনতার শেষ কথা। সন্তান ধারণের প্রশ্নেও একই কথা। অপরপক্ষে অবিবাহিত নারীর জীবনে যৌনতার কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। এ থেকে মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে যে যৌন আচারের প্রশ্নে বেশ্যার স্বাধীনতাও কখনও কখনও বিবাহিত নারীর তুলনায় বেশি। এইভাবে পিতৃতন্ত্রের নির্মাণ হিসাবেই সমগ্র সমাজে যৌন সম্পর্কের ধারণা গড়ে উঠেছে। আগামী সভ্যতায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে নর-নারীর যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা সর্বহারার এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে রয়ে গেছে।

শ্রমজীবী নারী

কর্মে নিযুক্ত নারীরা একাধারে পিতৃতন্ত্রের সামাজিক ও পারিবারিক নিপীড়নের শিকার, আবার পুঁজি এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের প্রত্যক্ষ শোষণেরও শিকার। এরাই নারীদের সেই অংশ, যারা শোষণ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। সচেতন সংগ্রামে এদের জাগরণই বৃহত্তর নারী সমাজের জাগরণে নেতৃত্ব দিতে পারে। নারী সমাজের বড় অংশটিই উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ নয়। অথচ জন্মসূত্রে, পারিবারিক সূত্রে ও সামাজিক-আর্থিক অবস্থানের বিচারে এঁরা শ্রমজীবী নারী জনতারই অংশ। শ্রমজীবী নারী আন্দোলন নারীসমাজের এই বিশাল অংশকে নারীর মুক্তিসংগ্রামে সামিল করবে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য দলিত বর্ণগুলির নারীরা, যাঁরা জাতিভেদ প্রথার কারণে নিপীড়িত নারীদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি বৈষম্য, নির্যাতন ও দমনের শিকার। তাই শুধু সামাজিক ন্যায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, সর্বহারার সচেতন অগ্রবাহিনী তৈরির প্রয়োজনেও দলিত নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণ এক আবশ্যিক কাজ।

নারী আন্দোলনের পৃথক ভিত্তির প্রশ্ন

নারী আন্দোলনের এক গুরুতর সমস্যা হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ের বহু দাবি, যেমন নারীর যৌনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি পুরুষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই চলে যায়। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুরুষ শ্রমিকদের মতাদর্শগত অবস্থান যেহেতু দীর্ঘ পর্যায় জুড়েই দুর্বল তাই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে দুর্বল করে দেয়। এর সমাধান নিশ্চয়ই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই স্থগিত রাখা নয়। বরং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকেই (তার পুরুষ অংশ সহ) পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করা। শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে তার লড়াই সমস্ত ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। নারীর প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধেও। তাই সে নিজেই যদি কোন সামাজিক বৈষম্যের ধারক হয়, তবে তার কাজ হয়ে যাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘোষিত লক্ষ্যের বিরুদ্ধে। তবুও এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে বিশেষত পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা নেবে। তাই পিতৃতন্ত্র সহ পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে নারীদের জাগিয়ে তুলতে নারীদের পৃথক সংগঠন বানাতে হবে। তবে এই নারী আন্দোলন সর্বদাই পুরুষ সাথীকে পাশে চাইবে। পুরুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যখন পিতৃতন্ত্র বিরোধী হয়ে উঠবে এবং নারী-পুরুষ যৌথভাবে এ লড়াইয়ে সামিল হবে, তখনই আসবে সাফল্য। একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সর্বহারা নারী আন্দোলন

পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বহারা নারী আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুর্জোয়া নারী আন্দোলন অনেকটাই সফলভাবে এই তত্ত্ব প্রচার করেছে যে নারীরা শ্রেণী বিভাজনের উর্ধ্বে। তাদের মতাদর্শ বরাবরই মেহনতি নারীদের নিজ শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে উৎসাহ দিয়েছে। বুর্জোয়া নারীবাদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনেক কিছু সমালোচনা করে একধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। একই সঙ্গে তাদের একটা অংশ বেশ্যাবৃত্তি আইনিকরণ, মুক্ত যৌনতা, বিবাহ-পরিবার-গৃহশ্রমের সামাজিক উপযোগিতা, যৌনব্যবসার প্রসার ইত্যাদি প্রশ্নে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী বক্তব্যও হাজির করে। সর্বহারা নারী আন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিজ শ্রেণীর নারীদের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধি হয়ে ওঠা এবং বুর্জোয়া নারীবাদের দ্বারা নারীত্বের যে অপমান ঘটে চলেছে তার বিরুদ্ধে মেহনতি নারীদের জাগিয়ে তোলা। সর্বহারা নারী আন্দোলনের এক স্বতন্ত্র ধারা একাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

নারীর মুক্তি : প্রকৃত অর্থে

শুধুমাত্র পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর সংগ্রাম নারীর পূর্ণ বিকাশে যথাযথ ভূমিকা নিতে পারে না। নারীর যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা উত্থান-পতনের বাঁকে গণসংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের

মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। সর্বহারার আন্দোলন মনে করে সামাজিক শ্রম প্রক্রিয়ায় নারীর যোগদান শুধু এ কারণে আবশ্যিক নয় যে তা নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, একারণেও যে তারা এমন এক সমাজ গড়তে চায় যা অবদমনমুক্ত নারীর পূর্ণ বিকশিত ও সৃজনশীল শ্রমকে প্রয়োজনীয় মনে করে। মনে করে যে নারীর সহজাত বহু গুণ যা এখন দাসসুলভ গৃহশ্রমে নিঃশেষিত হচ্ছে তার সৃষ্টিশীল ব্যবহার মুক্ত ও উন্নত এক সমাজ গড়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এ কথা ঠিক যে আজকের ভারতে বেশিরভাগ নারীর কর্মনিযুক্তি সম্ভব নয়। অথচ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নারীর প্রথম সোপান। তাই সম্মানজনক মজুরিতে কাজের অধিকারের দাবিতে লড়াই বৃহত্তর নারীসমাজের কাছে নতুন ও উন্নত জীবনে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। এইভাবে তারা যখন বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের শরিক হবে, তখন এক সামাজিক শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের প্রবেশ সম্ভব হবে। উৎপাদনে অংশগ্রহণ, সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানচর্চা, শিক্ষালাভের এই ত্রিমুখী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হওয়া নারীসমাজ শোষণহীন সমাজ গড়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী নির্যাতন

১০৫ পৃষ্ঠার পর

চেষ্টা চালিয়ে যায়, পুলিশ-মিলিটারির হাতে ধর্ষিতারা বিচারের আশাও করে না, ভার্মা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত উর্দিবাহিনীদের সাধারণ আইনি প্রক্রিয়ার আওতার বাইরেই রাখা হয়, সারা দেশে যৌন নির্যাতনে শিকার হাজার হাজার নারী তাদের অভিযোগ নথিভুক্তই করাতে পারে না, ভার্মা কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও দাম্পত্য-ধর্ষণ (ম্যারিট্যাল রেপ) এখনো আইনের চোখে অপরাধ হিসাবে স্বীকৃতি পায় না, আর খবরের কাগজে যে-কোনো ধর্ষণের খবরই উঠে আসুক না কেন, কোনো না কোনো আমলা-নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ-আইনজীবী-আদালত অবশ্যম্ভাবী ভাবে সেই নির্যাতনকে বৈধতাদানকারী মন্তব্য করেই থাকে।

তাই ধর্ষণ তথা নারীর ওপর সব ধরনের যৌন আক্রমণকে সমাজ থেকে নির্মূল করতে হলে নারী নির্যাতন বিরোধী ব্যাপকতম গণ আন্দেলনের পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে সমাজে নারীর অধীনতার মূল জায়গাটি উৎপাটিত করার সচেতন আন্দোলন।

ভারতবর্ষে নারী সমস্যা এবং মুক্তি প্রসঙ্গে

১০২ পৃষ্ঠার পর

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রাথমিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি এবং তারপর নকশালপন্থীদের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হতে থাকেন। শহরে মেয়েদের আন্দোলন এই সময় প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠেছিলো। মেয়েদের উপর হিংসার প্রশ্নটি বিশেষ করে প্রাধান্য পায় এই আন্দোলনে। কিন্তু এই আন্দোলনে পশ্চিমের বিবিধ ধারা, যেমন র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম ইত্যাদির প্রভাব থাকার ফলে রাজনৈতিক দলগুলির থেকে এক প্রকার স্বাধীন সত্তা বেছে নিয়েছিলো। এই স্বাধীন নারী আন্দোলনের মূল ধারাটি ছিলো সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। যদিও গত তিন দশকে গড়ে ওঠা বহু গণআন্দোলন যেখানে মেয়েরা মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন এবং প্রভূত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, সেখানে বহুলাংশেই এই সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা চুপ থেকেছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নারীবাদের ধারা হলো কালচারাল ফেমিনিজম। রাষ্ট্রবিরোধী যে কোন সশস্ত্র আন্দোলনের বিপক্ষে তারা দাঁড়ান। হিংসার প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত হিংসা এবং রাষ্ট্রীয় হিংসার প্রতিরোধে শোষিতের হিংসা— এই দুই হিংসার মধ্যে মূলগত কোনো ফারাক দেখেন না তারা।

আমাদের বক্তব্য : ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারী প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য হলো পিতৃতন্ত্র নারী নিপীড়নের জন্য একটি পৃথক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে যে আমাদের জানা বোঝা রয়েছে তা স্থান-কাল নির্ভর। অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় পিতৃতন্ত্র তার নির্দিষ্ট সমাজ প্রগতির উপর নির্ভর করে রূপ পরিগ্রহ করে। এবং শাসক শ্রেণী পিতৃতন্ত্রকে তার নিজের স্বার্থে প্রয়োজনমতো কাজে লাগায়। ফলে রাষ্ট্রই পিতৃতন্ত্রকে সমাজব্যবস্থায় বৈধতা দেয়, ফলত সাধারণ পুরুষ এবং শাসক পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা এখানে সমীচিন। শুধুমাত্র প্রজনন-গত ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় নারীবাদীরা বিভিন্ন মতামত রেখেছেন। কিন্তু তাতে যেন সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাকে খাটো করেই বলা হয়েছে। আসলে প্রশ্নটি হচ্ছে, উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি মালিকানার দখলের উচ্ছেদ ছাড়া কি মেয়েদের আদৌ মুক্তি সম্ভব?

মেয়েদের শোষণতন্ত্রটি আসলে জোড়া আছে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে। বিপুল পরিমাণ মেয়েরা যারা সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের সাথে দৈনন্দিন লড়াই-এর পাশাপাশি পিতৃতন্ত্রের উচ্ছেদের লড়াই চালাচ্ছেন, তাদের লড়াইয়ের সাথে তত্ত্বগত-আত্মিক-সংগ্রামগত মিলন ছাড়া সামগ্রিক নারীমুক্তির বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

সাক্ষাৎকার

নকশাল আন্দোলনে নারী

সাক্ষাৎকার : কৃষ্ণা বন্দোপাধ্যায়

অনীক *ঃ সমাজের অর্ধেক নারী। কিন্তু রাজনীতিতে নারীর উপস্থিতি ও প্রভাব বেশ কম। আমরা আপনার কাছে জানতে চাইছি নকশালবাড়ি আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা। জানতে চাইছি, নকশালবাড়ি আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে কী পরিবর্তন এলো— কেননা একটা বড় সামাজিক আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসাই স্বাভাবিক। অন্য একটা দিকও জানতে চাইব। আজকে পশ্চাৎদৃষ্টি মেলে দেখা যেতে পারে যে এ বিষয়ে ঐ আন্দোলনে কী খামতি ছিল। প্রাথমিকভাবে এই দুটো দিক মনে হয়েছে। আপনি অন্যান্য দিক নিয়েও বলবেন।*

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রথমত, আমরা যখন রাজনীতিতে আসি তখন আমরা ছাত্র। যখন রাজনীতিতে এসেছি, আমরা কেউই মেয়ে হিসেবে রাজনীতিতে আসিনি। সবাই ছাত্র হিসেবেই এসেছি। ছাত্র হিসেবে রাজনীতি করতে করতে পরে এক সময়ে কখনও কখনও মনে হয়েছে যে একটু পার্থক্য করা হচ্ছে এই কারণে যে আমরা হয়তো মেয়ে বলেই।

একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দিই। ১৯৭০-এ এক সময় আমার নিজের স্কুলে একসঙ্গে লেনিন জন্মশতবর্ষ এবং গান্ধী জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম যে এই গান্ধী-লেনিনকে এক করার বিরুদ্ধে ক্লাস রুমে, লাইব্রেরিতে ওয়ালিং করব। হেডমিস্ট্রেস-এর ঘরেও ওয়ালিং হবে। মাও-এর ছবি। শ্লোগান দেব। এরকমই একটা পরিকল্পনা ছিল। আমরা করেও ছিলাম। তখন তো মাও-এর টেনসিল পাওয়া যেত— আমরা সেই টেনসিল দিয়ে মাও-এর ছবি এঁকেছিলাম। সবাই তো অন্যদিকে, যেখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, সেখানে ব্যস্ত ছিল। ফলে প্রতিটি ঘর, লাইব্রেরি ইত্যাদি সমস্ত জায়গাটাই বলা যায় আমাদের দখলে চলে আসে। আমাদের কেউ একবারের জন্যও আটকায়নি। প্রতিটি ঘরে মাও-র ছবি, কিছু শ্লোগান লেখা হল। এমনকি হেডমিস্ট্রেস-এর ঘরে মাও-এর ছবি এবং সেই সময়কার যে সব চালু শ্লোগান, যেমন ''সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন''। যুবকদের উদ্দেশে মাও-এর আহ্বান, ''সকাল আটটা-নটা-র সূর্য'' ইত্যাদি। ''যে যত পড়বে সে তত মূর্খ হবে''— এটাও লিখেছিলাম মনে আছে। তখন সাধারণভাবে লেখা হতো, ''বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'', কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, সম্ভবত ঠিকই মনে পড়ছে যে আমরা লিখেছিলাম, ''বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস''। এই সব তো করলাম। গঙ্গা ছিল আমাদের স্কুলের পাশেই। আমাদের সারা হাত-গায়ে ভুষো কালি লাগা। তখন ভুষো গুলে ওয়ালিং হতো। কোনও মতে হাত লুকিয়ে আমরা শ্লোগান দিতে দিতে গঙ্গার দিকে চলে গেলাম। একটা বোমা ফাটানোর পরিকল্পনাও ছিল— কিন্তু সেটা আর করা হয়নি। তবে আমরা চলে আসার আগে হেডমিস্ট্রেস-এর ঘরের টেবিলে একটা লাল পতাকা রেখে এসেছিলাম।

আমরা যখন অনুষ্ঠানের পাশ দিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছি তখন স্কুলের দিদিমণিরা আমাদের দেখতে পান, চিনতে পারেন এবং সচকিত হয়ে পড়েন। কিন্তু এত কিছু ঘটার পরও তাঁরা পুলিশে খবর দেননি। আমরা ঐ জায়গা পেরিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গঙ্গায় হাত-পা ধুয়ে চলে যাই।

সময়টা ১৯৭০। তখন চারিদিকে ইস্কুলে নানা রকম অ্যাকশন হচ্ছে। এই সমস্ত অ্যাকশন প্রায় সবই করছে ছেলেরা, কিন্তু মেয়েদের এই সমস্ত কাজ করার কোনও খবর নেই। ফলে শহরাঞ্চলে মেয়েদের কোনও কাজই নেই। আমরা বারবার পার্টিকে জানাচ্ছি, আমরা মেয়েরা তা হলে কী কাজ করব। কিন্তু এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেতৃত্ব থেকে আসছে না।

তখন আমরা মেয়েরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এই প্রোগ্রামটা হাতে নিলাম। যদি ছেলেরা এই জাতীয় কাজ করতে পারে তবে আমরা কেন করতে পারবো না? তারপর আমরা যখন এটা করলাম, নেতৃত্বকে জানালাম তখন ভাবলাম এই খবরটা পার্টির কাগজে বেরোবে। ছেলেদের অ্যাকশনের খবর তখন প্রায় নিয়মিত পার্টির কাগজে বার হতো। আর কাগজে নাম দেখতে কার না ভালো লাগে! এত বড় ঘটনা ঘটল, কিন্তু কাগজে তা বার হলো না। উল্টে আমরা সমালোচিত হলাম— নেতৃত্ব আমাদের বলল, কে তোমাদের এই কাজ করতে বলেছিল? এটা করা মোটেও ঠিক হয়নি, তোমরা নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে এই কাজ করেছ। এইভাবে সমালোচিত হলাম।

তখন আমাদের মনে হলো কোথাও বোধহয় একটা পার্থক্য ঘটছে। নিজেদের উদ্যোগে প্রোগ্রাম করার পর সেই দিন প্রথম আমরা 'মেয়ে' হলাম। ছেলেরা তো এই জাতীয় কাজ করে যথেষ্ট উৎসাহ পেল, আর আমরা সমালোচিত হলাম। তাহলে কি মেয়ে হিসেবে আমরা উদ্যোগ নিয়ে কোনও কাজ করতে পারব না? তাহলে কি আমাদের কাজ শুধুই ক্যুরিয়ার বা পত্রবাহকের কাজ?

আমাদের কিন্তু সেই সময়ে করার মতো কাজ ছিল। আমাদের একটা সিরিয়াস কাজ দেওয়া হয়েছিল। মেডিকেল কলেজ-গুলোতে গিয়ে নার্সিং ট্রেনিং নেওয়া। আমরা সেই প্রশিক্ষণ খুব ভালোভাবেই নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে সেই প্রশিক্ষণ পার্টির পক্ষে খুবই উপকারে লেগেছিল। কিন্তু এই ট্রেনিংটা কেবলমাত্র মেয়েদেরই দেওয়া হয়েছিল, পুরুষদের নয়। ভাবটা ছিলো এই রকম, যুদ্ধ করবে ছেলেরাই, আর আমরা মেয়েরা তাদের সেবাশুশ্রূষা করে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেব।

এই যে ধারণা, এটা আমাদের পার্টির মধ্যে ছিল। আমাদের পার্টির কমরেডদের মধ্যেও এই ধারণা খুবই প্রবল ছিল।

অনীক : *এই ধারণাটি কি আমাদের পুরোনো আমলের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারণার অবশেষ? ঐ আন্দোলনের নেতাদের বা নারী বিপ্লবীদের লেখায় এই ধারণার দেখা পাওয়া যায়।*

কৃষ্ণা : একদম। এটা ভীষণভাবেই মনে হয়। সেই সময় তো মেয়েরা নারী বিপ্লবী হিসেবে আসত। কিন্তু আমরা তো যোগ দিয়েছিলাম ছাত্র হিসেবেই। তখন আমরা বুঝলাম, আমাদের জন্য একটা আলাদা জায়গা আছে। মানে পার্টির মধ্যেও রয়েছে ঘর আর বাহির। মেয়েরা যেন শুধু চা বানাবে, সেবা করবে। দেখোনি সেই রক্তদান শিবিরের ঘোষণাগুলোয়? রক্তদান করলে মা ফিরে পাবে ছেলেকে, বোন ফিরে পাবে ভাইকে। রক্তদান যেন প্রয়োজন ভাই বা বর বা ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য। ঠিক এই মানসিকতা থেকেই যেন আমাদের জন্য কাজ নির্দিষ্ট হয়েছিল এই নার্সিং ট্রেনিংটা, যাতে আমাদের সেবা-যত্নে কমরেডরা (ছেলে /ভাই/বর) আবার যুদ্ধে ফিরে যেতে পারে।

অনীক : *আপনারা যে প্রোগ্রামটা নিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে কি কোনও রাজনৈতিক সমালোচনা হয়েছিল, নাকি কেবল মেয়েরা কর্তৃপক্ষ, মানে পার্টির নেতৃত্বকে, না জানিয়ে উদ্যোগ নিয়ে প্রোগ্রাম নিয়েছিল, কেবল সেই কারণেই সমালোচনা হয়েছিল?*

কৃ ঃ আমাদের প্রোগ্রামটাই ছিল গান্ধী আর লেনিনকে এক আসনে বসানোর বিরুদ্ধে। তখন পার্টির নেতা সরোজ দত্ত তাঁর লেখায় লিখেছেন যে জীবনকালে যে সব নেতার তীব্র সমালোচনা করা হয়, মৃত্যুর পর তাঁদের দেবতা বানিয়ে পুজো করা হয়। আমরা মনে করি লেনিন বিপ্লবী আর গান্ধী সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তাই যিনি সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করতে চান আর যিনি সাম্রাজ্যবাদের দালালি করতে চান, এই দুজনের জন্মদিন একই মঞ্চ থেকে পালন করা যেতে পারে না— এই ছিল আমাদের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থান। তাই মনে হয় না আমাদের বিরুদ্ধে ভুল রাজনৈতিক কাজের জন্য কোনও সমালোচনা হয়েছিলো।

অনীক : *শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে সমালোচনা করা হয়েছিল কি?*

কৃষ্ণা : নাও হতে পারে। কেননা সরোজ দত্ত বারবার লিখেছেন, স্কুল-কলেজ ছেলেরা যে সব কাজ করছে, মূর্তি ভাঙা নিয়ে যা হচ্ছে, তার সবগুলি সর্বদা পার্টির অনুমতি সাপেক্ষে হচ্ছে এমন নয়— অনেকেই স্ব-উদ্যোগে এই সব ঘটনা ঘটাচ্ছেন। তার জন্য শৃঙ্খলাভঙ্গ বা সমালোচনার বদলে সমর্থনই জুটেছে। যেমন হেয়ার স্কুলে যখন লাল পতাকা তোলা হয়, সেটা ঘটে একজন কমরেডের ব্যক্তিগত উদ্যোগে— তার জন্য তো কোনও সমালোচনা হয়নি। কিন্তু আমরা অর্থাৎ মেয়েরা যখন স্ব-উদ্যোগে এই কাজ করলাম তখন সমালোচিত হলাম।

অনীক : *কিন্তু মেয়ে হিসেবে রাজনৈতিক আন্দোলন সক্রিয় হওয়া মানেই তো সমাজে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসার বিষয়টি রয়েছে। সেখানে পার্টির কাছে মেয়ে হিসেবে তো গ্রহণযোগ্যতা ছিল?*

কৃষ্ণা : আগেই বলেছি আমরা এসেছিলাম প্রধানত ছাত্র হিসেবে। সেইভাবে দেখতে গেলে সেই গণ্ডিটা অনুভব করিনি। সেই সময় দলে দলে প্রচুর ছাত্র যোগ দিয়েছিল ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে প্রচুর মেয়ে কিন্তু সেই সময় এই আন্দোলনে এসেছিল।

অনীক : *কী কারণে মেয়েরা এই সময় আন্দোলনে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন? সেটা কি সাধারণভাবে ঐ সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য, নাকি অন্য কিছুর টানে?*

কৃষ্ণা : অবশ্যই প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য যেটা সবাইকেই আকৃষ্ট করেছিল। অন্য একটা বিষয়ও ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য এবং অনুশীলনের চেয়ে নকশালপন্থী ধারার বক্তব্য এবং অনুশীলন মনে হচ্ছিল একটু অন্যরকম, আলাদা। তারপর ছোটো ছোটো পুস্তিকা আসতে শুরু করল আমাদের হাতে। সেই পুস্তিকাগুলো পড়ে সহজেই বুঝতে শুরু করি যে এরা ঠিক অন্যদের মতো নয়— অন্য কিছু বলে। কৃষি বিপ্লব ঠিক কী ভাবে হবে, তার বিস্তারিত কিছুই তখন মাথায় নেই। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যে নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে তখন কেবল সিপিআই(এমএল) পার্টিই কাজ করছিল না, অনেক বিপ্লবী গোষ্ঠীও ছিল। যেমন 'চিন্তা' গোষ্ঠী। 'দক্ষিণ দেশ' প্রকাশিত অহল্যা সাঁতরার লেখা 'গরিব ঘরের মেয়েরা' পুস্তিকা ছিল। সেই পুস্তিকায় খুব সুন্দর ভাবে চারটি শোষণের কথা লেখা ছিল। মেয়েদের প্রতি যে মেয়ে হিসেবে একটা আলাদা শোষণ ছিলো, সে কথাটা এই পুস্তিকায় লেখা ছিল। সেটাও আমাদের খুবই আকৃষ্ট করেছিলো। কিন্তু আন্দোলনে আসছি মূলত ছাত্র হিসেবেই। এই বয়সটাই হলো ভালো কাজ করার বয়স, আমরা সেই দিকটি থেকেই আসছি। আমরা প্রথমে এসেছিলাম এই জায়গা থেকে, পরে আমরা এই বইগুলি হাতে পাচ্ছি।

তারপর হাতে আসছে মাও-এর পুস্তিকাগুলি। সেখানে দেখছি মাও ছাত্র-যুবদের জন্য যা বলছেন। তখন এই কথাগুলিই আমাদের কাছে আসছে। প্রথমে রাজনীতিতে এসেছিলাম— ঘরবাড়ি ছেড়েছি তারপর। সেই সময় অনেকেই এইভাবেই রাজনীতিতে এসেছিলেন— সবাই বুঝেছিলেন এরা কিছু আলাদা কথা বলছে।

আমি কলেজের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম, জীবনে ঐ একবারই। মনে আছে আমি মাত্র সাতটা ভোট পেয়েছিলাম। আমি তখন প্রথম বর্ষের নতুন পড়ুয়া, কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলাম। সবাই ভেবেছিলো যে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হবো কিন্তু পেয়েছিলাম মাত্র সাতটা ভোট। সবার যে মূল ধারার সব কিছুর ওপর ঝোঁক থাকে তখন বুঝেছিলাম। সেই সময়ও মূল ধারার বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই ছিলেন, আমরা ছিলাম সংখ্যার দিক থেকে খুব কম।

কেন আলাদা সেটা বোঝানোর জন্য একটা ঘটনা বলছি।

ভোটের দিনই আমি ক্লাসরুমের বোর্ডে একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাতে ছিল একটি তীর। সেই তীরটা একটি বৃত্তের মধ্যে ছিল। নকশালবাড়ি-কলকাতা-দিল্লি-পেন্টাগন। আমাদের চিন্তার এটা একটা প্রতিফলন আর কি!

অনীক : *অনেকেই বলেছেন যে এই আন্দোলনে স্থানীয় চরিত্র অতিক্রম করে একটা বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিত ছিল। সর্বদাই মনে হতো যে স্থানীয় আন্দোলনটি একটি অনেক বড় আন্দোলনের অঙ্গ।*

কৃষ্ণা : একদম। আমারও তাই মনে হতো তখন। তখন আন্তর্জাতিকতার প্রাসঙ্গিকতাও ছিল। নইলে তখন সদ্য কলেজে ঢুকেছি, মাথায় ঘুরছে পেন্টাগন দখল। শত্রুর সঠিক ঠিকানা চেনার উপায়টা কিন্তু আমাদের এই রাজনীতি দিয়েছিল। নকশালবাড়ির এই যে আন্দোলন, তা আর নকশালবাড়িতে সীমাবদ্ধ রইল না। একেবারে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করল। নকশালবাড়ির সঙ্গে আগের অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে এই তফাৎটা একেবারে সরাসরিভাবেই ছিল। এই সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়েছিল এই সময়ে এইটাই সবচেয়ে ভালো কাজ। আজও আমি মনে করি ঐ কাজটাই সবচেয়ে ভাল কাজ ছিল। তার জন্য কোনও অনুশোচনা নেই। কী পেলাম, কী পেলাম না, ওটা অপ্রাসঙ্গিক। যা করেছি ঠিকই করেছি। ঠিক এই কারণেই আমি খুব গর্ব অনুভব করি।

এটাও একই সঙ্গে ঠিক যে এই আন্দোলন প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছিল। এই প্রতিবাদ বাড়িতেও প্রসারিত হয়েছিল। আমাদের পরিবার যৌথ পরিবার। মা-কাকিমাদের সারাদিন বাড়িতে পরিশ্রম করতে হতো। আমরা তখন বাবা-কাকা-জ্যেঠাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি।

বাবা-রা অফিস করে, তাস খেলে, আড্ডা দিয়ে ফিরলেন, সারা দিনের পরিশ্রমের পর মা-রা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন সেই তোলা উনুনে রান্না। ঘুম থেকে উঠে মায়েদের তখন উনুনে খাবার গরম করে দিতে হতো। বাবারা তাস খেলে বিনোদন করছেন। তখন দূরদর্শন আসেনি। মা-দের জীবনে বিনোদন বলতে কিছুই নেই। হয় ক্লান্তিতে তারা শুয়ে পড়ছেন অথবা নিজেদের মধ্যে গল্প করে বিনোদন করতেন। এই অত্যাচারগুলো আমরা দিনের পর দিন দেখেছি। আমি এগুলোরও খুব প্রতিবাদ করতাম। সেই সময় সবাই বাড়ির জ্যেঠামশাইকে খুব ভয় করতাম— হিটলার বলে ভাবতাম। তিনি বলতেন, এই মেয়ে বাড়িতে সর্বনাশ ডেকে আনবে। পাড়ায় কোনো অসঙ্গতি দেখলে প্রতিবাদ করতাম। এইভাবেই একটা প্রতিবাদী কণ্ঠ তৈরি হল। এই পরিক্রমা শুধু আমার একার নয়। আমি দেখেছি ঐ সময় যাঁরা (মেয়েরা) এই রাজনীতিতে এসেছেন, তাঁদের যাত্রাপথও প্রায় একই ধরনের।

অনীক : *এটা কি বলা যায় যে এই আন্দোলন মেয়েদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ উঠে আসার একটি সামাজিক ভিত্তি নির্মাণ করে দিয়েছে?*

কৃষ্ণা : নিঃসন্দেহেই বলা যায়। মেয়েরা হৃদয়ঙ্গম করে যে প্রতিবাদ করা যায়, প্রতিবাদ করা সম্ভব। এর আগে আন্দোলন হয়েছে, মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরিয়েছে, বড় স্ট্রাইকও হয়েছে, কিন্তু তারপর যে যার বাড়িতে ঢুকে গেছে।

অনীক: *এটা তো একটা পরিবর্তন— আন্দোলনের সময়টুকুর বাইরে নিজস্ব জীবনে রাজনীতি নিয়ে জীবন যাপন...*

কৃষ্ণা : হ্যাঁ। এর আগে যখন আমরা আন্দোলনে থেকেছি, স্ট্রাইক করেছি। তারপর আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে যে যার মতো হয়ে গেছি। কিন্তু এখন আমরা প্রত্যেকটি কাজে এই আন্দোলনের ধারণা নিয়ে প্রভাবিত হয়েছি, কী ঘরে, কী ঘরের বাইরে। ঘরে-বাইরে যে কোনও অবস্থাতেই প্রতিবাদের মতো কোনও ঘটনা বা অবস্থা তৈরি হলেই প্রতিবাদ করতাম। প্রত্যেকটি কাজেই এই রাজনীতির আবহে ভাবতাম। আগের মতো ভাগ ভাগ করে ভাবতাম না। আগের ভাবনাগুলো আস্তে আস্তে সরে গিয়ে এই ভাবনা তার স্থান নিতে শুরু করল। সবাই যেটা করে আমরাও আগে সেটাই করতাম। অবসর সময়ে বই পড়া, সিনেমা দেখা ইত্যাদি। এইবার শুরু হল এইসব কাজগুলোকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। সিনেমা-নাটক অন্যভাবে দেখা। এমনকি গানও আমরা অন্যভাবে শুনতে শুরু করলাম। আমরা তখন গানের মধ্যে লাইন খুঁজে পেলাম যেখানে মেয়েদের বাজে ভাবে দেখছে এবং তার সমালোচনা শুরু করলাম নিজেদের মধ্যে।

অনীক: *অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে একটা নতুন বোধের জন্ম হওয়া শুরু হচ্ছিল।*

কৃষ্ণা : হ্যাঁ, একটা নতুন বোধের উন্মেষ হচ্ছিল। এই রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক চারিত্রিক শুদ্ধি ঘটেছে— তার মধ্যে এই দৈনন্দিন জীবনে রাজনীতির আবহে সব কিছুর বিচার করার বিষয়টিও পেয়েছি।

অনীক: *অনেক কিছুই তো বই থেকে পেয়েছেন বললেন, অনেক বই-পুস্তিকা তখন হাতে আসতে শুরু করেছে। এই বই-পুস্তিকার বাইরে নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য আরও কী কী অন্যান্য সচেতন পার্টির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল?*

কৃষ্ণা : পার্টি গঠনের প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু পাঠচক্র সংগঠিত করা হত। এছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় নাটকের মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা হত। নাটক আগেও হয়েছে। আমিও ছোটো থেকেই পাড়ায় নাটক করতাম। ষাটের দশকে যাঁরা সিপিএম করতেন, আমি তাঁদের সঙ্গে নাটক করেছি। সেই সময়ে আমি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'হারানের নাত জামাই' নাটক করেছি। তখন এইসব নাটক করার চল ছিল। এখন আমাদের হাতে চীনের বই, চীনের নাটকগুলো আসতে শুরু করল। 'লাল লণ্ঠন' নাটকটা করেছি বলে আমার মনে পড়ছে। লাল লণ্ঠনে আমি ঠাকুমা-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম।

অনীক: *যে সব ছেলে-মেয়েরা এই আন্দোলনে এসেছিলেন, তাঁদের বাড়ি বা প্রতিবেশীদের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়েছিল?*

কৃষ্ণা : আমি আমাদের বাড়ি এবং আমাদের পাড়ার বিষয়ে বলতে পারি। আমাদের পাড়াতে যে অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এমন নয়। আমি আর আমার ভাই-রা ছেড়েছিলাম। পরে আরও কয়েকজন ঘরবাড়ি ছাড়ে। কিন্তু পুরো পাড়াটিই আমাদের সমর্থক হয়ে পড়ে। বেশ মনে পড়ে বেশ কিছুদিন ঐ জায়গাটাতে পুলিশ ঢুকতে পারত না। পুলিশ বা প্রশাসনের এতটা কব্জা না থাকায় আমরা ঐ জায়গাটাকে মুক্তাঞ্চল বলতাম— কোনও কোনও অর্থে জায়গাটা তাই-ই ছিল। তখন আমাদের বাড়ির পেছনে বিরাট বাগান ছিল। (এখন সেখানে কিছু কিছু কলোনির পত্তন হয়েছে)। বাগান ছিল বেশ কয়েক মাইল, সেই বাগান ধরে অনেক দূর চলে যাওয়া যেত। ঐ অঞ্চলে বোমা বাঁধা থেকে শুরু করে সব কিছুই হতো। প্রায় পুরো হুগলি জেলাশহর থেকে সবাই এখানে এসেই নিরাপদে এইসব কাজ করতে পারত। এই জায়গাটাই ঘাঁটি ছিল বলা যায়।

অনীক: *শহরাঞ্চলে কী ধরনের কাজকর্ম হত? মেয়েরা সাধারণত কী ধরনের কাজকর্ম করতেন?*

কৃষ্ণা : মেয়েরা সাধারণত এবং প্রধানত ক্যুরিয়রের কাজ করতেন। চিঠিপত্র ঠিক স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজই মেয়েরা করতেন। অবশ্য ছেলেরাও ক্যুরিয়ারের কাজ করেছেন। পার্টিতে আমি হুগলি থেকে কলকাতায় যোগাযোগ রাখতাম। তারপর মেডিকেল সাহায্য। আমরা মেডিক্যাল হাসপাতালে ছেলেদের হোস্টেলে অবাধে ঢুকতে পারতাম। জুনিয়ার ডাক্তার বন্ধুরা ট্রেনিং দিতেন।

অনীক: *এই যে মেয়েরা অবাধে ছেলেদের হোস্টেলে যেতে পারছে, কোনও সমস্যা হচ্ছে না, এও তো সামাজিক উত্তরণ...*

কৃষ্ণা : বটেই তো! ইদানিং কালের মধ্যে শুনিনি। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এমনটা ঘটেছিল— এমনকি স্বামী-স্ত্রী সেজেও অনেকে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছে।

অনীক: *মেডিকেল সাহায্য ছাড়া আর কী কী কাজ ছিল মেয়েদের? আপনি আর কী কী ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন?*

কৃষ্ণা : আমি মেয়েদের নিয়ে আলোচনা সভা চালাতাম। এমনকি যাঁরা গৃহবধূ আমরা তাঁদের জন্যও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতাম। মেয়েদের মধ্যে এই কাজ করার জন্য আমাদের সমর্থন বেড়ে যায় বহুগুণ কারণ বাড়িতে আশ্রয় তো দেবেন মেয়েরাই। আলোচনার সময় আমরা বই সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। একটা ছিল আমেরিকান নিগ্রো মেয়ে বারবারা-র লেখা কবিতা। কবিতাটা *দেশব্রতী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কার নামে পাঠাচ্ছ নাপাম বোমার বিষাক্ত গ্যাস। যারা ভালোবাসা ছাড়া জানে না কিছুই।' তখন ভিয়েতনামে আমেরিকা প্রচুর নাপাম বোমা ফেলছে। এইসব বলতে গেলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আর মেয়েরা আমাদের বলছে, কী দিয়ে তৈরি এসব মানুষরা। তোমরাও বুঝি এগুলিই কর। বোঝো, তারা আমাদেরও সেই জায়গায় বসাচ্ছে। তারপর ভ্যান ত্রয়-এর গল্প বলতাম। এই সমস্ত কথা বলে মেয়েদের কাছ থেকে ভীষণ সাড়া পেতাম।

অনীক: *মেয়েদের কাছ থেকে কেন এমন সাড়া পেতেন বলে আপনার মনে হয়?*

কৃষ্ণা : এরকম ঘটনা তাদের কাছে আগে কখনও যায়নি। আমরা যারা এগুলো মেয়েদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, আমরা দেখছি মেয়েরা এগুলো জানতে শুনতে চায়। মানুষ এমনিতেই হয়ত 'মিথ'-কে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়। বিদ্যাসাগরের সেই সাঁতার দিয়ে দামোদর পার হওয়ার কথাই ধরো না। এটা 'মিথ' হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এটা শুনতে ভালোবাসে, বিশ্বাসও করে। আশ্চর্য হল এই সমস্ত 'মিথ'গুলো কোনও ঠাকুর-দেবতা কেন্দ্রিক নয়, মহামানব কেন্দ্রিক নয়। এটা অন্যরকম, তারা যেটা দেখতে অভ্যস্ত, এটা তার বাইরে। তাই তার ভালো লাগছে।

অনীক: *যে মহিলাদের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তাঁদেরকে নারী মুক্তি কীভাবে হতে পারে সে নিয়ে কী কিছু বলা হত?*

কৃষ্ণা : অবশ্যই। সেই কথা দিয়েই তো শুরু করতাম। সংসারে অবদমন নিয়ে আলোচনার শুরুতে প্রথমে তারা মুখ খুলত না। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই তাদের ওপর নানান পীড়ন, অবদমনের কথা বলত। জানতে চাইত, আসবে কি এমন দিন, যখন এগুলো থাকবে না।

অনীক: *যে সমস্ত গৃহবধূর মধ্যে আপনারা কাজ করতেন, তাঁরা তো যুগ যুগ ধরে এই অবদমন দেখে এসেছেন, নিজেরাও এই অবদমনের শিকার। কেবল আপনাদের মুখের কথায় কীভাবে তাঁরা আস্থা স্থাপন করছেন? আপনার কী মনে হয়?*

কৃষ্ণা : আস্থা অর্জনের জন্য আমরা বিজয়ের গল্পগুলো করতাম। তাঁদের বলতাম, চীনে এটা কেমনভাবে সম্ভব হয়েছে। আমাদের তখন এই সুবিধাটা ছিল, আমরা চীনের উদাহরণ দেখাতে পারতাম। এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে এটা এত দুঃখের সময়, ওদের হাতে দেখানোর মতো কিছুই নেই। আমরা বলতাম, ঐটুকু একটা দেশ ভিয়েতনাম, সেও কিন্তু অতবড় একটা দেশ মার্কিন দেশের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং জিতছে। তাহলে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া যায়, জেতা যায়, তোমরাও পারবে।

অনীক: *এই সমস্ত আলোচনায় কি কেবল চীন-রাশিয়া-ভিয়েতনামের কথাই আসত? ভারতে মেয়েরা কীভাবে লড়াই করছেন সে বিষয়ে কি কিছু বলা হত?*

কৃষ্ণা : নিশ্চয়ই বলতাম। বলতাম সব দিকেই লড়াই হচ্ছে। নকশালবাড়ির কথা বলতাম— শহিদদের অধিকাংশই নারী। বাবুলাল বিশ্বকর্মা শহিদ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গী মহিলা পূর্ণক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীর জীবন বেছে নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন, একথাও বলতাম। এইসব উদাহরণ ছাড়াও শ্রীকাকুলামের মেয়েদের সংগ্রামী ভূমিকার উদাহরণ ছিল। যেমন নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি, সরস্বতী আম্মা প্রমুখ।

অনীক: পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের উদাহরণ আসত না, সেই সময় তো মেয়েরা ঘর ছেড়ে রাজনৈতিক কাজে সর্বক্ষণের জন্য যোগ দিচ্ছেন?

কৃষ্ণা : হ্যাঁ। সেগুলোও বলা হত। আমি নিজেই সেই সময়েই ঘর ছেড়েছি।

অনীক: দ্রোণাচার্য সম্পর্কে কিছু বলুন, বিশেষত এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে...

কৃষ্ণা : দ্রোণের কথা বলি। দ্রোণ প্রথম থেকেই গ্রামে কাজ করে। একদিন আমাদের কলেজের ক্যান্টিনে একজন গণসঙ্গীত গায়ক বললেন যে কেউ কি এখানে আছেন যিনি গ্রামে গিয়ে কাজ করতে উৎসুক? দ্রোণ সঙ্গে সঙ্গে বলে যে আমি যাব। সেই দিন ঠিক হল আর তার পরের দিন দ্রোণ গ্রামে চলে গেল। দ্রোণ গ্রামে গিয়ে আমাকে ডাকল। দ্রোণ জেল থেকে পালিয়েও প্রথমে আমার বাড়িতেই আসে, বলে তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। পিসিমা হইচই করে বলেন, যে এই বাড়ি থেকেই বুঝি দ্রোণ আবার ধরা পড়ে যাবে। ও গ্রামে গিয়ে আমাকে একটা ছোট্ট চিরকুট পাঠিয়ে লেখে যে তুমি চলে এসো। সঙ্গে আনবে একটা কাপড়, সাবান আর প্রয়োজন মতো সিঁদুর। সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত বাড়ি থেকে একটা মেয়ের সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হয়ে যাওয়া, সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি বাড়িতে বললাম যে, পুলিশের নজরে আমি রয়েছি। আমি বাড়িতে থাকা মানে পুরো বাড়িটাই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ফলে আমার বাড়ির বাইরে থাকাই বাড়ির পক্ষে মঙ্গল। তার আগে জ্যেঠামশাই-এর সঙ্গে আমার একটা বাদানুবাদ হয়। জ্যেঠামণি আমায় বলেছিলেন যে, তুমিই সবাইকে নষ্ট করছ। আমি বললাম, আমি বাড়ি ছাড়লে কি বাড়ির সুবিধে হয়? তখন দ্রোণ খবর পাঠিয়েছে যে, যে কোনও দিন আমাকে গ্রামে পৌঁছুতে হবে। আমি জ্যেঠামণিকে বললাম, আমি তাহলে বাড়ির বাইরে যাচ্ছি। উনি বললেন, তবে তাই হবে। উনি অবশ্য এমনিই বলেছিলেন, কিন্তু ওটাকে মেনে নিয়ে আমি বলি যে আমি তাহলে চলে যাব।

চিরকুট আসার পর আমি পিসিমাকে বলি যে, আমি ধরা পড়লে অন্য অনেকে বিপদের মুখে পড়বে, আমার বাড়ি তো পড়বেই। তাই আমাকে বাড়ি ছাড়তেই হবে। সেইদিন রাত তিনটের সময় বাড়ি ছেড়েছি, আর ফিরেছি একদম জেল থেকে ছাড়া পেয়ে। এর মধ্যে আর বাড়ি যাইনি।

গ্রামে গিয়ে আমার ঠাঁই হয় একটি আদিবাসী পরিবারে। সেই সময় দেখেছি গ্রামগুলোতেও আমাদের সমর্থন বাড়ছে। আমি আর দ্রোণ এক জায়গাতেই থাকতাম, তবে তার জন্য কোনওদিন সিঁদুর পরতে হয়নি। গ্রামে কেউ এসব প্রশ্নই করেনি। দ্রোণ সিঁদুর নিয়ে যেতে বলেছিল মধ্যবিত্ত চিন্তা থেকে। এটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায়নি। আমি বহুদিন এইভাবে গ্রামে ছিলাম, এনিয়ে কোনও অসুবিধেই হয়নি।

অনীক: এটা কি আদিবাসী গ্রাম নাকি যে কোনও গ্রামেরই বৈশিষ্ট্য?

কৃষ্ণা : না। সব গ্রামেই এই একই ঘটনা ঘটতে পারে। আমি শুধু একবারই সচেতনভাবে সিঁদুর ব্যবহার করেছি। তখন পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমার চেহারা পরিবর্তনের তাগিদে আমি সিঁদুর পরি। গ্রামে আমাদের কাজ ছিল, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে লুকিয়ে থাকা। রাত তিনটের মধ্যে দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢোকা। আবার রাত্রে বার হওয়া। রাতেই জমায়েতগুলো হত, সবাইকে ডাকা আর আলোচনা করা। আদিবাসী সমাজে মেয়েরাও সমানে কাজ করত। ওদের রাত হয়ে যেত সন্ধ্যের সময়ই।

অনীক: এই আন্দোলন গ্রামের মেয়েদের কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

কৃষ্ণা : গ্রামের মেয়েদের এই আন্দোলন ভীষণভাবেই প্রভাবিত করেছিল। তারা চেয়েছিল জোতদারের ঐ সাংঘাতিক অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে। এই কারণেই গ্রামগুলিতে আমরা তাড়াতাড়ি এবং এত বেশি সংখ্যায় পেয়েছিলাম। গ্রামগুলিকে আবার হারালাম ঐ কারণেই। জোতদার খতম শুরু করতেই গ্রামে তীব্র আক্রমণ নেমে এল। এই আক্রমণের প্রধান শিকার গ্রামের অধিবাসীরা। এককেটা জোতদার খতম হচ্ছে আর চাপটা এসে পড়ছে গ্রামের মানুষের ওপর। আমরা কিন্তু তখন আর গ্রামে থাকতে পারছি না। হয় আমরা ধরা পড়ে গেছি, নয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছি।

আমরা গ্রামে প্রথম দিকে ভালো কাজই করতাম। স্কুল করতাম, সেখানে ভালো পড়াশুনো হত। কিন্তু তখন খতম করার নির্দেশ এসে গেছে। তাই খতম এবং তারপর রাষ্ট্রের বাহিনীর চাপ, এসবই গ্রামের মানুষ বিশেষত মেয়েরা সহ্য করেছে।

আমি যে গ্রামে থাকতাম, সেখানে ঐ আদিবাসী পরিবারের মধ্যে গ্রামের জোতদার একদিন আমাকে দেখে ফেলে। জোতদার বলে এই মেয়েটা কে রে তোদের বাড়িতে, এত ফর্সা! এই বিপদের সময় স্থানীয় মেয়েদের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিলাম। ঐ বাড়ির দ্বিতীয় মেয়েটি একটি মিশনারি স্কুলে পড়ত। ও মুহূর্তের মধ্যে জবাব দিল, ওতো আমার স্কুলের বন্ধু, বেড়াতে এসেছে! আমার সঙ্গে হোস্টেলে থাকে, আমার বাড়িতে বিয়ে, তাই এসেছে। এইভাবে সে যাত্রা বিপদটা কাটল। তখন ঐ পরিবারের সবাই বলল, তুমি বাইরে ঘোরাঘুরি কর, তুমি কেন লুকিয়ে থাকবে, তাতে লোকের সন্দেহ হবে।

আমি তারপর ওদের গ্রামের হাটে যাওয়া শুরু করলাম। এই ঘোরাঘুরির ফলে চেনা বাড়ল, আমি নতুন নতুন শেল্টার জোগাড় করতে পারলাম। যে বাড়িতে থাকতাম, তাদের মা-কে আমিও মা বলতাম। তিনিই আমাকে বিভিন্ন বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তিনিই আমাকে বলতেন তোকে একটা বাড়িতে নিয়ে যাব, সেখানে তুই ঐসব গল্প করবি। বাড়িগুলো সাধারণত অন্য এলাকায় হতো,

ফলে অন্য এলাকাতেও শেল্টার বাড়তে শুরু করে।

কিন্তু যে বোনের সূত্রে আমি গ্রামে গেছি, তার মাথায় রয়েছে পার্টির লাইন। সে আন্তরিকভাবেই ভাবছে যে আমার ওরকম প্রকাশ্যে ঘোরাটা ঠিক হচ্ছে না। ওর বক্তব্য হচ্ছে এখানে মেয়েদের নিয়ে তোমাকে একটা অ্যাকশন করতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। এই 'দৃষ্টান্ত' কথাটা তখন আমাদের মধ্যে খুব চালু কথা ছিল।

জনসংযোগের জন্য যা যা কাজ শুরু করেছিলাম, সেগুলো সব ছেড়ে দিয়ে আমি 'দৃষ্টান্ত স্থাপন'-এর জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

জোতদার খতমের পরিকল্পনা নেওয়ার পর গ্রামের লোকেদের তোলা প্রশ্ন শুনে আমারও প্রশ্ন জাগল। জোতদারের সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তাছাড়া এলাকা এতটা সংগঠিত হয়ে ওঠেনি যে খতম-পরবর্তী সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করা যাবে। আর জোতদার খতমের পরিকল্পনাটিও স্থানীয় মানুষের উদ্যোগের ফল হিসেবে উঠে আসেনি। এই সমস্ত কথা কিন্তু স্থানীয় মেয়েরাই তুলেছিলেন। ফলে তখনকার মতো পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল।

আমি দ্রোণকে এই সমস্ত কথা বললাম। দ্রোণ আমাকে সমালোচনা করল। তার মতে আমার আত্মরক্ষার চিন্তা কৃষকদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছি। আমি তখন গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরছি। মেয়েরা আমাকে এতটাই আপন ভাবত যে তারা তাদের কষ্টের কথা নির্দ্বিধায় আমায় বলত। আমি জানতে চাইলাম, এই কষ্টের হাত থেকে কীভাবে বাঁচা যায় বলে তারা মনে করছে। তারা নানারকম বলত। এইভাবেই কাজ এগোচ্ছিল। মেয়েদের উদ্যোগ ছিল।

অনীক: *শ্রমিকদের মধ্যে কাজের কিছু অভিজ্ঞতা বলুন।*

কৃষ্ণা : এইসব ঘটনার পর আমি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য চলে আসি। তখন দ্রোণ ধরা পড়ে গেছে। জেলে। যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গেছে ওর। বাঁশবেড়িয়ার শ্রমিক বস্তিতে কাজের জন্য যাই। ঐখানে শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন তেলেগুভাষী। আমি তেলেগু শিখতে পারিনি, কিন্তু তাঁরা বাংলা শিখে গিয়েছিলেন।

গ্রামে থাকার সময় প্রধান কষ্ট ছিল খাওয়ার। সে সময়ে গ্রামে খাওয়ার যে কী ভয়ানক কষ্ট ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা। মেজো বোন সামান্য একটু চাল আনতো পুরো পরিবারের জন্য। রান্না হতো সামান্য কটা চাল অনেকটা জলে। প্রত্যেকের ভাগে পড়তো কয়েক দানা চাল আর অনেকটা জল। আমাকে বাঁচাতো বাড়ির ছোটো মেয়েটা। সে জোতদারের জমি থেকে কাঁচা পেঁপে নিয়ে আসত লুকিয়ে। ঐ কাঁচা পেঁপে নুন দিয়ে খেয়ে বেঁচেছিলাম। দ্রোণ বলেছিল খুব ঝাল লঙ্কা খাও। ঝাল লাগবে আর জল খাবে। দেখবে, পেট ভরে যাবে। খেয়েছি। গ্রামে তখন আক্ষরিক অর্থে খাবার কিছুই ছিল না। আমাদের মাথায় ছিল ১৯৭৫-এর মধ্যেই মুক্তি আসবে, তখন বাড়ি ফিরব এবং আলুসহ অন্যান্য সব কিছু খেতে পাব! আর বাসি রুটি খাব। আটের দশক থেকে গ্রামগুলোর এই দুর্দশা কিছুটা কমেছিল। এখনও অনাহার আছে, কয়েকটা আমলাশোলও আছে। কিন্তু তখন বাংলার প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল তীব্র অনাহার, ঘরে ঘরে আমলাশোল। এখন গ্রামে সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নকশালবাড়ির আন্দোলন কৃষি সমস্যার বিষয়টি সামনে আনার ফলেই একরকম ভাবে সেই সমস্যার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকদের মধ্যে যখন শহরে কাজ করতে এলাম, তখন প্রথম যে পরিবর্তনটা দেখলাম তা হলো শহরে অন্তত একবেলা পেটভর্তি খাবারটা জুটে যায়। দারুন কিছু খাবার নয়, কিন্তু সেটাই তখন গ্রামের তুলনায় আমাদের দারুন মনে হয়েছে।

শ্রমিকদের সঙ্গেও ঐ একই আলোচনা হচ্ছে। এখানে প্রথমেই 'খতম'-এর কথা দিয়ে হচ্ছে না। হয়ত শেষ পর্যন্ত সেই খতমের কথাই এসে পড়ছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান রাখতাম যে তারাও গ্রামে যাক। যে শ্রমিক মহিলারা ওখানে শ্রমিকের কাজ করতেন, আমি তাদেরকে শহরের কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বলতাম।

মেয়েরা চট রং করত। তাদেরকে বিশ্রীভাবে বলা হত, 'মাগীকল'।

শ্রমিকদের গ্রামে চলে যাওয়া নিয়ে পুরুষ শ্রমিকরা খুব বিরোধ করত না। কিছু পুরুষ শ্রমিক গ্রামে গিয়েছিল। কিন্তু নারী শ্রমিকরা এই গ্রামে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলত, বিরোধও করত। মেয়েরা প্রথমেই প্রশ্ন করত, গ্রামে চলে গেলে বাচ্চাদের কে দেখবে? দুজনে মিলে রোজগার করলে তার পরিবার-বাচ্চারা খেতে পায়। একজনও যদি গ্রামে চলে যায় তবে সংসারটাই পয়সার অভাবে অচল হয়ে পড়বে। আমাদের ঐ চিন্তা এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় একদম অবাস্তব চিন্তা।

নারীরা বিরোধিতা শুরু করার পর শ্রমিকদের গ্রামে যাওয়ার বিষয়টি আর নারী শ্রমিকদের বলতে পারতাম না, কেবল পুরুষ শ্রমিকদের বলতাম।

অনীক: *মেয়েদের নিজস্ব ইস্যুগুলো নিয়ে নারী শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করা যেত বা করা হত?*

কৃষ্ণা : মেয়েদের ইস্যু বলতে ঘরের সমস্যা নিয়ে কথা হতো— ঘরেও তো মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে। দুজনেই সমান শ্রম দিয়ে রোজগার করছে, অথচ স্ত্রী স্বামীর হাতে মার খাচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধে বলতাম। আমি মূলত যে বাড়িটায় থেকে কাজ করতাম সেই বাড়ির মেয়েটি খুব ডাকাবুকো ছিল। ছেলেদের ঐসব অত্যাচারে ও একদম তেড়ে যেত। আবার যখন মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে, তখন সবাই এককাট্টা। অথচ এই কাল রাত্রেও স্বামী-স্ত্রী দুজনে মারামারি করেছে, রক্তারক্তি করেছে।

অনীক: *সেই সময় ইউনিয়নে মেয়েদের কি কোনো সংগ্রামী ভূমিকা ছিল, নেতৃত্বদানকারীর?*

কৃষ্ণা : সাধারণভাবে না। ছেলেরাই নেতা হত, ছেলেরাই বেশি কথা বলত, মালিকের সঙ্গে আলোচনা করত, তবে মেয়েরা সঙ্গে থাকত। সম্মিলিত শক্তি হিসেবে পেছনে থাকত। কিন্তু মেয়েরা আলাদা নিজেদের জন্য শ্রমিক সংগঠন করছে, সেটা কিন্তু হয়নি। সেটা কোথাও ছিল, আমি কোথাও দেখিনি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হবে যে এই বিষয়টি '৭০-এ কোথাও ছিল না।

অনীক : *শ্রমিকদের মধ্যে 'পাবলিক হেলথ্' বিষয়ক প্রচার চলত কি?*

কৃষ্ণা : হ্যাঁ। সেটা আমরা করতাম। ওরাই একটা খাতা আমায় দিয়েছিল, সেখানে আমরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্য রাখতাম। বিশেষত মেয়েদের জন্য ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রচার চালাতাম। আমরা মেয়েদের সঙ্গে এই সমস্ত শরীর সম্বন্ধীয় কথা খুব সহজভাবেই বলতে পারতাম— দু তরফেই কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। তাদের খাওয়া জুটত না, ফলে সেই অবস্থায় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি হয়তো তাদের চৈতন্যে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারত। কিন্তু আমরা বলেই যেতাম এবং মেয়েরা কিন্তু মন দিয়ে শুনত।

আদিবাসীরা সাধারণত খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত। হুগলির অন্যত্র অ-আদিবাসী গ্রামে থাকার সময় দেখেছি তারা কী পরিমাণে অপরিচ্ছন্ন থাকে।

অনীক : *আর শহরে? শ্রমিক মহল্লায়?*

কৃষ্ণা : খুবই অপরিষ্কার। এইটুকু একটা জায়গায় পুরো পরিবার, প্রায় থাকাই যায় না। গ্রামে কৃষকদের ঘরটা ছোটো হলেও তো বাইরে অনেকটা জায়গা আছে। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের ঘরের বাইরে কোনো জায়গাই পেত না। সারি সারি ছোটো আর লম্বাটে ঘরগুলো সব। সময়ে সময়ে জল আসত। পরিবার পিছু ভাগে পড়ত সামান্য। ফলে জল দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করা কার্যত অসম্ভব ছিল।

গ্রামে থাকাটা অন্য দিক থেকে কষ্টের ছিল। প্রায় সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কিন্তু 'প্রাইভেসি' রাখা যেত। শহরে শ্রমিক মহল্লায় প্রায় কখনও একা থাকা যেত না। গ্রামে বাইরের খবর যেত না, খবরের কাগজ নেই। শহরে সেই অসুবিধাটা ছিল না।

এইবার আমি অন্য একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। আমাদের আন্দোলন কীভাবে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের প্রভাবিত করেছিল সেটা বুঝতে পারবে। একবার আশ্রয় পেয়েছি বারবণিতা পল্লীতে। বাড়িতে লেখা থাকত গৃহস্থবাড়ি। এই মেয়েরা প্রায় সর্বত্র আমাদের খুব ভালোবাসত। সোনাগাছি অঞ্চলে নকশালদের হাতে একজন কুখ্যাত দালাল নিধন হওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলে নকশালদের এই মেয়েরা ভগবান ভাবত এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়েও শেল্টার দিতে দ্বিধা করেনি।

তখন আমরা ভীষণ তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও প্রায় কোনও শেল্টার নেই— ওখানে আমরা শেল্টার পেলাম। আমি যেখানে ছিলাম, সেটাকে ঠিক সোনাগাছির মতো পল্লী বলা যায় না, সেখানে এইরকম মাত্র কয়েকটা ঘরই ছিল। যার ঘরে আমার আশ্রয় জুটল সে আমাকে খুব আদর করে ডেকে নিল। তারপর রাত্রিবেলা তার ঘরে লোক আসতে চাইছে। তার একটা খুব ছোটো ছেলে ছিল। মেয়েটি তখন দরজার ওপারের লোকটিকে বলল যে আজ হবে না, চলে যা। আমার ছেলেটার খুব জ্বর। ছেলেটার জ্বর ছিল এটা সত্যি কথা। কিন্তু তাতেও ওরা 'কাজ' করত (ওরা ওটাকে 'কাজ' করাই বলে)। দরজার ওপারের লোকটি মেয়েটিকে অকথ্য গালাগালি দিয়ে চলে গেল।

আমি ওদের সঙ্গে দিনের বেলা নানারকম গল্প করতাম। বিপ্লবের কথা, নকশালবাড়ির কথা, ওরা কীভাবে অতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে, এইসব কথা বলতাম। আমি ওদের বলতাম যে একটা সময় এই ব্যাপারটা আর পেশা হিসেবে থাকবে না। ওরা নিজেদের নাম রাখত বেশিরভাগ ফুলের নাম দিয়ে। একজন বলল, ও যদি একেকদিন একজনের বাড়িতে যাবে এবং প্রতিদিন এক একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে লোকের সন্দেহ হবে না? অন্য আর একজন বলল, তা কেন, আমাদের ঘরগুলো এত পাশাপাশি, জ্বরের মতো ছোঁয়াচে রোগ এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতেই পাবে! এইসব যুক্তি ওরা নিজেরাই বার করল।

প্রতিদিন একেকটা ঘর থেকে একেকটা রান্না করে আমার জন্য পাঠাতো— সে প্রায় ভোজ বলা যায়। কী মমতা আর যত্ন ছিল— ভাবাই যায় না। আমাদের মাথায় তখন রয়েছে যে ১৯৭৫-এর পরে সব পরিবর্তন হয়ে যাবে— আমি ওদের তাই বলতাম। ওরা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলত যে তুই কিন্তু বলেছিস যে '৭৫-এর পর এসব আর আমাদের করতে হবে না— মনে রাখিস কিন্তু।

অনীক : *আপনি কি ওদের কাছে পরে কখনও ফিরে গিয়েছিলেন?*

কৃষ্ণা : হ্যাঁ, একবারই গিয়েছিলাম। ঐ মেয়েটিকে পাইনি। তবে অন্য মেয়েদের পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজেও তখন অন্য পরিচয়ে গিয়েছি। জিজ্ঞেস করল থাকব কিনা। বললাম, না, চলে যাব।

অনীক : *নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং আজকের নারী আন্দোলনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক খুঁজে পান?*

কৃষ্ণা : এক অর্থে নকশালবাড়ি আন্দোলন বিশেষ করে এখানে বর্তমানের নারী আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নকশালবাড়ির আন্দোলন মেয়েদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করার পরিসর নির্মাণ করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ের নারী আন্দোলন সেই ধারায় পুষ্ট হয়েছে। সেই সময়ের অনেক কর্মী বর্তমানের নারী আন্দোলনেরও কর্মী। তাঁরা সেইসব প্রশ্ন নিয়েই নারী আন্দোলনে এলেন। যে প্রশ্ন তখন তাঁরা করেননি বা করতে পারেন নি, সেই প্রশ্ন তোলার জায়গাও তৈরি হল।

বিশেষ রচনা

ধর্ষণ এবং মৃত্যুদণ্ড

তসলিমা নাসরিন

১

ভারতীয় উপমহাদেশের মেয়েরা এপর্যন্ত যতটুকু অধিকার অর্জন করেছে, বেশিরভাগই করেছে পুরুষের কারণে। পুরুষেরা মেয়েদের সতীদাহ বন্ধ করার, মেয়েদের ভোট দেওয়ার, বাড়ির বাইরে বের হওয়ার, ইস্কুলে যাওয়ার, চাকরিবাকরি করার অধিকারের পক্ষে নারী বিরোধী সমাজের সঙ্গে লড়াই করেছে। তারপরও কিন্তু ভালো পুরুষের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। পথে যে বিরাট বাধার দেওয়াল, তা কিছুটা সরিয়ে সামনে এগোতে পুরুষেরা মেয়েদের সাহায্য করেছে বটে, তবে বেশিরভাগ লোক মেয়েদের ঠেলে দিয়েছে পেছনে। মেয়েদের পেছনে ঠেলার লোকের সংখ্যা বরাবরই বড় বেশি।

ভারতবর্ষকে বেশ কয়েক বছর কাছ থেকে দেখছি, যেহেতু এখানে বাস করছি আমি; এখানে বাস করছি আমি, যেহেতু ভারতবর্ষ ছাড়া এই উপমহাদেশের অন্য কোথাও বাস করার আমার অধিকার লঙঘন করছে গণতন্ত্রে বিশ্বাস-না-করা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার। উপমহাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক দেশ; শিক্ষায়, সম্পদে সমতায় যে দেশ প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ থেকে অনেক এগিয়ে, সে দেশে প্রতি সকালে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে অবাক হয়ে পড়ি ধর্ষণের খবর। নাবালিকা ধর্ষণ তো আছেই, ধর্ষণের পর ঠাণ্ডা মাথায় খুন। গলা টিপে, গুলি করে, কুপিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, পাথর ছুঁড়ে পুরুষেরা মেয়েদের মারছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি, এসবের প্রতিবাদ হয় না দেখে। পেঁয়াজ বা পেট্রোলের দামের একটু এদিক ওদিক হলে রাস্তায় হাজার লোক বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদ করতে, আর একশো মেয়ে ধর্ষিতা হলেও একটি মেয়ে বা একটি ছেলেও রাস্তায় নামে না। ধর্ষণের কথা শুনতে শুনতে, ধর্ষণ দেখতে দেখতে, ধর্ষণ এখন ডাল ভাত হয়ে গেছে। কেউ আর ধর্ষণের খবর শুনে আঁৎকে ওঠে না। ধর্ষণের খবরেও প্রচার মাধ্যমের লোকদের তেমন আর আগের মতো উৎসাহ নেই। গণধর্ষণ না হলে ওরা আজকাল খবরও করে না।

দিল্লির একটি মেয়েকে ন'মাস আগে বাসের ভেতর গণধর্ষণ করেছে কিছু লোক, শুধু গণধর্ষণ নয়, আরও ভয়ঙ্কর কিছু, পুরুষাঙ্গ দিয়েই আঘাত করে শান্ত হয়নি, লোহার রড যৌনাঙ্গে ডুকিয়ে জরায়ু ফুটো করে পেটের নাড়ি ভুড়ি বের করে নিয়ে এসেছে। যৌনাঙ্গে যখন পেটের নাড়ি, তখনও তাদের ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। ধর্ষণোল্লাস শেষ হলে প্রায়-মৃত মেয়েকে চলন্ত বাস থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। মেয়ে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে।

এই প্রথম মানুষ রাগলো। নাকি জাগলো? জাগরণ কি এতই সহজে ঘটে? তবে এ ঠিক, এই প্রথম হাজার হাজার ছেলে মেয়ে রাস্তায় নেমে মেয়েদের নিরাপত্তার দাবি করলো সরকারের কাছে। ধর্ষকদের ফাঁসি দিতে হবে, এমন দাবিও উঠলো। সরকারের কাছে ফাঁসি দেওয়া তো কোনও অসুবিধের ব্যাপার নয়। ফাঁসিতে ঝুটঝামেলা সবচেয়ে কম। এর চেয়ে সহজ শাস্তি আর কী আছে! কিন্তু ছেলেরা যেন মেয়েদের যৌনবস্তু হিসেবে না দেখে, শৈশব থেকে মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শেখে, এই ব্যবস্থা করাটা বরং সহজ নয়। এই কঠিন কাজটির দায়িত্বই তো সরকারকে দেওয়া উচিত।

অবশ্য শৈশবে তোতাপাখির মতো 'নারী ও পুরুষের অধিকার সমান, নারীকে ছোটজাতের মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও না, তাহাদিগকে মারিও না, ধর্ষণ করিও না' উচ্চারণ করলেই যে তা একেবারে মগজ অবধি পৌঁছবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পৌঁছোলেও বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে যখন ক্রমাগত শিশু-কিশোরেরা দেখতে থাকে যে পুরুষরা মাতব্বর আর নারীরা নেপথ্যের লোক, এই দেখার অভিজ্ঞতাই তাদের মগজের বাকি কিছুকে সবলে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নেয়। যৌবনে পতিতা-অভিজ্ঞতা তাদের আরও একটি জ্ঞান মগজে ঢোকায়, 'মেয়েদের শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তা করা যায়, শিশুকেও ধর্ষণ করা যায়। সমাজের খুব বেশি কেউ একে ঠিক অন্যায় বলেও মনে করে না'। স্ত্রীর বেলাতেও তাই, স্ত্রীকে ধর্ষণ করা এখন আইনের চোখে অপরাধ হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে মোটেও অন্যায় কিছু নয়। পণপ্রথা আইনের চোখে নিষিদ্ধ হলেও যেমন সমাজের চোখে নয়। পণপ্রথাই প্রমাণ করে নারী নিতান্তই নীচ, নিরীহ, নিম্নলিঙ্গ, নির্বাক জীব, উৎকোচ দিয়ে ক্রীতদাসী বনা ছাড়া তার আর গতি নেই।

বিবাহিত নারীর শরীরে নানারকম চিহ্ন থাকে জানান দেওয়ার যে সে বিবাহিত, কোন প্রাণহীন ছবির ফ্রেমে যেমন লাল চিহ্ন দিয়ে লেখা থাকে 'সোল্ড', মেয়েদের কপালে, সিঁথিতে সিঁদুরের লাল চিহ্নই মেয়েরা যে বিক্রি হয়ে গেছে তা জানান দেওয়ার চিহ্ন। বিবাহিত মেয়েদের মাথায় চুল থেকে পায়ের নখ অবধি স্বামীর সম্পত্তি। বিবাহিত স্বামীরা কিন্তু কোনও অর্থেই স্ত্রীর সম্পত্তি নয়। এই সব হাজারো পুরুষতান্ত্রিক প্রথা অক্ষত রেখে এখন যদি মেয়েদের ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়, তাহলে কি ধর্ষণ বন্ধ হবে? এদিকে বলিউডের নিরানব্বই ভাগ ছবিতেই দেখানো হচ্ছে নারী যৌনবস্তু, টেলিভিশনেও একই বার্তা, খবরের কাগজ খুললেই আধন্যাংটো মেয়েদের ছবি, সবখানে মেয়েরা কেবল শরীর, নিভাঁজ নিটোল ত্বক, কেবল স্তন, কেবল যোনী, মস্তিষ্ক হলেও মস্তিষ্ক নয়, দার্শনিক হলেও দার্শনিক নয়, বিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞানী নয়, চিন্তক হলেও চিন্তক নয়, বুদ্ধিজীবী হলেও বুদ্ধিজীবী নয়। নাগালে পেলে পুরুষ তাদের ধর্ষণ করবে না তো বিজ্ঞান আর দর্শন নিয়ে আলোচনা করবে? মেয়েরা ছোট পোষাক পরুক,বা ন্যাংটো হোক, ধর্ষণ করার অধিকার কারও নেই— এ কথা পুরুষেরা জানে

না তা নয়, জানে। কিন্তু এও তো তারা জানে যে পুরুষই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তা! পুরুষের পেশি বেশি, গায়ে জোর বেশি, মনের জোর বেশি, পুরুষেরা পারে না এমন কিছু নেই— জন্মের পর থেকে তা-ই জেনে আসছে তারা! এসবই তো অনুক্ষণ শেখানো হয়েছে তাদের। ধর্ষণ করলে, পুরুষ মনে করে, পৌরুষের প্রমাণ দেওয়া হয়। সত্যি বলতে কী, পুরুষতন্ত্র নারীর শরীরকে যত ধর্ষণ করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি করছে মনকে। ধর্ষণ করছে মনের স্বাভাবিক বিকাশকে, মনের জীবনীশক্তিকে, প্রাণকে, প্রাণের উচ্ছ্বাসকে, অসীম সম্ভাবনাকে, স্বপ্নকে, স্বাধীনতাকে। শরীরের ক্ষত শুকিয়ে যায়, মনের ক্ষত শুকোয় না।

শতাব্দীর পর শতাব্দী এমনই ঘটছে। বিবর্তিত হতে হতে চলেছি সব প্রাণীই। ক্রমশ ভালো থেকে আরো-ভালো, আরো-ভালো থেকে আরো-আরো ভালো অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছি বলেই মানুষ প্রজাতি টিকে আছে। একই প্রজাতিকে, শুধু যৌনাঙ্গ ভিন্ন হওয়ার কারণে, যদি অত্যাচার করতেই থাকে পুরুষেরা তবে এই দুর্ভাগা মানুষ প্রজাতিই হয়তো একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধর্ষণের ইচ্ছেকে যদি পুরুষেরা সংযত করতে না চায়, জোর খাটিয়ে আনন্দ পাওয়ার অভ্যেসকে যদি বিদেয় করতে না পারে, তবে মানুষের বিবর্তন ভালোর দিকে না এগিয়ে মন্দের দিকে এগোবে। মন্দের দিকে যাওয়া মানে বিলুপ্তির দিকে যাওয়া। হাতে গোনা খুব দুষ্ট কিছু প্রজাতি ছাড়া আর কোনও প্রজাতি নিজের প্রজাতির মেয়েদের দাবিয়ে রাখে না। গণধর্ষণ? মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রজাতির চরিত্র এমন বীভৎস নয়।

মানুষ বুদ্ধিমান। বুদ্ধির নিদর্শন অনেক কিছুতে রাখছে। মঙ্গলগ্রহে অবধি মেশিন পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ছোট্ট এই গ্রহে, সমতায়, সমানাধিকারে, সমমর্মিতায়, সমঝোতায় সুখে আর স্বস্তিতে নারী আর পুরুষের বাস করার পরিবেশ আজও তৈরি করতে পারছে না সে কি বুদ্ধি নেই বলে, নাকি ইচ্ছে নেই বলে? আমার তো মনে হয় ইচ্ছে নেই বলে। হ্যাঁ বুঝলাম, পুরুষের গায়ে জোর বেশি বলে ধর্ষণ করে। কিন্তু গায়ের জোরে তো আমরা সমাজটা চালাচ্ছি না, রাজ্যটা বা রাষ্ট্রটা চালাচ্ছি না। চালাচ্ছি বুদ্ধির জোরে। পুরুষেরা কি তাদের বুদ্ধি আর চেতনকে, বিবেক আর হৃদয়কে গণধর্ষণ করে বেহুঁশ করে রেখেছে? চেতনার নাড়ি টেনে বের করে ছিঁড়ে ফেড়ে ধর্ষণ করছে নিজেদেরই ভবিষ্যৎ!

সমাজটা তাহলে পাল্টাবে কারা? যাদের হাতে ক্ষমতা, তারা। যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজটা গড়েছে, তারা। যারা ক্ষমতাহীন, যারা অত্যাচারিত, ধর্ষিত, নির্যাতিত, যারা ভুক্তভোগী তাদের আর কতটুকু শক্তি! নারীরা তো লড়াই করছেই। কিন্তু রাস্তায় ধর্ষণের প্রতিবাদে অত্যাচারিতের উপস্থিতির চেয়ে অত্যাচারী গোষ্ঠী পুরুষদের উপস্থিতি অনেক বেশি দরকারি। অত্যাচারী গোষ্ঠী অত্যাচার বন্ধ করলেই অত্যাচার বন্ধ হবে। শাস্তির ভয়ে বন্ধ করলে অবশ্য সে বন্ধ করা সত্যিকারের বন্ধ করা নয়, বোধোদয় হওয়ার পর বন্ধ করলে সে বন্ধ করা সত্যিকারের বন্ধ করা, চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা সেটিরই বেশি।

ভারতবর্ষ বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র, জনসংখ্যা বিচার করলে এই বাক্য অসত্য নয়। কিন্তু গণতন্ত্র শুধু ভোটের ব্যবস্থাই নয়। গণতন্ত্র নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, সবার জন্য সমানাধিকার আর বাক স্বাধীনতার ব্যবস্থাও বটে। ভারতবর্ষে এ দুটোর কোনওটিই নেই। কেবল ভারতবর্ষ নয়, পুরো মহাদেশেরই একই হাল। সত্যিকার গণতন্ত্রে জনগণ নিরাপদে বাস করে। সত্যিকার গণতন্ত্র আনতে মধ্যবিত্তের একাংশের গণরোষ খুব কাজ দেবে কি? কাজ দেবে বিশাল এক গণজাগরণ। উপমহাদেশের রাজনীতি ছলে বলে কৌশলে গণজাগরণ বন্ধ করে রাখে। বৈষম্য দেখতে দেখতে, বৈষম্যের সঙ্গেও সহবাস করতে করতে, বৈষম্যেই মানুষ অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। সমতা বা সমানাধিকার ঠিক কাকে বলে, বেশিরভাগ মানুষ জানে না। দুঃখ এই, বেশিরভাগ বঞ্চিতই জানে না তারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিতরাই ঠিক বোঝে না তারা লাঞ্ছিত। আগে জানুক, আগে বুঝুক, তারপর জাগুক।

২

না জেনে না বুঝে জেগে উঠলে এবং সিদ্ধান্ত নিলে যা হয়, ঠিক জাগাও হয় না, সিদ্ধান্তেও ভুল হয়। দিল্লির গণধর্ষকদের ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল। দেশের বেশির ভাগ মানুষ ভেবে নিয়েছে, ফাঁসি হলেই ধর্ষণ বন্ধ হবে। কিন্তু ধর্ষণ যারা করে, তারা ফাঁসিকে ভয় পায় না, যাবজ্জীবনকেও ভয় পায় না। ফাঁসির আদেশ হওয়ার সাতদিনের মধ্যে ধর্ষকরা একটি চার বছরের বাচ্চা-মেয়েকে ধর্ষণ করে দিল্লির পার্কে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ধর্ষকরা আর সব ঘৃণ্য অপরাধীর মতো। ভেবে নেয়, এ যাত্রা হয়তো পার পেয়ে যাবে, অনেকে যেমন পেয়ে যায়। এবার হয়তো ধরা পড়বে না, অনেকেই যেমন পড়ে না।

যেসব দেশে মৃত্যুদণ্ডের আইন আছে, সেসব দেশে অপরাধের সংখ্যা মৃত্যুদণ্ডের আইন যেসব দেশে নেই, সেসব দেশের চেয়ে অনেক বেশি। এটিই প্রমাণ করে যে অপরাধ দমন করার জন্য মৃত্যুদণ্ড কোনও ভালো পদ্ধতি নয়। সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি, মানুষকে মানুষের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত এবং সচেতন করা। যেসব দেশে নারী-পুরুষ শিক্ষিত এবং সচেতন, সেসব দেশে নারী এবং পুরুষের অধিকারে ফারাকটা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং, মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তুমি সমাজে সমতা আনতে পারবে না, তোমাকে সুস্থ চিন্তার মানুষ গড়ে তুলতে হবে। চার গণধর্ষকের ফাঁসি হয়ে যাবে, কিন্তু যতদিন পুরুষতন্ত্র আর নারীবিদ্বেষ রয়ে যাবে, ততদিন ধর্ষণ বন্ধ হবে না। প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মন্দ লোকেরা মানুষ হত্যা করে, কিন্তু সমতায় বিশ্বাসী সুস্থ রাষ্ট্র কেন মানুষ হত্যা করবে! তবে মন্দ লোকে আর রাষ্ট্রে পার্থক্য রইলো কোথায়? কেউ খুনি বা ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি মানুষকে খুনী বা ধর্ষক করে। সুতরাং কোথায় কী ভুল হচ্ছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, এবং ভুলগুলো সংশোধন করতে হবে, যেন কেউ খুনী বা ধর্ষক হওয়ার কোনও প্রেরণা কখনও না পায়। আর তা যদি না হয়, তবে লক্ষ খুনিকে ফাঁসি দিলেও, আরও লক্ষ খুনি জন্ম নেবে।

নাটক

দামিনী

অমর মিত্র

[এই জায়গাটা পাহাড়ি। রুক্ষ্ম জমি, অভাবী পৃথিবী। এখানে তিন বুড়ো, লক্ষীকান্ত, গণেশ আর কার্তিক ভিটের তিন জায়গায় তিন ভাবে বসে আছে। বেলা ফুরিয়ে এল। কুটিরের আঙিনায় ছায়া আলো। গ্রাম প্রধানের বাড়ির কামিন যামিনী এসেছে তিনবুড়োর কাছে। তারা সরকারের দেওয়া নানা রিলিফ প্রোগ্রামে বেঁচে আছে। কার্তিকের বউ দামিনী সব জোগাড় করে আনে বিডিও পঞ্চায়েত থেকে, ইস্কিমের দান। বলা যায় সরকারি ভিক্ষান্নে বাঁচে তারা। তিন বুড়োর লক্ষীকান্ত ১০০ ছুঁই ছুঁই, গণেশ ৭০ আর কার্ত্তিক ৪৭-৪৮, কিন্তু অকাল বার্ধক্যে জবুথবু। তারা বসে খায়, নড়ে না। মাথার ঠিক নেই কারোর। তাদের নিয়ে এই নাট্যাংশ বা গল্পাংশ।]

লক্ষী : কতকাল বাদে পায়েস খেইচি আজ।

গণেশ : না উটা পায়েস না।

লক্ষী : তবে কী?

গণেশ : ঘুগনি।

লক্ষী : তুই কেডারে, কোত্থেকে এলি, পায়েস আর ঘুগনি কি এক?

গণেশ : তুই ই বা কেডা, ঘুগনিরে পায়েস বলিস?

লক্ষী : পায়েস তো।

গণেশ : ঘুগনি তো।

লক্ষী : মোটেই না, পায়েস।

গণেশ : মোটেই হ্যাঁ, ঘুগনি।

লক্ষী : পায়েস।

গণেশ : ঘুগনি।

[পায়েস ঘুগনি পায়েস ঘুগনি করে তাদের কোঁদল শুরু হয়। কার্তিক তাদের দেখছিল মাথা উঁচু করে, মুখ খুলল।]

কার্তিক : (স্বগোতোক্তি) দ্যাখো দ্যাখো খেয়েচে শেতলা মার খিচড়ি ভোগ, পায়েস ঘুগনি বলে কোঁদল করতেছে।

(যামিনী ঢোকে)

যামিনী : কেডা কোঁদল করে গো?

কার্তিক : বাপ ঠাকুদ্দায়, দুদ খেয়ে বলে খেইচি ছানা।

যামিনী : আহা বুড়ো মানষে অমন করে, খাই খাই করে মরে।

কার্তিক : তুমি কেডা শুনি।

যামিনী : আমারে তুই চিনতি পারতিচিস নে?

কার্তিক : না, একদম না, তুমি কেডা?

যামিনী : তোর চোখে কি ছানি হল রে?

কার্তিক : জানিনে, তুমি কেডা কও।

(কার্তিক আর যামিনীর কথাবার্তা লক্ষ্মী আর গণেশ শুনছিল। গণেশ চিনেছে)

গণেশ : গলাডা যেন চিনা মনে হয়।

যামিনী : হয় হয়, কেডা কহ দেখি।

গণেশ : ডাগর মেয়েমানষের গলা, চিনা লাগে খুব।

যামিনী : আমি তুমাদের দেখতি এলেম গনেশকা।

গণেশ : আরে তুই কি যামিনী?

যামিনী : এই তো চিনেছ।

গণেশ : চেনব না, ও যামিনী, কতদিন দেখিনি তুরে, পধানের বাড়ি এত সুখ।

যামিনী : সুখের মুকে ছাই, সুখে সুখ নাই।

গণেশ : আহা যামিনী তুই এলি, কেউ তো খুঁজ নেয় না রে।

যামিনী : আসব কী, তিন বুড়োর খুব বদনাম, তিনটে বুড়ো বসে খায়, দামিনী দাসী জলে যায়, বউটার কম কষ্ট গো ইস্কিম খুঁজে খুঁজে, গরমেন কী দিবে তাই করে বেড়ায়।

কার্তিক : দামিনী আমার বউ।

যামিনী : হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তোর বউ।

কার্তিক : তার নামে কোনো কথা আমি শোনব না।

যামিনী : উ মা গো, কী বউ বউ, নড়ে খায় না ইদের কেউ।

(লক্ষ্মীকান্ত ঘাড় উঁচু করে দেখে)

লক্ষ্মী : পায়েস আনলি নাকি খুকি?

গণেশ : না ঘুগনি।

কার্তিক : ফের ঘুগনি পায়েস, শেতলা পূজোর খিচড়ি এনিচ নাকি লকের বউ?

যামিনী : ও মা গো, দামিনীর কথা ঠিক, এরা যে শুধু খাই খাই করে, ও লক্ষ্মী দামশাই, তুমি যে বেঁচে আচ, তা দেখলিও বিশ্বেস হয় না গো।

লক্ষ্মী : আমার বুকি দামিনী পুরান ঘি ডলে, আহা দামিনী কী ডাগর বউ, ঠিক যেন কালীদাসী।

যামিনী : ঘি আমি দিইলাম গো।

লক্ষ্মী : বললি হল, ওডা দামিনী দিইলো।

যামিনী : দামিনীরে কেডা দিল?

লক্ষ্মী : ওর দরকার নি, ডাগর মেয়েমানুষ।

যামিনী : হইচে, হইচে, নিজির নাত বউ তো স্মরণে থাকে না, ঘাটের মড়া হৈ গেছ গো।

গণেশ : এ কী কথা বিটি তুর।

লক্ষ্মী : কি বললি খুকি তুই?

যামিনী : বলচি কী সোন্দর বাঁচি আছ তুমরা।

লক্ষ্মী : আছি তো, পায়েস খেয়ে জীবন এয়েচে গায়ে।

গণেশ : হাঁ হাঁ, ঘুগনি খেয়ে জীবন এয়েচে গায়ে।

কার্তিক : খিচড়ি খিচড়ি, মা শেতলার খিচড়ি খেয়েচে সব।

যামিনী : থাক থাক, যে যা বলে তাই সত্যি, ও বুড়াদাদা গো।

তোমাদের দেখে পরাণ জুড়াল গো।

গণেশ : আহ্ এমন কথা কতকাল শুনিনি গো, যামিনী তুর মনে পড়ে, কত্তাপুকুরের ধারে বসে কানচিস তুই, কত্তার নায়েব তোরে আঁচড়ে দিইলো কামড়ে দিইলো।

যামিনী : জ্ঞান যে টরটরে।

লক্ষ্মী : হাঁ মাথা ঠিক, বডি খারাপ, কচি ছানা আমরা, গায়ে বসে ভোমরা।

যামিনী : মরণ। তুমারও মনে আচে দামশাই?

লক্ষ্মী : আছে রে খুকি আছে, মেয়েমানুষের যৈবনের কথা মনে পড়লিই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে সব।

যামিনী : আমি খুকি নই।

লক্ষ্মী : আমি যে খুকিডারেই দেখিরে খুকি, তারে পধানের বাপ, কত্তার নায়েব নিজির দাসী করে হাতপা টিপোচ্ছে, সে বুড়ারে কোন কবরেজ যেন কহিছিলা যোবতী মেয়েমানষের ছুঁয়ায় তার যৈবন ফিরতি পারে, রোগ সারতি পারে।

যামিনী : আহ্, চুপ করো দামশাই।

কার্তিক : হাঁ চুপ করো, পধানের কানে গেলি ইস্কিম বন্ধ।

গণেশ : কানে কেডা দিবে?

কার্তিক : শালা বুড়া দুটা শুধু লকের নিন্দা করে, এরপর শ্মশানঘাটে বসায় দিয়ে আসব।

যামিনী : ছিহ্, অমন কথা বলে, তোর বাপ ঠাকুদ্দা না।

গণেশ : হাঁ, ছিহ্, অমনি বলে।

লক্ষ্মী : ছিহ ছিহ্, কেমন লাতি আমার!

যামিনী : ঠাকুদ্দা মশায়, তুমার মনে আছে?

লক্ষ্মী : হাঁ, কিন্তু কী কথা মনে থাকবে?

যামিনী : সেই যে সেই মিঠা পাহাড়ের কথা।

লক্ষ্মী : কোন পাহাড়?

যামিনী : মিঠা বুরু গো, মিঠা পাহাড়।

গণেশ : হাঁ হাঁ, সেই লাড্ডু পাহাড়।

কার্তিক : কী পাহাড়?

গণেশ : বুঁদের মতো মিঠা পাহাড়।

কার্তিক : ময়রার দুকানে বারকোশ ভর্তি বুঁদের পাহাড়, লাল নীল, হলুদ, সবুজ বুঁদে, আমি দেখিচি।

গণেশ : বড় কত্তার ছেরাদ্দে বুঁদে আর দই, গাঁ শুদ্দ লোক খেল।

লক্ষ্মী : সঙ্গে ভাত আর কুমড়ার ঘ্যাঁটও ছেল।

গণেশ : বড় কত্তর আবার ছেরাদ্দ হয় না কেনে?

লক্ষ্মী : মানুষ মরলি একবার ছেরাদ্দ হয়।

যামিনী : সবগুলা সত্যি বুড়া, শুধু খাই খাই, নিজিদির ছেরাদ্দেও নিজিরা খাবে, বলি মিঠা বুরুর কথা ভুলি গেলে।

কার্তিক : (ঘোরের ভিতর) মিঠা পাহাড় মিঠা বুরুর কথা দামিনীও জানে।

গণেশ : দামিনী কী করে জানে, জানত আমার মা, মোর গভভোধারিণী।

লক্ষ্মী : তুর মা না, আমার মা, মোর জননী।

যামিনী : তোমার মা?

লক্ষ্মী : হাঁ, মা জননী, কালিদাসী ছিল তেনার নাম।

গণেশ : উ মা মা মা, তুমার মা না, আমার মা, গঙ্গাদাসী।

লক্ষ্মী : দূর মুখ্যু, সে তো আমার ইস্তিরি, যারে কয় বউ বিবি, বলচি আমার জননীর কথা।

গণেশ : তুমার মা কবে ছেল?

লক্ষ্মী : আমার ছেল ছেল শিশু কালে।

গণেশ : বিশ্বাস হয় না।

লক্ষ্মী : মুখ্যু আমি মা ছাড়া হেথা আসতি পারি?

গণেশ : কেনে, হেঁটে এইলে শুনিচি।

যামিনী : মরণ, দুটায় তো মিলমিশ নাই একটু, দিনভর কোঁদল করে চলেছে।

লক্ষ্মী : তুই দ্যাখ খুকি, আমারে শুদু হামান দিস্তেয় পান ছেঁচার মতো ছেঁচে সারাদিন, আমি এটটা দুবলা বুড়া, কিচুই করিনে, শুদু পায়েস খেতি ইচ্ছে করে।

যামিনী : ভাত জোটে না, পায়েস, হাঁ গো ঠাকুদ্দা মশায়, সেই যে মিঠা পাহাড়ের কথা বলেছিলে আমারে তখন, আবার বলবা?

লক্ষ্মী : তুর কচি যৈবন খুকি তখন, কত্তার নায়েব মানে পধানের বুড়া বাপ তোরে দাঁতে আর মুকি খেইলো খুকি, তুই কত্তাপুকুরির ধারে বসে কানছিলি, তুরে হাত ধরে নে এল গণেশ, আমি মিঠা বুরুর কথা বলে তুর কান্না থামালাম।

যামিনী : মিঠা বুরুতে নে যাবা কহিছিলে।

লক্ষ্মী : বলিছিলাম।

যামিনী : নে গেলে না।

গণেশ : বাপ শুদু মিছে কথা বলত, আমারেও বলেছে ওই কথা।

লক্ষ্মী : খিদের জ্বালায় কাঁদলি বলতি হত।

যামিনী : আহা, এখন একবার কহ্ দেখি ঠাকুদ্দা মশায়।

লক্ষ্মী : গণেশ হইলো মন্বন্তরের কালে, আমি হইলাম যখন তখনও ভাতের অভাব, মা কালিদাসী গাছের পাতা সেদ্ধ করে খেত, অন্ন ছিল না ঘরে।

গণেশ : কোন গাছের পাতা?

লক্ষ্মী : আমপাতা, জামপাতা, শালপাতা, মউয়া পাতা, খিদে পেলি জননী আমার মাটি খেত শুনিচি, আমি তখন মা কালীদাসীর গভভে।

যামিনী : (আঁচলে চোখ মোছে) আহারে!

গণেশ : (হাতে চোখ কচলায়) ঠাকমা গো।

কার্তিক : কালীদাসী বুড়ি গো, কুথায় গেল গো, ওই জন্যি গাছের পাতা গিনার ইস্কিম এইচে, মাটি কাটার এইচে, ইখন গাছের পাতা আর মাটি সব গরমেন দিবে, আর নিজিরা যে

নিবা, সে উপায় নাই।

লক্ষ্মী : আমি খিদেয় খুব কানতাম।

গণেশ : তুমি কানতে একা, আমিও কানতাম।

লক্ষ্মী : তুই অল্প বয়সে বেশি পেকিচিস, বাপের কথার ভিতর কথা বলিস, শুন খুকি, যখন আমি কানতাম, মা কালিদাসী তখন সেই মিঠা বুরুর কথা বলত, মিঠা পাহাড়।

কার্তিক : সে কথা দামিনীও বলে।

লক্ষ্মী : দামিনী বলে, না বলে না।

কার্তিক : দামিনী বলে, দামিনী জানে মিঠা পাহাড়ের কথা।

লক্ষ্মী : দামিনীরে আমি কহি নাই, আমি তো ভুলিই গিছিলাম মা কালিদাসী আর মিঠা বুরুর কথা।

যামিনী : মনে করো ঠাকুদ্দা মশায়, আমি ওইটা শুনতি এয়েচি, রাতি মনে করার চেষ্টা করি, পারি নে।

লক্ষ্মী : স্বপন দেখিস?

যামিনী : দেখি মনে হয়।

লক্ষ্মী : আমিও দেখি, কিন্তু ঘুম ভাঙলি ভুলে মরি, ওই জন্যি আমার ঘুমুতি ভাল লাগে, যদি স্বপনে মা কালিদাসী আর মিঠা পাহাড় আসে।

যামিনী : কালিদাসী কী বলত বল।

লক্ষ্মী : বলত, একদিন সকালে আমরা ঘর ছেড়ে বেরোব সবাই, গাঁ সুদ্দ লোক সব চলতি থাকবে। (লক্ষ্মী শ্বাস নেয়। স্মরণ করতে থাকে।)

যামিনী : কুথায় যাবে সব?

গণেশ : যমের দখিন দুয়ারে, আমাদের কুথাও যাবার জায়গা নাই যামিনী।

যামিনী : কথাটা শুনো কাকা, আছে, জায়গা আছে।

গণেশ : কুথায় আছে রে?

যামিনী : মিঠা বুরুতে আছে।

(গণেশ চুপ করে যায়। লক্ষ্মীকান্ত দম নিচ্ছে কথা আরম্ভের।)

কার্তিক : কথা থেমি গেল কেনে?

গণেশ : ও লক্ষ্মী বল তারপর কী হল।

লক্ষ্মী : এই তুই বাপেরে নাম ধরে ডাকিস!

গণেশ : কেডা বাপ কেডা ছাবাল ভুল হৈ যায়, আমার ছাবালের নাম লক্ষ্মী ভাবলাম, মিঠা পাহাড়ের কথা বল দেখি বাপ লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী : আমি ত্যাখন কচি ছানা, খিদের জ্বালায় কানছি, মোর মা জননী বলল, কাঁদিসেন বাপ, তুরে মিঠা বুরু লিয়ে যাব।

যামিনী : আহা, মিঠা বুরু, শুনতি কত মিঠা।

লক্ষ্মী : ঘাস-পাতা সেদ্ধ, বাবুবাড়ি থেকে আমা ফেনে খিদে মরে না। বেড়ে যায় ডবল, আমি কানছি, কালিদাসী মা বলে চুপ যা বাপ চুপ যা।

গণেশ : আমারও মনে পড়ে বাপ, মোরও মা জননী ছেল, গঙ্গাদাসী উয়ার নাম, সে বলত।

লক্ষ্মী : গঙ্গাদাসী তো মোর বউ ছেল।

গণেশ : মোটেই না, মোর মা জননী গঙ্গাদাসী।

লক্ষ্মী : সে থালি অন্য কেউ হবে, মোর বিবি গঙ্গাদাসী।

কার্তিক : মুখ্যু বুড়ো, বাপের বউ তো ছেলের মা হয়।

লক্ষ্মী : তোরে শিখাতি হবে না, কার বউ কার কেডা হয়।

গণেশ : হাঁ, আমার জন্মের পর এল মন্বন্তর, আশ্বিনের ঝড়, মা বলত পথে মানুষ মরে পড়ে থাকত, তখন মা গঙ্গাদাসী আমারে বলত ওই পাহাড়ের কথা, আহা তখন সাঁঝ বেলা, শেল ডাকতেছে সারাদিনে মড়া খেয়েচে তারা পেট ভরে, মা আমারে বুকি চেপে মিঠা পাহাড়ে লিয়ে যাবে কইত।

কার্তিক : মিছে কথা বাপ, সব তুমার মিছে কথা।

গণেশ : কী মিছে কথারে কার্তিক কী মিছে কথা?

লক্ষ্মী : মিছে কথাই বটে, মিঠা পাহাড়ের স্বপন কালিদাসী মা দেখত।

গণেশ : না, মোর জননী গঙ্গাদাসীও দেখত।

কার্তিক : দুই বুড়াই মিছে কথা কয় যামিনী দিদি, মিঠা পাহাড়ের কথা আমার মা হরিদাসী বলত আমারে।

গণেশ : হরিদাসী তো আমার বউ ছেল।

কার্তিক : আমার মা, তুমার বউ কিনা আমি জানি নে।

গণেশ : জগতসুদ্ধ লোক জানে হরিদাসী আমার বে করা বউ।

কার্তিক : আমি তো বে দেখিনি বাপ যে জানব উসব, কিন্তু মাঝরাতি যখন ঘুম ভেঙে যেত আমার খিদেয়, কানতাম খুব, ওদিকি ভিটের পিছনে শেল গলা খাঁকারি দেয়, মানুষ মরলিই টেনে লিয়ে যাবে, আমি বলছি মা খাতি দে খাতি দে, তখন হরিদাসী জননী আমারে মিঠা পাহাড়ের কথা শুনাত।

গণেশ : দূর ইডা মোর মায়ের কথা।

লক্ষ্মী : মোর জননীর কথা, মিঠা পাহাড়কে সে স্বপনে পাইছিল।

গণেশ : কিন্তু হরিদাসী উ কথা তো মোরে কহেনি কোনোদিন।

লক্ষ্মী : মুখ্যু হরিদাসী কি তোর মা ছেল?

গণেশ : জানি নে কিছুই মনে নেই, বিস্মরণ হয় সব।

যামিনী : আর স্মরণ করতি হবে না, মা বউ আলাদা করতি পার না কাকা, কার্তিক তুই বল দেখি তোর মা তোরে কী বলত।

কার্তিক : কী বলব, আমার ক্ষুধা জাগতেছে কেরমোশো, খিচড়ি খেতি মন যায় যামিনীদি। (কেউ টেরও পায় নি কখন দামিনী এসে ঢুকেছে আঙিনায়। ছায়া আঁধারে সে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছে মিঠা পাহাড়ের কথা। তাকে কেউ দ্যাখে নি।)

যামিনী : তাহলি কাকা তুমিই বল।

গণেশ : আমার কান্না আসতেছে মা গঙ্গাদাসীর জন্যি, মা আমারে ঘুগনি খেতি দে।

যামিনী : উফ, ঘুগনি আর খিচড়ি, হাঁ ঠাকুদ্দামশায়, তুমি বলবা?
লক্ষ্মী : বলব বলব, আগে কালিদাসী মার মুখখানা স্মরণে আনি, মার কোলখানা কীরকম ছেল ভেবে নিই।
যামিনী : ভাব ভাব, কালিদাসী মার কথা ভাব, তারপর তার কথা শুনাও।
গণেশ : শুধু কালিদাসী মা কেনে, গঙ্গাদাসী মার কথাও শুনাও।
কার্তিক : কালিদাসী গঙ্গাদাসী কেনে, হরিদাসী মার কথাও শুনাও।
লক্ষ্মী : শেল ডাকুক।
যামিনী : শেল ডাকপে না, শেল কি আর আছে।
লক্ষ্মী : কেন নেই, আমি যে মা কালিদাসীর কথা মনে করলিই শেলের ডাক শুনি।
যামিনী : বাঘের ভয়ে শেল গেছে।
লক্ষ্মী : জানি, শেলে মরা খায়, বাঘে জীয়ন্ত খায়।
যামিনী : বল ঠাকুদ্দামশায় বল মিঠা বুরুর কথা।
লক্ষ্মী : মা কালিদাসী মিঠা বুরুর কথা আরম্ভ করলি শেল ডেকে উঠত, তারা সব মরা খেয়ে তখন ঢোল।
যামিনী : তারপর কী হতো?
লক্ষ্মী : কী হবে আবার, তার ভিতরে মা বলে যেত মিঠা বুরুর কথা।
যামিনী : গল্পটা কি শেষ হল?
লক্ষ্মী : গল্প নাকি সত্যি কথা।
যামিনী : সত্যি কথাডা বল।
লক্ষ্মী : দাঁড়া স্মরণে আনি। (চোখ বুঁজে ঝিম মেরে যায় লক্ষ্মীকান্ত।)
কার্তিক : কী হল, মনে নেই আর?
গণেশ : চুপ চুপ আমি মা গঙ্গাদাসীরে স্মরণ করছি।
কার্তিক : আমি তাহলে আমার মা হরিদাসীরে স্মরণে আনি।
(তিনজন তাদের মা জননীকে স্মরণ করতে থাকে যেন ধ্যানস্থ হয়ে। যামিনী বিপন্ন মুখে বিড়বিড় করে)
যামিনী : বুড়াদের ঘুম এয়েচে মনে হয়, আমি কী করি?
(তখন ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দামিনী কথা বলে)
দামিনী : আমারে স্মরণ করার কেউ নাই, কিন্তু আমি জানি মিঠা বুরুর কথা। (এগিয়ে আসে দামিনী)
দামিনী : আমি জানি মিঠা বুরুর কথা।
লক্ষ্মী : (চমকে ওঠে) মা মা গো, জননী কালিদাসী।
গণেশ : জননী গঙ্গাদাসী গো।
কার্তিক : হরিদাসী মা গো, খিচড়ি দাও।
দামিনী : মিঠা পাহাড় যেতি দুটা বন, তিনটা নদী, দুটা তেপান্তর পার হতি হয়, তারপরেও যেতি হবে, তখন চাদ্দিকটা সব কেমুন হয়ে ওঠে।
লক্ষ্মী : কেমুন হয় মা?
দামিনী : কেমুন কেমুন, বুঝে নিলিই হবে।
গণেশ : বুজিছি বুজিছি, তুমি বল মা।
দামিনী : হুই দ্যাখো মিঠা বুরু, চাদ্দিকি আর কিছু নাই, আছে শুদু মিঠা বুরু, ঢেউ খেলান বুরু, উটায় আমাদের হক।
কার্তিক : হাঁ, হাঁ, ঢেউ খেলান, তুমার বুকির পারা।
দামিনী : হাঁ, সেই মিঠা বুরুর মাটিতেই ক্ষুধা মেটে।
লক্ষ্মী : আহা কী শুনলাম গো।
দামিনী : খাবলা মাটি মুখি পোরো, খুব মিঠা।
গণেশ : মা আমারে মিঠা পাহাড় নে চ।
দামিনী : এক মুঠি মাটিতে ক্ষুধা শেষ, ওখেনে মিঠা মাটি মিঠা পানি।
লক্ষ্মী : আহা আমার কান্না আসতেছে আনন্দে।
গণেশ : আমারও তাই।
কার্তিক : আর পঞ্চায়েত-বিডিওর দেওয়া মা শেতলার খিচড়ি ভোগ খাব না, মিঠা বুরুর মাটি খাব।
দামিনী : মিঠা বুরুর মাটি আমাদের, কালিদাসী, গঙ্গাদাসী আর হরিদাসীর মিঠা বুরু আমার, ই মাটি ইস্কিমের মাটি লয়, গরমেনের মাটি লয়, রিলিপ লয়, আমাদের।
লক্ষ্মী : হাঁ, গরমেনের দিয়া পায়েস খাব না।
গণেশ : হাঁ, গরমেনের ঘুগনি খাব না।
কার্তিক : মাগো ইস্কিম ছাড়া পেট ভরে?
গণেশ : জম্মো থেকে গরমেন দেয় সব, মিঠা বুরু কি গরমেনের ইস্কিম লয়।
দামিনী : না।
লক্ষ্মী : ও মা কালিদাসী, সত্যি বলো তুমি, ইস্কিম ছাড়া হয়, গরমেন ছাড়া বাঁচে মানুষ, গরমেন দিবে তাই আমরা খাব।
দামিনী : স্বপনে যাও স্বপনে যাও, ইস্কিম ভিক্ষা আর কঁইরব না।
(বলতে বলতে দামিনী এগিয়ে আসে আরো। তাকে এবার দেখা যায়। দামিনী যেন তিন বুড়োর মা হয়ে আবির্ভূত হয়।)
দামিনী : চুপ, চুপ যা বাপ, ওই শেল ডাকে।
(দূর থেকে শৃগালের ডাক ভেসে আসে আবছা হয়ে। তিন বুড়ো চুপ। দামিনী ঘুরতে থাকে।)
দামিনী : মিঠা বুরুর মাটি মিঠা
ইস্কিমের নাই গো।
মিঠা বুরুর পানি মিঠা
ইস্কিমের লয় গো।
মিঠা বুরুই গরমেন নাই
ইস্কিমে নাই গো.....।
(পর্দা পড়ে)

গৃহপ্রবেশ

মীনাক্ষী সেন

ইরাবতী অবাক হয়ে বলেন— কমলা, তুই কী বলছিস? এই এতদূর রাস্তা, তোর সঙ্গে দুটো ছোটো বাচ্চা, কাঁধে সুটকেশ, হাতে ব্যাগ, এতটা রাস্তা তুই হেঁটে এলি?

—তা নয়তো কী বলছি গো বউদিদি

কমলা মস্ত মস্ত দুটো চোখ ইরাবতীর দিকে মেলে বলে।

—টেরেন থেকে নেমে একে জিজ্ঞেস করি বেলঘড়ে কোথা, ওকে জিজ্ঞেস করি, শেষে একজন এসে বাসে উইঠ্যে দিলে।

—তারপর?

ইরাবতী এবার তার শান্ত চোখদুটো কমলার দিকে মেলে ধরেন।

—তারপর বাসটা আসতে আসতে একসময় থেমে গেলো গো বউদিদি। লোকে বলে আর যাবে না। তবে বেলঘড়ে যাবো ক্যামনে? বাস তো আর পাই না, লোকে বল্লে এই সোজা রাস্তা বেলঘড়ে যাবে, তো হাঁটলাম আর হাঁটলাম। একটা ইয়া বড় মূর্তি গো বউদিদি, ঘোড়ায় চড়া। ওখান থেকে হাঁটা শুরু করে বেলঘড়ে এসে থামলাম।

— তুই কি পাগল নাকি রে? শ্যামবাজার থেকে বেলঘরিয়া হেঁটে এলি?

ইরাবতীর বিস্ময় তখনও যায় না কিন্তু গল্প তো এখনও অনেক বাকি। ইরাবতী বলেন— তো রামকৃষ্ণ মিশনের খোঁজ কিভাবে পেলি?

—ও আমাদের গেরামের বেচারাম, যে বিশুর বাপকে মিশনে ঘাস কাটতে দেখেছিলো, সে তো ঠিকানা লিকে দিয়েছিলো গো বউদি কাগজে, সে ঠিকানা দেখা করালাম রাস্তার লোককে। তকন-লোকে দেখ্যে দিলো— হুই যে তোমার মিশন।

—বাব্বা! তুই একটা মেয়েমানুষের মত মেয়েমানুষ। খুঁজে বের করলি শেষে বিশুর বাপকে?

ইরাবতী প্রশংসার চোখে কমলাকে দেখেন! সে দুপুরের তিনি সাক্ষী। একটা কাজে গেছিলেন ওদিকে। ফিরছিলেন মিশনের পাশ দিয়ে। হঠাৎ ভীড় আর মেয়ে গলার কান্না, চিৎকার, কথাবার্তা শুনে একটু দাঁড়ালেন। মহাকালির মেজ দিদিমণি দাঁড়িয়েছেন দেখে ভীড় একটু সরে দাঁড়ালে তিনি কমলাকে দেখতে পেলেন। সামনে ধরা পড়া চোরের মত একটা রোগাভোগা লোক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। হাতে খুরপি। কমলার নামধাম তো সেদিন জানেন না, দেখলেন হা-ক্লান্ত, এলোমেলো, সাধারণভাবে শাড়ি পড়া একা মেয়ে, কপালে মেটে সিঁদুরের টিপ ধেবড়ে আছে, সিঁথির সিঁদুর গলে কপালে নামছে ঘামের সঙ্গে, লেপটে রয়েছে কপালে, গালে চুল খোলা, সঙ্গে দুটো বাচ্চা, একটা টিনের সুটকেশ, একটা ব্যাগ, সব চেপে শরীরের সঙ্গে ধরা রাখা, বাচ্চাদুটোও মায়ের কাপড়ে ধরে দাঁড়িয়ে, একটা হৈ-চৈ, কথাবার্তা চলছে।

—ভীড়ের কথাবার্তা শুনে আঁচ করলেন চোর-দায়ে ধরা পড়ার মত মুখ করা লোকটা গ্রামে তার বউ বাচ্চা রেখে, কিছু না বলে উধাও হয়েছিলো বহুদিন ধরে। বউটা যেভাবেই হোক, বরের ঠিকানা জানতে পেরে বহুদূর থেকে এসে তাকে খুঁজে বের করেছে— এ নিয়েই হট্টগোল চলছে।

হারানো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে বউটার— এরপর কারোই আর বিশেষ কিছু করার নেই। ইরাবতীর মত সম্ভ্রান্ত মানুষ রাস্তায় বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, এটাও শোভন নয়। ইরাবতী চলে এসেছিলেন কিন্তু ঘটনাচক্র এমনই, পরদিন বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন সেই বউটাকে।

— তুমি? এখানে কেন?

ইরাবতীর প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটা কেবল হাউমাউ কাঁদে। সেদিন চুলে মস্ত এলোখোঁপা, শাড়িটা কিছু গুছিয়ে পড়া, কেঁদেকেটে আবার সব এলোমেলো করে ফেলল।

—হয়েছে কী? কী চাও?

ইরাবতী ভেবেছিলেন কিছু টাকাপয়সা চায় বোধহয়, বরটা হয়তো ভাগিয়ে দিয়েছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরবে বোধহয়। কিন্তু কমলাকে আসলে তো তখন চেনেন না ইরাবতী। যে মেয়ে এক চিরকুট সম্বল করে মেদিনীপুর থেকে বেলঘরিয়ায় এসে বরকে খুঁজে বের করেছে, সঙ্গে দুই ছেলে মেয়েকেও এনেছে, সে ফিরে যাবার জন্য তো আসেনি।

সেদিন বুঝলেন কমলা কাজ চাইছে। তা সেসময় রান্নার বউ জ্যোৎস্না যাকে ইরাবতী বলতেন 'ঠ্যাং টানা' দেওয়া, তাই দিয়েছে। কাটোয়ায় ওর বরের বাড়ি চলে গেছে। জ্যোৎস্না এ বাড়ির সব কাজ, সব মানুষকে সামলে রাখতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার বর এসে উপস্থিত হলেই সে দু-তিন ছ'মাসের জন্য উধাও। তখন জ্যোৎস্না নেই, সংসারে বিশৃঙ্খলা, শাশুড়িরও খাটুনি যাচ্ছে, সঙ্গে চলছে চোপা। বিশেষত, ইরাবতীর উদ্দেশ্যে। যেন সংসারে যত কাজ তা ইরাবতীরই সৃষ্টি, সব কাজ একা হাতে না করতে পারাটা ইরাবতীর অপরাধ আর জ্যোৎস্নাকেও তিনিই ভাগিয়েছেন।

কমলাকে দেখে, কেন যেন ইরাবতীর ভালো লেগে গেল। তিনি শাশুড়ী আর শ্বশুরের মত নিয়ে কমলাকে রেখে দিলেন। শ্বশুরমশাই একটু খুঁত খুঁত করেছিলেন, একেবারে অচেনা। কুলশীল গোত্র জানা নেই।

—বাবা, ওর স্বামী তো মিশনের মালির কাজ করে। আমি নিজে দেখেছি। ওদের পদবী জানা, খারাপ কী? মেয়েটার চেহারাতেও একটা ভালোঘরের ছাপ আছে বাবা, দেখুন আপনি।

—যা হইবো তুমি দায়িক থাকবা।

ইরাবতীকে শাশুড়ি বললেও খুশি মনেই রাজি হয়েছিলেন। ষোল-সতের সদস্যের সংসারে কাজের লোক না থাকার সব চাপ তো শাশুড়ি আর ইরাবতীর ওপরই পরে।

— তোমার বাচ্চা দুটো?

—ওরা ঘরে থাকবে। মেয়েটা দেখেশুনে রাখবে ভাইকে। পারে গো বউদিদি।

কমলা বলেছিলো। পুরো ঘটনাটাই সে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে বলেছিল। সেদিন ছুটি ছিল ইরাবতীর স্কুলে, তাই ইরাবতী সব কথা শোনার মত সময় দিতে পেরেছিলেন কমলাকে।

—কালকে তো বউদিদি, মহারাজরা মিশনে থাকতে দেলো আমাদের। আর ছেলেমেয়ের বাপকে দিল ধুম বকা। কেন সে বউ ছেলেমেয়ে ফেলে এখানে লুক্কাইয়া আছে, তাই। তা ওদের মিশনে তো মেয়েমানুষ থাকতে পারে না। তাই আজ ওরা বললে সে মালির কাজ করতে পারবে, বেতনও পাবে কিন্তু থাকতে হবে মিশনের বাইরে— বউ-ছেলেপুলে নিয়ে।

—তো ওর রোজগারে বসে খা দুদিন। ছেলেপুলে নিয়ে।

—তা খেতে পারি না বৌদি। খুব পারি! পালাতে পারে বৌ ছেলেপুলে রেখে; একবার এসে যকন পড়েছি, ছাড়ন পাবে না। কমলা মাথা নেড়েছিল।

—কিন্তুন জমি, জমি ফিরাবো ক্যামনে গো বউদিদি? বস্যে খেলে?

সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিলো কমলার জমি বৃত্তান্ত। দেশগাঁয়ে ওরা বড়লোক না হলেও খেয়েপরে থাকা চাষি। পাঁচ-ছ বিঘা জমি ছিলো ওদের।

—জমি যকন ছেল, বড় মানুষ তো ছেলাম না বউদিদি, কিন্তুন কারো কাচে আত পাততে হয়নি, নিজের জমির চাল আর সবজি খেতে তো পেরেছি।

—সে জমি গেল কিসে?

ইরাবতী এমনিতেই গল্প শুনতে বড় ভালোবাসেন, গল্পের গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—শউর অসুকে পড়লো যে গো। হাসপাতাল, ডাগদার, ওষুধ, কিছু জমি তাতে গেল, ওদিকে ছেলেমেয়ের বাপের নেশা খাওয়া অব্যেস, বাপের অসুকে বাপ নিস্তেজ হতে নেশার মাত্রা চড়ে গেল। আর কি? সব জমি পরের হাতে বন্ধক পড়লো গো বউদিদি। একন আমরা এক্কেবারে ভূমিহীন—

'ভূমিহীন' কথাটা কমলা এমনভাবে বলে যেন কোন বই থেকে পড়ে এই কথাটা মুখস্ত করেছে।

—তোর নিজেদের ঘরবাড়ি নেই?

ইরাবতী নিজের বাড়িতে বসে বড়ই গর্বের সঙ্গে বললেন। এই বাড়ি তার নয়। ইরাবতীর ছেলেমেয়ের বাপেরও নয়। এ বাড়ি তার শ্বশুরের। তা শ্বশুরের ভিটাতেই তো থাকে বাড়ির বউ। এ বাড়ি তো আমারও।

গর্বের সঙ্গে ভাবলেন ইরাবতী।

—তাছাড়া শ্বশুরের ছিল কী যে এই বসত জমিটুকু কিনবেন? বসতবাড়িটা তুলবেন? মোট চারশো টাকা দিতে পেরেছিলেন শ্বশুর জমি আর বাড়ি বাবদ। বাকি সবটাই ইরাবতীর স্বামী, এ বাড়ির বড় ছেলের দেওয়া টাকার তৈরি। যদিও শ্বশুরের নামেই সব। আবার পাশে চৌদ্দ কাঠা জমিও কেনা রয়েছে, যা ছেলেমেয়ের বাবার নিজের। বড়ছেলেটা স্কুল পাশ করে যাদবপুরে ইলেট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢুকেছে। পড়া শুরু হয়ে গেছে, শেষও হয়ে যাবে। তখন বাড়িঘর তৈরিতে হাত দেবে ওদের বাবা। ছেলে দাঁড়িয়ে গেলে বাপ তখন জমানো পয়সায় হাত দেবার সাহস পায়। বাপের স্বপ্ন ছিল বিদেশ থেকে ডক্টরেট করার। সে স্বপ্ন শেষ করে সে এখন বাড়ি ফিরে থিতু হতে চায়।

নিজের বাড়ি। বসত ভিটা। বাড়ি পাকা হবে। এ বাড়ির মত মাটির মেঝে, বেড়ার দেওয়াল, টিনের চাল নয়। সব পাকা, ইট সিমেন্ট সুরকির। ঢালাই ছাদ। পাকা। আমার নিজের বাড়ি। চার পাঁচটা ঘর। লাগোয়া স্নানঘর। ইরাবতীর একথা ভাবতে আনন্দ হলো।

শ্বশুর শাশুড়ি সবাই ওই বাড়িতেই চলে যাবেন। বাড়ি তৈরি হয়েগেলে। ওদের বাবা লোনের দরখাস্ত করেছে। কেউ জানে না বাড়িতে, ইরাবতী বাদে। নিজের বাড়ি, বসত ভিটা নিয়ে তখন ইরাবতীর মনে অনেক স্বপ্ন। ইরাবতী তাই কমলাকে খুব করুণা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— তোদের নিজেদের ঘরবাড়ি নেই?

—তা আচে গো বউদিদি। ওটা একনও আছে। শউর শাউরি থাগে। ছোট দেওর, জা থাগে। কি ঝানি বউদিদি গিয়ে দেকবো হয়তো ওই ভিটাও বেচে খেয়েচে শউর-দেওর। কমলা আনমনা হয়।

—তা তুই এসে পড়লি, ও বসতভিটাও দ্যাখ হাতছাড়া না হয়, আর এদিকে শহরে তো নেশা খাবার আরও ধুম। এখানে কি তোর বর নেশা খেয়ে পয়সা ওড়াবে না!

—সে হবে না গো বউদিদি। কমলি এবারে সেয়ানা হয়েচে। মহারাজাদের সনগে কথা করে এইচি। মাস গেলে ট্যাকা আমি নেব। আর আমার গতর নাড়িয়ে চাড়িয়েও চাট্টি পয়সা তো কামাই করতে পারবো গো। দেবে না তোমরা চাট্টি ট্যাকা? কেবল কি পেটভাতায় রাকবে?

—তা তো দেবো কমলা। তাতে তোর হবে? জমি উদ্ধার?

—হবে, হবে গো। ও জমি আমি উদ্ধার করে ছাড়বো দেকো তুমি। অমন সোনার জমি। ও জমি উদ্ধার যদি না করেচি তো আমি কমলি নই এই বলে রাকচি বউদিদি।

যেন বা তার কমলা নামের কতই গৌরব— এভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে কমলা।

যেদিন কাজে লাগলো, সেদিনই, সন্ধ্যা নামার আগে, ইরাবতীকে তার জমি উদ্ধারের 'পিতিজ্ঞা'-র কথা সবটাই শোনানো হয়ে যায় কমলার। কমলাবালা জানা।

এরপর পুরো এক বছর কমলা কাজ করেছে ইরাবতীর যৌথ সংসারে।

—তোমার শাউড়ির বড় মেজাজ গো বউদিদি। এই এক নালিশ কমলার। আর নালিশ— ওই অত বড় এক চইড় আটা মাকতে মাকতে আমার ড্যানায় দুক্কো করে গো বউদিদি। কত রুটি খাও গো তোমরা!

তা দুটো নালিশই সত্যি। শাশুড়ির সত্যিই বড় মুখ। মেজাজ। সেকেলে মানুষ। ভাবেন বাড়ির বউ আর কাজের ঝি দুজনকেই মেজাজ দেখিয়ে দমিয়ে রাখতে হয়। না হলে তারা মাথায় উঠে বসে। শাশুড়ির মেজাজের ধার তাই শিক্ষিকা, রোজগেরে ইরাবতীরও সহ্য করতে হয় আর কমলাকে সইতে হবে, এ আর বেশি কথা কী। তবে তিনি যতটা পারেন, আগলে রাখেন কমলাকে। মেয়েটাকে তার ভালো লাগে, সেজন্যও বটে আবার কমলা চলে গেলে সংসারের কাজে বিপর্যয় দেখা দেবে, সেজন্যও।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটা থেকে আর কমলাকে বাঁচাবেন কী করে? পনের জন লোকের সংসার। তার মধ্যে সাতজনই জোয়ানমর্দ বা উঠতি বয়স। সন্ধ্যায় এক গামলা আটা মাখা হয়। কমলা মাখে। হাতে ব্যথা করা স্বাভাবিক। গাদাগাদা রুটি হয় যে।

কমলা অবশ্য রুটি খায় না। কয়েকটা রুটি, একটু ব্যঞ্জন দিয়ে দিতেন ইরাবতী। বাড়ি নিয়ে যেত সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যায় ওর ছেলে মেয়ে জামাই— ওই দিয়ে 'টিপিন' করতো। রাতে কমলা বরের আনা বাজার কুটে বেটে রান্না করতো। রাতে সবাই মিলে ভাত খেত। দিনের বেলা তো এ বাড়িতেই কাঁসি ভরা ভাত খেত কমলা। রাতে রেঁধে বেড়ে নিজের বাড়িতে।

— সারাদিনমানের পর ওতেই বড় সুক বউদিদি গো। কমলা কেমন বিভোর হয়ে বলত।

—সারাদিন ভুতের খাটনী। সারাদিন সে যেমন ঘুরছে, পরের ঘরে-দোরে গতর খাটাচ্ছে, ছেলেমেয়েগুলান অনাথের মতো, ওই আত্তির বেলা একসাথে দুটো ভাত খেতে বসে বড় সুক গো বউদিদি।

ইরাবতী অবশ্য সে সুখ ভোগ করতেন না। সারাদিন ভুতের খাটনি তিনিও খাটতেন। সকালে-রাতে ঘরের কাজ, সারাদিন স্কুলে। রাতে শ্বশুর, দেওর, ননদ, ছেলেমেয়ে সবাইকে খাইয়ে শাশুড়ি আর জায়েরা খেতে বসেন, তাতেও আনন্দ আছে। জায়েরা, কখনো-কখনো থাকে না, তখনও শাশুড়ি কিন্তু ইরাবতীকে ফেলে খেতে বসতেন না কখনো রাত্তিরে। সারাদিন যতই মুখ ছোটান, রাতে ইরাবতীকে নিয়ে খেতে বসেন শাশুড়ি। অতবড় সংসারকে খাইয়ে, প্রায়ই কম পড়ে খাবারে, যা থাকে শাশুড়ি-বউ সমানভাগে ভাগ করে খান। এ বিষয়ে শাশুড়ি একেবারে মায়ের মত। লজ্জা-লজ্জা করে বলেন— ও ইরা, তরকারি তো কিছু নাই, আইজ কষ্ট কইরা খাও। কাইল আগে একবাটি তরকারি আমরা সরাইয়া রাখুম।

সেই সরানোটা অবশ্য কোনদিনই হয় না। তবু শাশুড়ির ওইটুকু মুখের কথাতেই সুখ।

— সুখের যে কত রকম।

ইরাবতী ভাবেন।

কমলার সুখ রাতে ছেলেমেয়ে-বরকে নিয়ে খেতে বসায়। কমলার সুখ গ্রামে তার শ্বশুরের বন্ধক রাখা জমি উদ্ধারের স্বপ্নে। ইরাবতীর সুখ অনেক রকম। ছেলেমেয়েরা ভালো হবে। পড়াশুনা শিখবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে— ছেলেমেয়েদের বাবা, সারাজীবন কেবল কষ্ট আর সংসারের জন্য ত্যাগ করে গেল, নিজে অনেক কষ্ট করেও স্বামীর বিদেশ থেকে ডক্টরেট করার স্বপ্ন পূর্ণ করতে দিয়েছেন ইরাবতী। এবার আরও কিছু স্বপ্ন পূরণ হবে এইসব ভাবনার সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, দেওর-ননদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নও মিশে থাকত— সঙ্গে স্কুলটা আরও ভালো হবে, স্কুলে বড় স্থানাভাব, বড় বিল্ডিং হবে স্কুলে, এসব স্বপ্নও এসে যেত চোখে আর সেইসব স্বপ্নের সঙ্গে এসে মিশেছিলো একটি বাড়ির স্বপ্ন। পাকা বাড়ি, পাকা ঘর, লাগোয়া স্নানঘর, বারান্দা, ছেলেমেয়েদের নিজস্ব পড়ার ঘর, একটু বাগান— একটা নিজের ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোছানো প্রাইভেসি। মাটির ঘর লেপার কষ্ট নেই, টিনের চাল ফুটো হয়ে জল পড়ার ঝামেলা নেই— ঘরে সাপ ঢুকে পড়ার ভয় নেই। রাত দুপুরে দরজা খুলে হ্যারিকেন নিয়ে দূর বাথরুমে যাবার ঝামেলা নেই।

ইরাবতীর বাড়ি এক বছর কাজ করেছিলো কমলা। এক বছরের মধ্যে জ্যোৎস্না দুবার ফিরে এসেছিলো কিন্তু তাকে রাখতে রাজি হয়নি বাড়ির কেউ। ইরাবতী জ্যোৎস্নার জন্য দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু কমলাকেই বা হঠাৎ করে ছাড়ানো যায় কী করে? কিন্তু যে কমলার জন্য জ্যোৎস্নার মত পুরনো, সব কাজে পটু লোককে ফিরিয়ে দেওয়া, সেই কমলাই এক বছর পর এসে একদিন বললো— বউদিদি গো, তোমাদের ঘরে আর কাজ করবো না আমি।

আগের দিন শাশুড়ি কিছু গালমন্দ করেছিলেন কমলাকে, কাজের খুঁত ধরে। ইরাবতী সেকথা ভেবে শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন— মায়ের কথায় রাগ হয়েছিল কমলা? উনি তো এমনই। আমাকেও তো বলেন।

— সে তুমি বাড়ীর বউ হয়েচ, শাউড়ি দজ্জাল হলে কতা শুনবে, তোমার তো ছাড়ান-কাটান নেই। আমি হলাম গিয়ে বাড়ীর ঝি। আমি ক্যানো অত কতা শুনবো— কিন্তু সেজন্য না গো বউদিদি। তোমার বাড়িতে এই এক বছর কাজ করে মানুষ হয়েচি গো বউদিদি। শওরের হালহদ্দ বুজেছি। তোমার বাড়ির যে নুন খেয়েচি তা এজন্মে শোধ হবে না। কিন্তুন একানে থাগলে বৌদিদি আমার জমি উদ্ধার হবে না।

—ক্যানো রে?

—বউদিদি, একবাড়িতে কাজ করে কত টেকা বলো? ঠিক করেছি সকালে বিকেলে ঠিকা করবো। তাতে তোমার বাড়ির ভরপেট ভাত পাবো না, না-ই পেলাম, টেকা তো অনেক বেশি পাবো দশবাড়ির কাজে। জমি-উদ্ধারের টেকা তাড়াতাড়ি জমাতে পারবো, নয়তো ও জমি আর বাঁচাতি পারবো না গো বউদিদি। একন তাই দশবাড়িতে ঠিকা করবো। তোমার বাড়ি গোটা দিন পড়ে থাকলে তো জমি বাঁচবে না বউদিদি।

কমলার কথা শুনে ইরাবতীর যে একটু রাগ হয়নি তা নয়।

—ছিলো গাঁইয়া ভুত একটা। ছাইভস্ম দিয়ে ছাড়া বাসন কীভাবে মাজে জানত না। তরকারি কাটার কোন ঢঙ জানত না। কেবল মাটির ঘর-উঠোন লেপা পোঁছা ছাড়া আর কোনো কাজই ঠিকমত জানত না। কাজকর্ম শিখিয়ে মানুষ করলেন, এখন পাখা গজিয়েছে, ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে।

কিন্তু কি করবেন? কেনা দাসী তো আর না। ইচ্ছে করলে কাজ করবে, নয়তো অন্য কোথাও গেলে যাবে, আটকাবেন কী করে? তাছাড়া ওর কথাতে যুক্তিও তো আছে। দশবাড়ি কাজ করলে টাকা তো বেশি পাবেই। কমলা চলে গেছিলো। এক বছর কাজ করে। অবশ্য তাতে খুব বেশি ক্ষতি কিছু হয়নি। জ্যোৎস্নার বর তখনও উধাও হয়ে আছে। জ্যোৎস্নার ভাই-এর বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়ে জ্যোৎস্নাকে পাওয়া গেল। কাজ করলে জ্যোৎস্না এবাড়িতেই করে। নয়তো বসে থাকে। জ্যোৎস্না কাজে লেগে যাওয়ায় কমলাকে অচিরেই ভুলে গেল সবাই। এবাড়ির কে মাছের তেলের বড়া ভালোবাসে, কে ডালের বড়া আর কে পলতা পাতার ঝোল, সব নখদর্পণে জ্যোৎস্নার— শাশুড়িকে যে একটু দুধ সরিয়ে রেখে গুড়ে চালে সেদ্ধ করে দিলেই খুশি করা যায়, তা না থাকলে আটা-চিনি জলে গুলে গোলা রুটি করে দিলেই শাশুড়ি মহাখুশি— এসব তুচ্ছ কিন্তু দুর্লভ খবরও জ্যোৎস্নাই কেবল রাখে। কাজেই জ্যোৎস্নাকে পেয়ে এবাড়ি কমলাকে ভুলে গেল। তবে কমলা ভোলেনি। রাস্তায় ইরাবতীকে দেখলেই ছুটে আসে বালিকার মত। —বউদিদি কেমন আছো গো? কচিগুলো কেমন? দাদাবাবু? বাড়ির সবে? কচি মানে ইরাবতীর ছেলেমেয়েরা। কমলার কাজ ছেড়ে চলে যাবার পর, এই গল্পে আবার যখন ইরাবতীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তখন কতদিন, কত বছর পার হয়েছে, ইরাবতীকে জিজ্ঞেস করলে, সে কথার উত্তর হয়তো তিনি দিতে পারবেন না।

আসলে সময়ের হিসেব তো ঠিক দিন গুণে হয় না। তার সঙ্গে যোগ করতে রাতগুলোকেও। সঙ্গে যোগ হয় দিনগুলোর ভার। সুখ সৌভাগ্যের দিনগুলো আসে পাখির ডানায় ভর করে। উড়ে যায় ফুড়ুৎ করে, কখন টেরও পাওয়া যায় না। দুঃখ আর দুশ্চিন্তার দিনগুলো এত ভারী— যেন তারা কেবল আসেই, কিন্তু চলার ক্ষমতা নেই বলে যেতে পারে না।

ইরাবতী বুকে সেই দুঃসহ ভারী দিনের ভার নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর এই কর্মহীন বসে থাকা নিয়ে শাশুড়ির সদা মুখর গলা এখন নীরব, নিশ্চুপ। বাড়িতে এত নীরবতা, যেন কোন মানুষ নেই বাড়িতে। অথচ শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, জা, এমন কি ওদের বাবাও রয়েছে বাড়ীতে। রয়েছে দুই ছেলে-মেয়ে, কেবল বড় দুই ছেলে নেই ঘরে।

বড়জন, তবু জানেন, কলকাতায়, মামাবাড়িতে আছে। ওখান থেকে কলেজ যাচ্ছে। মেজ এখানেই আছে, অথচ বাড়িতে নেই, কোথায় ঘুরছে, কী খাচ্ছে, জানেন না ইরাবতী। ওকে ঘিরে রয়েছে বিষাদ। একথাও যত ভাবছিলেন, অসহ্য লাগছিলো।

ওরা আগেও এসেছিল একদিন, আবার এসেছিল গতকাল। যদিও বিবাদ, বিভেদ, সন্দেহ আর শত্রুতার আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল আরও অনেক আগে থেকেই। ইরাবতী চোখের সামনে দেখছিলেন সেই রূপান্তর। আজকে যে বন্ধু, কাল কী করে সে প্রধান ও একমাত্র শত্রু হয়ে উঠল।

ওরা, যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে ইরাবতীর দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে ওদের হাতে তুলে দেবার হুমকি নিয়ে এসেছিল, তাদের নেতা পঞ্চু, বুধাই এবং আরও কয়েকজন, এই কিছুকাল আগেও এই বাড়িতে, তাঁর ছোটো দেওরের কাছে এসেছে, দেওরের ঘরে বসে চা খেয়েছে, মুড়ি আর চানাচুর খেয়েছে, আড্ডা দিয়েছে, রাজনীতি আলোচনা করেছে। গালগল্পও। হয়তো সেইজন্যই, ওদের বাবা সেদিন ছেলেদের রক্ষা করতে পেরেছেন।

দুই ছেলেই তখন ঘরে, ভাত খাবে। পঞ্চু-বুধাইদের দল তখন বাড়ি ঘেরাও করে, প্রায় জনা পঁচিশ সশস্ত্র লোক নিয়ে। ওদের বাবা, খাওয়া ফেলে উঠে গেছিলেন— বাড়ীর মধ্যে তারই কেবল সেই সাহস আর যোগ্যতা ছিল ওই সশস্ত্র যুবকদের দলটি, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈষৎ মদ্যপ, তাদের মুখোমুখি হবার। ওদের বাবা, চোখের পাতা পর্যন্ত না কাঁপিয়ে বলেছিলেন— ওরা তো বাড়ি নেই। —বিশ্বাস করি না বে।

বের করে দে।

ওদের মধ্যে যারা ঈষৎ মাতাল ও অচেনা, তাদের কেউ বলেছিল।

—আঃ। চুপ।

পঞ্চু, ওদের দলনেতা, বিশাল লম্বা চেহারা, নম্রতার লেশমাত্র নেই চেহারায়, তবু যথাসাধ্য সংযত গলায় বলেছিল— বের করে দিন দাদা এক্ষুনি। নয়তো বিপদ হবে বাড়িশুদ্ধ সবার বিপদ।

ছেলেদের বিপদ মানেই তো বাড়িশুদ্ধু সবার বিপদ— ওদের বাবা মনে মনে বললেও মুখে বলেছিলেন, শান্ত স্বরে—তার চেয়ে তোমরা বরং ঘরে এসো। এ বাড়ি তো তোমাদের অচেনা নয়। কদিন আগেও এসেছ, চা খেয়েছ, ওদের মায়ের হাতে বানানো, ওদের ছোটকার সঙ্গে রাজনীতি নাটক আবৃত্তি, কত গালগল্পও করেছ। এর মধ্যে এত কী ঘটে গেল যে তারই ভাইপোদের তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খুঁজতে এলে?

—আপনি হয় জানেন না, নয় জেনেও না জানার ভান করছেন। পঞ্চু এখন বেশ উগ্র।

—ওরা এখন ভয়ংকর। ওদের নিকেশ করা ছাড়া রাস্তা নেই।

—নিকেশ, নিকেশ। ভীড়টা রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে আওয়াজ করছিলো।

—কী বলছো তুমি পঞ্চু? তুমি ওদের কাকার বন্ধু, ওদেরও কাকাই হলে। কী বয়স ওদের? কতটুকু বুদ্ধি? ভুল করলে, এসো বাড়িতে, বোঝাও, শুধরে দাও। নিকেশ করার প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে? বলছোটা কী? যে কথা শুনে ইরাবতী জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন এমন মনে হচ্ছিল, সে কথা শুনেও ওদের বাবা ধৈর্য্য হারাননি, আত্মসংযম হারান নি। শান্তভাবে কথা চালিয়ে গেছিলেন ওদের সঙ্গে। স্বামীর কথা ভাবতেও ইরাবতীর গর্ব হয়, তিনি অতগুলো সশস্ত্র ছেলে, অনেকেই ঈষৎ নেশাগ্রস্ত, তাদের সামনে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন— কতটুকু বয়স আমার ছেলেদের? নেহাৎই বালক। কোন ধরনের খুনোখুনি, মারামারি সঙ্গে ওরা জড়িত নয়। ওদের সঙ্গে কথাবার্তার রাস্তায় না গিয়ে ওদের নিকেশ করার কথা ভাবছ কী করে? কে তোমাদের এই ভুল রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে?

—আপনি যত বালক ভাবছেন, তত বালক ওরা নয়। লুকিয়ে পোস্টার সাঁটে 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'।

পঞ্চু বলতে এসেছিলো মারদাঙ্গা, খুনোখুনির ভাষা। কিন্তু এক বহু পুরানো, বহু ছাত্র পড়ানো প্রফেসরের কথা তাকে কথার ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যুক্তির বদলে যুক্তি খুঁজছিল সে। তাছাড়া, এ তো সেই বাড়ি, যেখানে তারা বহু সন্ধ্যা কাটিয়েছে, বহু ভালো সময়, সেই স্মৃতির উল্লেখও তাকে ভেতরে ভেতরে নরম করে ফেলছিল নিশ্চয়ই।

—কথাটা বন্দুক সংক্রান্ত হলেও, শ্লোগানটা রাজনৈতিক। রাজনীতির মোকাবিলা রাজনীতি দিয়েই করা দরকার, রাজনীতির মোকাবিলায় কাল পর্যন্ত তোমরা যারা এক শিবিরে ছিলে আজ পরস্পরের বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে তুলে নিলে তাতে কাদের লাভ, ভেবে দেখেছ? আর আমি আবারও তোমাদের বলছি, আমার ছেলেরা কোন ধরনের খুনোখুনি, মারামারির সঙ্গে জড়িত নেই—

—আজ নেই, কাল হবে জড়িত। আমরা সে রিস্ক নিতে পারি না।

বুধাই মাতব্বরের ভঙ্গিতে বললো এবং তখনই পঞ্চু বলে ফেলল— তড়িদা তো ঝামেলা করেনি। ভালোমানুষের মত এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। আপনার ছেলেদেরও বাইরে পাঠিয়ে দিন। এ এলাকায় বসে ওরা নকশাল করবে তা আমরা বরদাস্ত করবো না।

—সে তো ঠিকই। এলাকা একদিন মিনু মিত্রের ছিলো, তখন এখানে জায়গা করে নিতে তোমাদের অনেক ফাইট করতে হয়েছে। আজ বহু কষ্টে তোমরা এলাকার দখল নিয়েছ, এখন এখানে অন্য কারো অস্তিত্ব মেনে নেবে কী করে?

ছেলেদের বাবা আলগোছে কথাটা বলেই আসল জায়গায় ফিরে এলেন— তা তোমরা যদি চাও, তবে তাই হবে। পাঠিয়ে দেবো ওদের অন্য কোথাও। এ এলাকায় ওরা আর আসবে না। পড়াশুনা করে, কলকাতায় পড়াশুনা করবে। বাড়িতে না হয় থাকবে না, তাতে কী হলো— এখন বলো ঘরে আসবে? চা খাবে? না এমন যুদ্ধং দেহী ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

— নাঃ। আমাদের এখন চা খাবার সময় নেই। আমরা কাজে বেরিয়েছি। কাজ এখনও বাকি আছে আরও। বলে পঞ্চু দলটাকে রওনা করিয়ে দিয়েছিল। এরপরের যে বাড়ী ঘেরাও করে তাদের ছেলেকে ওদের হাতে তুলে দিতে বলবে, সে দিকে। নিজে একটু দাঁড়িয়ে, দু পা পিছিয়ে উদাসীনভাবে বলেছিলো — দাদা, ওদের বাইরে পাঠিয়ে দিন। ইমিডিয়েটলি।

— থ্যাঙ্ক ইউ পঞ্চু।

ওদের বাবা নীচু গলায় বলেছিলেন। পরদিনই, বড় ছেলেকে কলকাতা, মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। সে রাজি হল কারণ, এলাকায় সে রাজনীতি করে না। কলেজ ক্যাম্পাস তার রাজনীতির কর্মক্ষেত্র।

কিন্তু মেজ রাজি হয়নি। কারণ সে নকশালবাড়ির রাজনীতি এলাকায় ছড়িয়ে দেবার পণ করেছে। এজন্য অন্য দলের গুন্ডা বাহিনীর সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত করবে এলাকাকে।

পঞ্চুদের সঙ্গে কথা বলতে যিনি একবারও ইতঃস্তত করেননি— ছেলেদের সেই বাবা— ছেলেকে কিছু না বুঝিয়ে রুদ্ধবাক বসে রইলেন, যেন তার সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

ইরাবতীই তখন বললেন— তোরা পাঁচ-ছটা ছেলে, ওদের অত বড় গ্যাং। ছুরি, বোমা, পাইপগান, পিস্তল, স্টেনগান, কী নেই ওদের? ওদের সঙ্গে লড়তে যাবি? তোরা কি মূর্খ না উন্মাদ?

—আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ, আমি হঠাৎ আমারে চিনেছি। আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

—কিন্তু এখন কী হবে?

—মেজকেও যেভাবেই হোক, পাঠাতে হবে বাইরে। এভাবে তো খুন হবে একদিন ওদের হাতে।

মেজ কিন্তু এলাকা ছাড়তে রাজি হয়নি। এলাকাতেই ওদের পাঁচজনের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়েই হয়ত, পরদিন বাড়ি ঘেরাও নয়, একটা মিছিল এলাকা ঘুরে ওদের বাড়ির উঠোন লাগোয়া জমি দিয়ে হেঁটে যায়। তছনছ করে যায় সবজি বাগান। এ ঘটনার পর বাড়িশুদ্ধ সবাই যখন মেজছেলের নিরাপত্তার চিন্তায় পাগল, হঠাৎ-ই খেয়াল হলো ইরাবতীর মেয়ে বাড়ি নেই।

দাদাদের সব কথায় সে মাথা হেলায়, সায় দেয় বটে, কিন্তু না বলে তো বাড়ির বাইয়ে যায় না। তার ওপর এই পরিস্থিতি! এ নিয়ে সবাই যখন উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় দিশেহারা, তখন বৃষ্টি এসেছিল আকাশ ভেঙ্গে। রাত আটটায় বৃষ্টি থামার আধঘণ্টা পরে মেয়ে বাড়ি ফিরেছিল। রাগ আর দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তা থেকে রাগ, যেন পাগল হয়ে গেছিলেন ওদের বাবা। কী প্রচণ্ড মেরেছিলেন তিনি ওই অতবড় মেয়েকে— ভাবলে এখনও কেঁপে ওঠেন ইরাবতী। মেয়েটাও কেমন ঠ্যাঁটা। মুখ বুঁজে মার খেল। ওদের বাবা থামলে, একটু না কেঁদে, কোনো অভিযোগ না করে বলল— ইকবাল চাচার ডেরা খুঁজে বের করতে দেরি হল। তারপর বৃষ্টি, চাচা তো ছাড়ল বৃষ্টি থামার পর।

— কে ইকবাল? কেন গেছিলি সেখানে?

—ইকবাল চাচাই তো ওদের লিডার। তাঁকে সব বললাম। বললাম ওদের মিলিটারি শক্তি অনেক, এলাকার উদ্বাস্তু জনগণও মিনু মিত্রের গুন্ডারাজ অবসান আর উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে ওরা সঙ্গ দিচ্ছে বলে ওদের সাথে, এ অবস্থায় পাঁচ-ছজন মিলে এলাকা দখল রাখার চেষ্টা করাটা—

—কী বলল ইকবাল? ওদের বাবা কে ইকবাল না জেনেও অস্থির হয়ে প্রশ্ন।

ইকবাল চাচা বলল— এসব ইনফ্যানটাইল ডিজঅর্ডার। আমি চিঠি দিচ্ছি ওদের, পারলে আজই ওদের এলাকা ছাড়তে বলো।

—কোথায় চিঠি?

—আছে। ওটা তোমাকে দেখানো যাবেনা। কনফিডেনসিয়াল। যে বাবাকে ভগবানের মতো মান্য করে মেয়েটা, সে অত মার খাবার পরেও অকুতোভয়ে বাবাকে বলেছিল। ওদের বাবা উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন মেয়েকে— আমাকে ক্ষমা করে দে মা। ও যদি এ চিঠি পেয়ে এলাকা ছাড়ে, কত বড় কাজ করলি তুই, নিজেও জানিস না।

পরদিন এলাকা ছেড়ে চলে গেছিল মেজ ও তার সঙ্গের ছেলেরা।

—কিন্তু যাবে কোথায় ওরা?

ইরাবতী রাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বামীকে।

—কোথায় আর যাবে? আমাদেরই ব্যবস্থা করতে হবে।

—মানে?

ইরাবতী বিছানায় উঠে বসেছিলেন।

—মানে কলকাতায় বাসা ভাড়া করতে হবে। তোমার ছেলে শর্ত দিয়েছে সেখানে ওর বন্ধুদের থাকতে দিতে হবে। থাকবে। তবু তো নিরাপদ হবে। কলকাতায় কে ওদের চিনবে?

—একা থাকবে ওরা? ভাড়াবাসায়?

—না, তাই কী হয়? আমরাও সবাই যাবো। ছোটু এখন ওর দাদু-ঠাকুমা-কাকিমার কাছে থাক। পরের বছর কলকাতার স্কুলে ভর্তি করে ওকেও নিয়ে যাব।

ইরাবতীর মাথায় যেন বাজ পড়েছিল। এই সংসার, এই বাড়ি ছেড়ে যাবার কথা কখনও ভাবেননি, আর এখন তো ওদের বাবা অফিসে হাউসবিল্ডিং লোনের জন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছে। নতুন পাকা বাড়ি তুলবেন, নিজেদের বাড়ি, নিজেদের জমিতে। এখন সব পেছনে ফেলে কলকাতার ভাড়া বাড়িতে উঠে যেতে হবে?

—আর মা-বাবা? ওদের দেখাশোনা?

—টাকা দেব। ভাই-ভাইবৌয়েরা এবার দায়িত্ব নেবে মা-বাবার। কী করবো বলো ইরা? আমি তো নাচার। আমি তো বাবা, তুমি তো মা। এখন আমাদের প্রধান কাজ ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা। এই দুর্যোগের দিনে ওদের পাশে না দাঁড়লে কবে দাঁড়াব? এই দুর্যোগ থেকে ওদের বের করে আনতে হবে ইরা। ওদের রক্ষা করতে হবে।

ইরাবতী হু-হু করে কেঁদে উঠেছিলেন বালিশে মুখ গুঁজে। ছেলেদের বাবা হাত রেখেছিলেন ইরাবতীর মাথায়।

—কেঁদো না ইরা। সব কষ্ট, দুশ্চিন্তার মধ্যেও বাবা হিসেবে এক গর্ব আমার ইরা, যে বয়সে ছেলেমেয়েরা কেবল নিজেদের নিয়ে বেশি ভাবে, যে বয়সে নার্সিসিস্ট কমপ্লেক্সে ভোগে ছেলেমেয়েরা, সে বয়সে আমার ছেলেমেয়েরা তো নিজেদের কথা নয়, নিজেদের কেরিয়ার নয়, পরিবারের কথাও নয়— দেশের মানুষদের কথা ভেবেছে, গরিব মানুষদের কথা ভেবেছে, দেশটাকে বদলাতে চেয়েছে, চাইছে। এখন ওদের পাশে আমাদের থাকতে হবে। ওরা ভুল করবে, এটা ভুল করারও বয়স। কিন্তু আমরা মা-বাবা, আমরা ওদের রক্ষা করব ইরা, করতে হবে—

পরদিন সকালে উঠেই কলকাতা চলে গেছিল ওদের বাবা।

বাসা ভাড়া ঠিক হয়ে গেছে। ওরা চলে যাবেন, তার গোছগাছ চলছে। বাড়িতে যেন শ্মশানের নীরবতা। কারো মন ভালো নেই। মুখরা শাশুড়ি নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছেন— ও ইরা, তোমারে খোকারে, নাতি-নাতনির মুখ না দেইখ্যা বাঁচমু কেমনে? কখনো অপটু হাতে সাহায্য করছেন গোছগাছে। শ্বশুরমশাই বিষাদমলিন নির্বাক মুখে বসে। মাঝে মাঝে কেবল বলছেন— তবু ওদের রক্ষা করো বউমা। ছেলেমেয়েদের সবার মন খারাপ। যে দেওর এখনও পঞ্চুদের কট্টর সমর্থক, সেও গলা নিচু করে কাকে গাল পাড়ছে আর চোখ মুছছে, সে ও-ই জানে।

জ্যোৎস্না, ছেলেমেয়েরা পিসি ডাকে, সে ওদের নিজের পিসির চেয়েও বেশি আপন, গোছগাছ করে দিচ্ছে সে-ই। ইরাবতী বসে আছেন, হাতে পায়ে জোর নেই। জ্যোৎস্নাও চোখ মুছছে— তোমার মেয়েকে না দেখে আমার একবেলাও কাটে না গো বউদি। গোছাতে গোছাতে সে বলছে।

—আসবে। ও আসবে মাঝে মাঝে। আশা করি ওর গায়ে কেউ হাত দেবে না।

ইরাবতী বললেন।

—দরকার নেই। পাঠিও না বৌদি। কার মনে কী আছে।

জ্যোৎস্না সভয়ে বলল।

এমন সময় কমলা এলো। কমলা আজ খুব সেজেছে। এত দুঃখের ভেতরও ইরাবতী খেয়াল করলেন। মস্ত খোঁপা যত্নে বাঁধা। বড় সিঁদুর টিপ। নতুন শাড়ি কলকাতার ঢঙে কুঁচিয়ে পড়া।

—বউদিদি গো, বাড়ি চলে যাচ্ছি। কমলা ইরাবতীর মুখের বিষাদ লক্ষ্য না করেই বলল।

—জমি সব বন্ধক ছাড়া করেছি। জমি একন আবার সবটা আমাদের হয়ে গেছে। তাই দেশে যাচ্ছি গো বউদিদি ফেরত। আমার মিনসেও যাবে। সবাই একসঙ্গে ফিরে যাবো গেরামে।

—খুব ভালো কথা কমলা। বড় খুশি হলাম।

ইরাবতী বিষাদের ভেতরই হাসলেন। হঠাৎ কী যেন মনে পড়লো, ছেলে না মেয়ে, কার থেকে শোনা কথা মনে পড়ল ইরাবতী বলল— হ্যাঁ, মেদিনীপুরের কোন গ্রামে না তোর বাড়ি। সেখানে নাকি জোতদার-মহাজনদের খুব অত্যাচার? গরিবদের ওপরে? চাষিদের ওপর? ভূমিহীনদের ওপর?

ছেলেদের মুখে শোনা কথা মনে এলো ইরাবতীর।

—তা নয়তো কি না? মহাজনেই তো জমি বন্ধক রাখে গো, জমি নি নেয় ছল করে। একবার দশটা টেখা ধার নেও কেনো ওর কাচ থেকে, ওর আর শোধ হবেনি সুদে আসলে, কোনোদিন, কেবল লম্বা হবে— তবে আমি বউদিদি সব্বো শোধ দিইচি ওর খাঁকতি মিট্যে। একন সব জমি আমাদের কাচে চলে এয়েচে বউদিদি।

কমলা কী সুন্দর করে হাসলো। কী সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে। ইরাবতী দেখলেন চেয়ে চেয়ে।

—বাড়িঘর দোর সব্ব-সারাবো বউদিদি। কিছু টেকা সনগেও রেকে দিইছি।

কমলা বললো, তারপর কি যেন মনে পড়তে বললে।

—তোমার বাড়ি কবে বানাবে বউদিদি? গৃহপ্রবেশের দিন জানিয়ে চিঠি দিও। আমি ঠিকানা দে যাই। যেথা থাকি ছুট্টে আসবো বউদিদি।

জ্যোৎস্না চোখ টিপে চুপ করে করতে বলেছিল কমলাকে। ইরাবতী জ্যোৎস্নাকে বললেন— ওকে বলতে দে জ্যোৎস্না। আর ঠিকানাটা লিখে নে কাগজে।

ইরাবতী জানেন না, কেন এত দুঃখের মধ্যেই কমলাকে দেখে তার ভালো লাগছিল। মানুষের জীবন তো দুঃখ আর সুখের দোলাচলে তৈরি। নিশ্চিন্তি আর বিষাদ হাত ধরাধরি করে চলে। স্বপ্ন আর ঘুমভাঙা বাস্তব নিয়ে মানুষের জীবন। নাই বা হল ইরাবতীর নিজের জমিতে নিজের একটা বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকার স্বপ্ন পূরণ— কমলার স্বপ্ন তো পূর্ণ হয়েছে। একটা মেয়ে তো তার দাঁতে দাঁত চেপে করা যুদ্ধ জিতে হারানো জমি ফেরত এনে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কমলার এই স্বপ্ন পূরণ ইরাবতীর মনে আনন্দের ছোঁয়া লাগাচ্ছিল। কমলার এই লড়াই করে জেতার আনন্দ দেখে ইরাবতীর বিশ্বাস হচ্ছিল তিনিও জিতবেন। রক্ষা করতে পারবেন তার সন্তানদের।

গল্প

শব্দ

বিশ্বজিৎ রায়

কে যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে। কান্নার দমক বেড়ে গেলে শব্দটা উঠে আসছে চারতলার জানালায়। ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার বাসী বিছানায়, ওষুধের ফয়েল আর শিশির স্তূপে অগোছালো টেবিলে, খাটের তলায় রাখা বেডপ্যানে। মেয়েলি কান্না, ঠাহর করে বুঝতে পারি। কেউ যেন কোনও অভিযোগ জানাচ্ছে। উচ্চকিত নয়। পড়শি ফ্ল্যাটের পৃথুলা মাধবীদি যেমন ওর সোনাগাছি-ফেরত স্বামীর উদ্দেশ্যে করে থাকেন। প্রেমিকের ছোঁড়া অ্যাসিডে পোড়া মুখের ঘায়ের যন্ত্রণার চিৎকারও নয় যা পাশের ব্লকের তেতলায় রমলার ঘর থেকে ভেসে আসে। একাকী কষ্টের কান্নাও নয়, পাপ্পু ঘুমিয়ে পড়ার পর মাঝরাতে পাঁচতলার কাবেরী বৌদি যেমনটা কাঁদেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এমনটা শুনতে পেলে বোঝা যেত এমআইজি-ফোরের ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্রজদুলাল বাবুর বাড়াবাড়ি চলছে। ওঁর স্ত্রী ওহায়োতে ছেলেকে ধরতে পারছেন না। অথবা ভোরে এমআইজি-ফাইভের মিনু মাসিমার টেনশন আর ভয়ের কান্না। নাইট শিফটের অতসী এখনও বাড়ি ফেরেনি।

কিন্তু এই সকালে এমন কাঁদে কে? একঘেয়ে সুরহীন গোঙানোটায় কোনও ওঠাপড়া নেই। থেমে থেমে, কিন্তু একই লয়ে দুর্বোধ্য অভিযোগের সঙ্গে শ্লেষ্মাজড়িত কান্নাটা জান্তব ধ্বনির মতো শোনাচ্ছে। যদি কিছু অর্থ নিহিত থাকেও তা সামনের রাস্তা থেকে ধেয়ে আসা বাস-মিনি-লরির মিলিত চিৎকারের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। কেটে কেটে যাচ্ছে যান্ত্রিক, ধাতব কয়েকশো পিস্টনের ওঠাপড়ার তালে তালে, বিচিত্র হর্নের তীক্ষ্ন করাতে। ফাটা সাইলেন্সার গলে বেরিয়ে-পড়া কাটা নাড়িভুঁড়ির মতো তালগোল পাকানো শব্দের থ্যাৎলানো রক্তমাংসের কাত্থে মিশে যাচ্ছে ওই গোঙানি। 'কাটা তেল' আর ভেজাল পেট্রল-ডিজেল-মবিলের মিশেলে তৈরি কালো ধোঁয়া ভলকে ভলকে উগরে দিচ্ছে নিচের জ্যামবন্দি গাড়িগুলো। না-পোড়া কার্বনের গুঁড়ো ফুসফুসে ভরে যারা ফুটপাথে হকার সাম্রাজ্যের জ্যামিতি সামলে হাঁটছে, তাদের পায়ে পায়ে পিষে যাচ্ছে বেওয়ারিশ কান্নার শব্দ।

কাজের লোকের কলিং বেল টেপার ব্যস্ত ধরনটা মা বোঝে। খুঁড়োতে খুঁড়োতে ভারী শরীরটা টানতে টানতে দরজাটা খোলে। চশমাটা বাগিয়ে ছুঁচলো চোখে বারোয়ারি ফ্ল্যাটবাড়ির প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির দিকে প্রশ্ন ছোঁড়ে— কে, শান্তি এলি?

জবাব শুনতে পাই, হ্যাঁ গো মাসিমা, রোজ একই প্রশ্ন কর কেন? এই সক্কালে তোমার বাড়ি কোন রাজকন্যে আসে তোমার রাজপুত্তুরের জন্যে? শান্তির ঝঙ্কারে কান না দিয়ে মায়ের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা— হ্যাঁ রে, নিচতলায় কে অমন কাঁদছে? কার ফ্ল্যাটে কী হলো?

—সরো তো মাসিমা। আমার এখনো চারবাড়ি কাজ বাকি আছে। কে কোথায় কাঁদছে, দেখার সময় নেই কো। যত্ত ঝামেলি!

—আঃ শান্তি! পরশুই তো তোদের কার্তিকের মা উথালি-পাথালি কাঁদছিল। মনে নেই? পাঁচতলার অরুণের বৌ তো বলল, কার্তিক নাকি মিছিলে গিয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামায় গুলি খেয়েচে। বাঁচার আশা নেই। আজ নাকি তোদের ওদিকে বন্‌ধ ডেকেছে?

—ছাঁড়ো তো, পলিটিক্সের গল্পে আমার পেট ভরবে? ছেলেপুলেদের বললেও শুনবে না। এত কষ্ট করে পড়ালো মা। মাধ্যমিকটা দিলে না! এখন সারাদিন ঝান্ডা-ডান্ডা নিয়ে ছুটছে। মারামারির জন্য মুখিয়ে থাকে। নেতাদের ছেলেপিলেরা তো আর মরছে না। পুলিশ তো তাদের দু'তরফকেই স্যালুট মারছে। গুলি খাচ্ছে বোকা-হাবার দল। বদমাইশি দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেলে। এর নাম রাজনীতি!

শান্তির রাজনীতি নিয়ে রানিং কমেন্ট্রির ফাঁকেই শুনতে পাই— হ্যাঁ গো মাসিমা, আজ আবার এতগুলো কাপড় ভিজিয়েছো? রোজ রোজ তোমার ওই নুলো ছেলের নোংরা কাপড় ধোব? তোমাদের কি মায়া-দয়া নেই? বাইরের বদলে ঘরে অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে মায়ের জবাবে— তোকে কি মাগনায় কাজ করাই? মাসে অতগুলো টাকা হাত পেতে নিতে লজ্জা করে না তোর? পটের বিবি সাজতে চাস তো লাইনে নেমে যা।

—মুখ সামলে কথা বলো মাসিমা। পরের বাড়ি কাজ করে খাই বলে কি আমাদের মানসম্মান নেই! তোমার দজ্জালপনার জন্যই লোক টেঁকে না। বৌ পর্যন্ত ভেগেছে তোমার আর ওই ধেড়ে খোকার কল্যাণে।

—চোপ্। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

—তুমি চোপ্। দেব থোঁতা মুখ ভোঁতা করে!

নৈমিত্তিক এই গার্হস্থ্য কাজিয়া, যাকে রণিতা, আমার কলেজে পড়ানো প্রাক্তন স্ত্রী বলত, 'ডোমেস্টিক ক্লাস স্ট্রাগল'— তা ছাপিয়ে ভেসে আসছে ইষ্টিকুটুমের বাহামণির নাগরিক সাঁওতালি ডায়লগ। মানে, এপিসোডটা আগের রাতে মিস্ করেছেন উল্টোদিকের মিসেস সেন। সন্ধ্যা থেকে বাড়িতে গানের ক্লাস করান। ওনার পোষা পিকিনিজ কালু গত সপ্তাহে মারা যাওয়ায় কদিন গান, সিরিয়ালের আওয়াজ শুনতে পাইনি। ভালো লাগল। যাক্, উনি ছন্দে ফিরেছেন। রণিতাও সুজনের সঙ্গে ছন্দে ফিরেছে। আমাদের সম্পর্কের তাল কেটে যাবার পর আশেপাশের মানুষজন ছন্দে ফিরলে ভালো লাগে। মনে হয়, বেঁচে থাকাটা নেহাৎ খারাপ নয়।

জানালা দিয়ে সামনে তাকাই। বড় কষ্টের ধন এই ফ্ল্যাটটা। বেলেঘাটা থেকে বালিগঞ্জ, বেহালা থেকে বরানগর কোথাও যখন তিলমাত্র ঠাঁই নেই, রাজারহাট থেকে সোনারপুর যখন স্কোয়ার ফুটের হিসেব করতে চোখে সর্ষে ফুল, তখন আলাদিনের প্রদীপ হাতে তপনের আবির্ভাব। কলেজ জীবনের বন্ধুটি ছাত্র হিসেবে ব্যাক-বেঞ্চার ছিল। এখন বড় প্রোমোটার। ওর বদান্যতায় পূর্ব কলকাতার এই উর্ধ্বগামী এলাকায় আটশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট পেয়ে বর্তে গেছি। বাজার দরের থেকে বেশ কিছুটা ছাড় দিয়েছে বন্ধুকৃত্য হিসেবে। বিনিময়ে সামান্য কিছু কাজ— তপনের ইনকাম ট্যাক্সের একনম্বর, দুনম্বর খাতাপত্র দেখে দিতে হয়। অবশ্য তপন হারামে কাজ করায় না। অ্যাক্সিডেন্টের পর একটা মিউজিক সিস্টেম উপহার দিয়েছে। মাঝেমধ্যে দু-একটা দামী হুইস্কির বোতলও দেয়। ও জানে, আমার এখন ওসব কিনে খাবার ক্ষমতা নেই।

মিউজিক সিস্টেমে আমি রোজ রাতে গজল থেকে রবীন্দ্রসংগীত সবই শুনি। মেহেদি হাসান, জগজিৎ সিংহ থেকে আবিদা পারভিন, পঙ্কজ মল্লিক থেকে শ্রাবণী সেন, ভীমসেন যোশী থেকে রাশিদ খান, রবিশংকর থেকে শাহিদ পারভেজ আমার চারপাশে ঘনিয়ে আসেন। নানা প্রজন্মের সুরের জাদু আর নেশার যুগলবন্দিতে আমার চারতলার চিলতে ফ্ল্যাটটা অমরাবতীর চূড়া হয়ে ওঠে। আমিও হেঁড়ে বেসুরো গলায় গেয়ে উঠি। ঘুমের চটকা ভেঙ্গে মা খেয়ে উদ্ধার করার জন্য ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে। কিন্তু তা ছাপিয়ে সুরের ঝংকার আমাকে জন্মান্তরের পথে পৌঁছে দেয়। দুধসাদা ছায়াপথ নেমে আসে আমার জানালায়। গালিব থেকে রবীন্দ্রনাথ, কবীর থেকে মনসুর হাল্লাজ— সবাই আমাকে ডাকতে থাকে নিশির ডাকের মতো আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে। সেইসব অচিন আকাশের আলো নিচের উত্থিত শিশ্নপ্রতিম হ্যালোজেন গাছের জঙ্গলে ধাক্কা খেয়ে আরও নিচের ত্রিফলা বাতিস্তম্ভের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন হওয়ার আগে ঢুকে পড়ে আমার করোটির অন্ধকারে। ঘুম-অঘুমের মধ্যে সেই স্পন্দমান আলোক-রশ্মি দুর্বোধ্য সংকেত পাঠাতে থাকে যতক্ষণ না আমি নিজেকেই ভয় পেয়ে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরি।

এসময় কখনও কখনও অন্ধকারে ঢাকা বিলের গভীরে জলজ শেকড়ের মতো দুলে ওঠে কাবেরী বৌদির কান্না। সারাটা দুপুর পাপ্পুর জান্তব চিৎকার শুনি। পঁচিশ বছরের দুর্দান্ত যুবক শরীরে ছ'বছরের শিশুর মস্তিষ্ক নিয়ে ফ্ল্যাট দাপিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে ছেলে ঘুমোলে গুমরে ওঠে ওর প্রায়ান্ধ মা। ছোটবেলায় পাপ্পুর সঙ্গে খেলতে আসত ফ্ল্যাটবাড়ির সমবয়সিরা। টুম্পাকে দেখতাম ভাইয়ের হাত ধরে পাশের পার্কে বেড়াতে। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে হুটোপাটি না করলেও পাপ্পুর চোখের ভাষা বলত, ও মজা পাচ্ছে। ওর মতো অনেক বাচ্চাকে দেখেছি বাসে-ট্রামে বাবা-মায়ের সঙ্গে। কেউ কেউ অনেকটা স্বাভাবিক। চারপাশের জীবনের সঙ্গে ওদের যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা অনেকটা সফল। পাপ্পুর ক্ষেত্রেও তাই হতে পারত।

যদি না অমলদা দুম করে মরে যেতেন। বাবার মৃত্যুর পর ছোট্ট টুম্পা, যাকে কিনা দেখেছি ফ্ল্যাটবাড়ির চাতালে এক্কা-দোক্কা খেলতে, সে হঠাৎ বড় হয়ে গেল। মা-ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি টিউশানি, পত্রপত্রিকায় ফ্রি-ল্যান্স লেখালেখি করে দৈনিক কাগজে সাব-এডিটারের চাকরি পেলে কাবেরী বৌদির অন্ধকার মুখে আলো জ্বলেছিল। বিয়ে না করার গোঁ ধরে থাকতে থাকতে সম্প্রতি দেখলাম টুম্পার সিঁথি রঙিন। চোখে উজ্জ্বলতা। বেহালায় শ্বশুরবাড়ি থেকে রোজ যাওয়া-আসা করতে পারে না। পাপ্পু বোধহয় মানতে পারে নি। রোজ দিদির জামাকাপড়, বইখাতা, সাজগোজের সরঞ্জাম জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ইদানিং ওর দাপাদাপি বেড়ে গেছে। জিনিসপত্র তছনছ। পায়খানা-পেচ্ছাবে মাখামাখি হয়ে ফ্ল্যাটময় তাণ্ডব। কাবেরী বৌদির আর্তনাদ, অভিশাপ, দোষারোপ— অমলদা এবং নিজের ভাগ্যকে। তারপর কান্না। এসময় অন্ধকারে ভারী হয়ে থাকে পাপ্পুর মায়ামাখা ডাক— 'পিচি, পিচি আমি বাড়ি যাব।' কে এই পিচি বা পিসি, ওর মা বা দিদিও বুঝতে পারে না। সম্ভবত ছোটবেলায় জড়বুদ্ধি শিশুদের কোনও ক্রেশ বা স্কুলের কোনও আয়া, যার প্রতি এই দুর্দান্ত শিশু-যুবকের মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের গভীরে কোনো নির্ভরতা জন্মেছিল।

কিন্তু পাপ্পুর সে ডাক বা ওর মায়ের কান্না তো রাতের ব্যাপার। দিনের বেলায় এই রহস্য তো বোঝা যাচ্ছে না। তবে কি ব্রজবাবু চলে গেলেন? গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত আমেরিকা প্রবাসী ছেলে আর দুবাইয়ে থিতু মেয়ের উজ্জ্বল কেরিয়ারের গল্প বলে বেড়াতেন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। কদিন পর পরই স্কাইপে কথা হত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওয়েব ক্যামেরার কল্যাণে তাদের ঘরকন্না, নাতিপুতিদের কলকাকলি দেখতে-শুনতে পেতেন। গর্বে, সুখে উদ্ভাসিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখ দেখতে বড় ভাল লাগত।

—বুঝলে অমিত, টেকনোলজির এমন মাহাত্ম্য আগে বুঝিনি। মনে হচ্ছে, পাশের ঘরেই আছে। টিপুর ছোট মেয়েটা তো এমন ন্যাওটা হয়েছে, স্ক্রিনে আমাকে দেখলেই খিলখিলিয়ে হাসে। ঝিমলি একটি অডি কিনেছে। ক্যামেরায় ছবি দেখাল। ওর বরকে তো শেখেরা ছাড়তেই চায় না। ভাই-বোন দুজনেই বলছে— তোমরা আমাদের কাছে চলে এসো। তোমার মাসিমাই যেতে চাইছে না।

আমার অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে দেখতে এসেছিলেন ব্রজবাবু সস্ত্রীক। মাসিমা আহ্লাদী গলায় মাকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন— না বাপু! এ বয়সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে মন টিকবে না। ছেলেমেয়েদের দেখতে পাচ্ছি, দুদিন অন্তর কথা বলছি, এটাই যথেষ্ট। ওরা সুখে-শান্তিতে আছে, এটা দেখেই আমাদের

শান্তি। তাই কিনা বলুন দিদি! মা শুকনো গলায় সায় দিলেও চোখ ছলছল্। সেটা যে আমার জন্যই, তা টের পেয়ে মাসিমা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন— ভাববেন না দিদি, আমরা সবাই তো আছি। খোকা বলল, আজকাল পক্ষাঘাত সেরে যায় ঠিকমতো চিকিৎসা হলে। তবে সবই টাকার ব্যাপার!

পরিস্থিতিটা বদলে গেল ব্রজবাবুর ক্যান্সার ধরা পড়ার পর। ডাক্তার-নার্সিংহোম-প্যাথ-ল্যাব ছুটোছুটির লোক নেই। ফ্ল্যাটবাড়ির পড়শীরা কেউ কেউ কিছুদিন মাসিমার ডাকে সাড়া দিয়েছেনে। এখন উনি একা।

গোঙানিটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। শান্তিদিকে ডেকে বললাম— জানালাটা বন্ধ করে দাও। কিন্তু তাতে রেহাই মিলছে কই। শব্দটা ক্রমশ হিলহিলে সাপের মতো গ্রিল গলে খড়খড়ি তুলে নেমে আসছে আমার বিছানায়। ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে সেই সরীসৃপ পেঁচিয়ে ধরছে আমার শরীর। ঘষটে ঘষটে জানালা থেকে দূরে বিছানার অপর প্রান্তে দেওয়ালের দিকে সরে গেলেও গোঙানিটা পিছু নিচ্ছে। অগত্যা ফাটা হেলমেটটা মাথায় নিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করি। ঘর মুছতে এসে শান্তিদির চিৎকার— ও মাসিমা দেখবে এসো, তোমার ধেড়ে খোকার কীর্তি। বৌ পালিয়ে পেগলে গেছে গো। নইলে এই গরমে কেউ মাথায় টুপি পরে বসে থাকে! মা ছুটে এসে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর শান্তিদিকে ধমক লাগায়।

—আঃ শান্তি! কিসের মধ্যে কী, পান্তা ভাতে ঘি। দেখছিস না বিছানায় পড়ে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকায়।

—কতদিন না বলেছি রাতে ওসব ছাইপাঁশ গিলবি না। বায়ু চড়ে গেছে। পেট গরম হলে মাথা গরম হয়। শুনবি না কিছুতেই। বৌ গিয়ে তো নিজের হাড় জুড়িয়েছে। আমার হয়েছে জ্বালা।

দুচ্ছাই বলে বেরিয়ে পড়ার বাসনায় বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করি। কিন্তু ফের টের পাই, পা দুটো আমার কথা শোনে না। অগত্য বিছানায় মুখ গুঁজে থাকি। অথচ সকালটা অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল। রাস্তার ধারের ফ্ল্যাটপাড়া হলেও আমার ফ্ল্যাটটা পিছনদিকে। সেখানে এখনও কিছুটা গাছগাছালি ভরা জমি আছে। এককালে গোটা তল্লাটটাতে অগভীর ঝিল-বিল ছিল। সেসব বুজিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির সারি। তপন আর ওর গ্রুপের সঙ্গে জমির শেষ টুকরোর মালিকদের দর কষাকষি চলছে। বিএলআরও অফিসে পুরনো রেকর্ড হাপিস করে জলা জমিকে বাস্তু জমিতে বদলের ছক্কা-পাঞ্জার খেলায় ওরা সিদ্ধহস্ত। জমানা বদল হওয়ায় প্রথমদিকে হাওয়া বুঝতে একটু সময় নিচ্ছিল ওরা। সেদিন বলে গেল, সব ম্যানেজ করে ফেলেছে। আসলে আগে লাল পার্টির সঙ্গে ওর দহরম মহরম ছিল। এখন সবুজ শিবিরে আদি আর নবদের ক্যাঁচাল তুঙ্গে। তাই একটু ধীরে এগোচ্ছিল। কদিন আগে তো নিচে ব্যাপক চেঁচামেচি, গালিগালাজ শুনতে পেলাম। কেয়ারটেকার মন্টু পরে এসে জানালো, তপনদের প্রতিপক্ষ প্রোমোটাররা জমিটা দখল করে ওদের সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে মারামারি, থানা-পুলিশ। শেষ পর্যন্ত নয়া শাসক দলের দুই কেষ্টবিষ্টুর উপস্থিতিতে রফা হয়েছে। প্রোজেক্টের কাজ আধাআধি বখরা হবে। ইট-বালি-সিমেন্টও সাপ্লাই করবে নতুন আর পুরনো সিন্ডিকেট মিলে। মোদ্দা কথা, আপাতত শান্তিকল্যাণ।

তার মানে আর কিছুদিনের মধ্যে পেছনের জমিটায় বাড়ি উঠবে। আমি আর জানালা পেরিয়ে দিগন্তে চোখ মেলতে পারব না। মনটা ভারি খারাপ লাগে। এই মে মাসের গরমেও ভোরের দিকে পাখা বন্ধ করে দিলে ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। ভোরের হাওয়া যে মায়ের হাতের ছোঁয়া বয়ে আনে, স্মৃতির দরজা খুলে দেয়, নতুন করে বাঁচার কথা বলে— তা এই জানালায় না বসলে আমি টের পেতাম না। তার সঙ্গে উপরি পাওনা অবশিষ্ট গাছগাছালির ছায়া-মাখানো মায়া আর উদ্বাস্তু পাখপাখালির বিচিত্র কিচির-মিচির। বট-অশ্বত্থ-বেল-নিম, আম-জাম-জারুল-কদম গাছ ছোটবেলার পাড়ায় দেখেছি। আর কোনো গাছ তেমন চিনি না। রারীন্দ্রিক অমলতাস, ছাতিম, মাধবীলতা কিংবা হিজল, ভাঁটফুল— এসব জীবনানন্দীয় গাছ-ফুল দেখিনি। পাখিদের বেলাতেও তাই। কাক-পায়রা এখনও দেখতে পাই। কিন্তু চড়াই-শালিখ কমে গেছে। ঘুঘু দেখিনি বহুকাল। বুলবুলি-দোয়েল-ফিঙ্গে-মৌটুসি-বসন্তবৌরি বইয়ের পাতায় দেখেছি মাত্র। চিনি না। তবু ভোর থেকে পাখিদের শিস শুনতে কান পেতে থাকি। টু-ই-টু-ই, টু-ই-টু-ই, ক্লু-ক্লু-ক্লু, পিক পিক...।

তবে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছে এক কোকিল। না কোকিলা? কে জানে? শীত-বসন্ত পেরিয়ে এই তীব্র গরমেও সে ডেকে চলেছে। রাত-বিরেতে বা ভোরে তো বটেই, চাঁদিফাটা দুপুরেও বিরাম নেই। কুউ-কুউ-কুউউউ-কুউউউ.... ক্রমশ দীর্ঘায়িত এবং উচ্চকিত সেই ডাক কখনও কখনও আর্তনাদের মতো শোনায়। এখন তো ওকে প্রায়ই পাতাঝোপ, ডালপালার আড়ালে দেখতে পাই। কোথায় ওর বাসা ছিল কে জানে! তাড়া খেয়ে ইদানিং এ পাড়ায় উঠে এসেছে। সম্ভবত লেকের ধারে কোথাও ওর বাসা ছিল। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলের সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আসা লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি আর গাড়িঘোড়ার ঠাঁই জোগাতে সুভাষ সবোবরের অসংখ্য গাছপালা হয় উপড়ে ফেলা হয়েছে নয় নির্মমভাবে ছাঁটা হয়েছে। ফলে অসংখ্য পাখি এখন ঘরছাড়া, বাস্তুহারা। মাছখেকো বকেরা এখন এ পাড়ার পুরনো শিমূল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ায় ঠাঁই খুঁজছে। সন্ধ্যেবেলায় জায়গা দখল নিয়ে তাদের কর্কশ কাজিয়ায় কানাপাতা দায়। ভোরের দিকে দেখা যায়, ঝগড়ার ফাঁকে ঝরে-পড়া আধখাওয়া মাছ, গেঁড়িগুগলি গাছতলায় পড়ে। আশেপাশের বস্তির ছেলেপুলেরা সে মাছ তুলে নিয়ে যায়। তবে ফ্ল্যাটবাড়ি হাঁকাতে হোক বা রাস্তা

চওড়া করার প্রয়োজনে বুলেভার্ড রোড-ডিভাইডার সৌন্দর্যায়নের নামে যেভাবে গাছ কাটা-ছাঁটা চলছে তাতে এ পাড়া ছেড়েও পাখিদের পালাতে হবে অচিরেই। কোকিলটার ডাক তাই কখনও তীক্ষ্ণ অভিযোগ কখনও তীব্র আর্তির মতো শোনায়।

অনেকটা রেবা মাসির মতো। মায়ের মর্নিং ওয়াকের বন্ধু। সেদিন এসে বলে গেল, ওদের পুরনো শরিকি দোতলা বাড়িটা ভেঙ্গে মাল্টি-স্টোরিড উঠবে। বাড়িটার একতলাটা ভাড়াটেদের দখলে। তারা অন্যত্র বড় ফ্ল্যাট কিনে চলে গেলেও এবাড়ির ফ্ল্যাট ছাড়েনি। ফলে ভাড়াটেসহ বাড়ি কিনে শরিকদের দিয়ে-থুয়ে প্রোমোটার আর ওদের এখানে ফ্ল্যাট দেবে না। বিধবা রেবা কাকিমা আর মান্তুদিকে হয় নগদ ধরিয়ে দেবে নয় শ্যামনগরে এই প্রোমোটার কোম্পানিরই নির্মীয়মান ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হবে। নগদ যা ধরাচ্ছে তাতে কলকাতায় চিলেকোঠাও মিলবে না। কিন্তু বাকি শরিকরা চাপ দিচ্ছে। মৃগীরুগী বলে মান্তুদিকে স্বামী নেয় না। রেবা মাসি কাঁদছিল। স্বামীর ভিটের জন্য। ভিটেছাড়া সংসারের জন্য। পরিত্যক্তা মেয়ের জন্য।

বেলা বাড়লে পাখিদের ডাক ছাপিয়ে বাস-লরির আওয়াজ বাড়ে। একই সঙ্গে বাড়ে নানারকম ফেরিওয়ালার ডাক। রদ্দিকাগজ-বোতলের কারবারি লোকটার সুরেলা গলা ভেসে আসে— 'কাগজ, পুরনো কাগজ বিক্রি করবেন'। ওর উচ্চারণের ঢঙে কথাটা 'হাগজ' শোনায়। বাতিল লোহালক্কড়ের কারবারি এখন ডাকে— 'পুরোন কম্পিউটার, টিভি, স্টেবিলাইজার বিক্কিরি করবেন'। অনেক আগে 'শিল কাটাও' বলে ডাকত একটা লোক। রান্নাঘরের মশলা-পেশাইয়ের শিলনোড়া ছেনি দিয়ে কুটে দিত। এখন মিক্সি-গ্রাইন্ডার চালু হওয়ায় সেই ডাক উধাও। তাছাড়া গুঁড়ো মশলার রমরমা ঘরে ঘরে। মুটের মাথায় পেতলের বাসনকোসন, পরে হিন্ডলিয়াম, স্টিলের থালাবাটি এসব চাপিয়ে ছোট কাঁসর বাজিয়ে ছুটত ঢ্যাঙ্গা মতো এক বাসন বিক্রেতা। তার জায়গা নিয়েছিল হিন্দিভাষী বাসনওয়ালি। পুরনো কাপড়জামার বদলে বাসন কিনত মা-মাসিরা। তারা এখন কোথায়? বদলে আসে প্লাস্টিকের পসরা সাজিয়ে একজন।

আসে মাছ ও সবজিওয়ালা। মাছের হাঁড়ি মাথায় লোকটার ডাক দূর থেকেই শোনা যায়— 'মাআছ, মাছ নেবে, মাআছ'। যেদিন কই, পাবদা, পারশে, বা গলদা চিংড়ি থাকে সেদিন ওর গলার আওয়াজ বদলে যায়। কেননা ও জানে এমন দুর্লভ ও মহার্ঘ মাছের রসিক ফ্ল্যাটবাড়ি পাড়ার সবাই নয়। সবার রেস্ত সমান নয়। সম্ভাব্য খদ্দেরদের ও জানে। সেই মোতাবেক, তাদের ফ্ল্যাটের তলায় বা সিঁড়ির মুখে ওর হাঁকটা জোরদার হয়। এর মধ্যে জি-ফাইভের একতলায় সোনার মায়ের সঙ্গে ওর ভাব বেশি। 'বৌদি, আজ তোমার জন্য ডিমভরা ট্যাংরা এনেছি।' ইদানিং সোনার মা টানাটানির কথা বলে এড়াতে চায়।

—তোমার দাদা একটু সমস্যায় আছে। কাজকর্মে ভাটা চলছে। কথাটা হয়ত ঠিকই। আগের মতো রাতে অর্ধ্যদা, মানে সোনার বাবার উচ্চগ্রামের মার্কিন ইংরেজি শুনতে পাই না। দুজন কলেজ-ফেরতা ছেলে নিয়ে ফ্ল্যাটের একটা ঘরে ওদের কল সেন্টার। আমেরিকায় চিকিৎসা-পরিষেবা কোম্পানিগুলির হয়ে ওদের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশনের কাজকর্ম চালায়। ইদানিং আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা চলছে। তাই সোনার মা মহার্ঘ মাছ কিনতে পারছে না। কিন্তু মাছওয়ালা বাঁধা খদ্দের হারাতে চায় না।

—সে তুমি পরে দিও। পয়সা তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

সোনার মার মুখে হাসি ফোটে। এরপরই সোনার খোঁজ করে মাছওয়ালা। জানালা দিয়ে দেখতে পাই সোনার জন্য প্রায়ই পেয়ারা, জামরুল কি সিজনের লিচু নিয়ে আসে দোখনো লোকটি। সোনার বাবা-মা বারণ করলেও শোনে না। একদিন সম্ভবত ওর মায়ের কথাতেই সোনা সস্তার চকলেট নেয়নি। হোঁদল কুঁতকুঁতে চেহারার লোকটা দেখলাম কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল। তারপর বেশ কিছুদিন ওকে এপাড়ায় দেখিনি। লক্ষ্য করতাম, মাছওয়ালা আসার সময়টায় সোনা ওদের জানালায় এসে দাঁড়াত। মেয়ের মন বুঝে সোনার মা শেষপর্যন্ত মাছওয়ালার খোঁজ করে পাশের পাড়ায়। ক'দিন পরে সে আবার আসে। তার ডাক শুনলে সোনার গলা পাই।

—'মাছকাকু, আমি আসছি।'

বুঝতে পারি সোনার মুখ ঝলমল করছে।

কিন্তু মন ভালো করা শব্দ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে পাখিদের মতো, গাছেদের মতো, নদীদের মতো। বেড়ে যাচ্ছে কুৎসিত চিৎকার, শাসানি-ধমকানি, চোখরাঙানি। বুলডোজারের মতো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আমার স্নায়ুর শৃঙ্খলা।

এই তো কদিন আগে শুনতে পেলাম পাশের ফ্ল্যাটের বিমলদাকে চমকে দিয়ে গেল পাড়ার কয়েকটা ছেলে। ওর মা-মরা মেয়ে শামলি— ভালো নাম শ্যামলী— এলাকারই একটি কলেজে পড়ে। ওদের রাগ শামলির বিরুদ্ধে। মেয়েটার বুদ্ধি আর সাহস দুই-ই আছে। পড়াশোনায় ভাল। ওর পিছনে কেউ লাগলে উৎপটাং কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। ওই পাড়ার এক রোমিও নাকি ওকে মোটরবাইকের পিছনে তুলবে বলে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছিল। কিন্তু কলেজ-ফেরত শামলির সঙ্গে হিরোগিরি করতে গিয়ে পাল্টা থাপ্পড় খেয়েছে। সেদিন শামলি বাড়ি নেই। তাই দল বেঁধে শাসাতে এসেছিল ছেলেগুলো।

—কাকা, পাড়ায় থাকতে গেলে মেয়েকে সভ্য-ভদ্র হয়ে থাকতে বলুন। নইলে কামদুনি হয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকব না। তখন কপাল চাপড়াতে হবে।

বিমলদা মাঝারি দরের বামপন্থী কবি। কলেজে পড়ায়। সুশীল সমাজের মিছিলে যায়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় প্রতিবাদী মিছিলে হাঁটেনি বলে এখন মরমে মরে আছে। তবে ভিড়ের প্রতিবাদে থাকা আর একা মাস্তানদের মোকাবিলা করা

এক ব্যাপার নয়। তবু মেয়ের মর্যাদা, নিজের সম্মান বাঁচাতে ফোঁস করে উঠেছিল।

—দ্যাখো! এসব বললে আমি পুলিশে যাব। দরকারে মিডিয়াকে জানাব।

জবাবে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়েছিল চ্যাংড়াদের পান্ডা ওরফে শামলির প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক।

—যান, যান। ওসব থানা-ফানার ভয় দেখাবেন না। আপনাদের জমানায় কী হতো মনে নেই? থানাকে তো সাক্ষী গোপালের মন্দির বানিয়ে রেখেছিলেন। মিডিয়াকে ডাকবেন? এখন আমাদের হাতেও অনেক চ্যানেল, কাগজ জানেন তো? বাকি যে ক'টা আসবে আগুনে জ্বালিয়ে জিন্দা লাশ করে দেব। আপনার মেয়ে রেপ হয়ে গেলে হয় মুখ লুকোবে নয় হাসপাতালে খাবি খাবে। বুদ্ধিজীবীরা এসে আপনাকে চুকচুকানি শোনাবে। আর আপনি বেহালা বাজিয়ে বাইট দেবেন।

ওরা চলে যাওয়ার পর রাগে, আতঙ্কে রুদ্ধবাক্ বিমলদা আমার কাছে সিগারেট ধার করতে আসে। থানায় ঘণ্টা দুয়েক বসিয়ে রাখার পর তরুণ বড়বাবু আশ্বাস দেন তিনি ব্যাপারটা দেখবেন। রংবাজ ছেলেটির বাবা নতুন শাসকদলের এক গোষ্ঠীর স্থানীয় নেতা। এমএলএ-র ঘনিষ্ঠ। ব্যাপারটা তার কানে তুলবেন। পাশাপাশি বিমলদাকে পরামর্শ দেন শামলিকে সামলাতে।

—এখনই এফআইআর করতে যাবেন না। উল্টো ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন। আপনার মেয়ে কলেজে মাওবাদী ছেলেপিলেদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করছে বলে খবর আছে। এর মধ্যে নাকি একবার বেলপাহাড়ি ঘুরে এসেছে। কী দরকার এসব ঝুটঝামেলায় জড়ানোর। জানেন তো, মাওবাদী কেসে ঢুকিয়ে দিলে জিনা হারাম হয়ে যাবে। মেয়ের তো বটেই, আপনারও। তখন আপনার পুরনো পার্টি কানেকশান কাজে লাগবে না।

থমথমে মুখে থানা থেকে ফিরে এসে জানিয়ে ছিলেন বিমলদা। অনেক রাতে বাপ-মেয়ের বাদানুবাদের শব্দ পেয়েছিলাম।

—তাপসী মালিক যখন রেপ-মার্ডার হল, সেদিন তুমি চুপ ছিলে বাবা। তোমার পার্টির কথায় বিশ্বাস করেছিলে, না সত্যিটা বলতে ভয় পেয়েছিলে? এখন আমি রেপ হব বলে ভয় পাচ্ছ আর আমাকে ওদের শাসানির কথা বলে চেপে যেতে বলছ। কেন বাবা? চেপে গেলে, ভয় পেলে আমি বাঁচব বাবা? তুমি বাঁচবে?

দেওয়ালের ওপারের জানালায় মেয়ের ধাঁতানি খেয়ে বিমলদার ফোঁপানির শব্দ পেয়েছিলাম। পুরুষমানুষ কাঁদলে কেমন লাগে না? হোক না তা অপরাধবোধ আর ভয়ের তাড়নাজাত।

কোনও কোনও কান্না আবার প্রতিবাদের শুরু।

কয়েক মাস আগেও রাতের দিকে আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর বাবা-মায়ের ঝগড়ার আওয়াজ পেতাম। কখনও কখনও বাবা মারধোর করলে ওর কান্নার শব্দও। এখন আর পাই না। বদলে ওদের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসে স্টিরিওতে বেজে চলা হিন্দি ছবির চটুল গান। আত্রেয়ী হোটেল-বারে গান গায়। ওর বাবার ঘোর অপছন্দ ছিল। কাজ করতেন একটা আধা সরকারি কোম্পানির সেলসে। লোকসানের জেরে গণেশ উল্টোনোয় ভিআরএস ধরিয়ে দিয়েছে। সে টাকা ফুরোনোয় সংসার চলে না। ভাইটা বাউণ্ডুলে। পাড়ার একটা পিসিও-তে কাজ করত। দোকান ছেড়ে কাপ্তানিতে বেশি মন দেওয়ায় সে কাজটাও গেছে। আত্রেয়ী তাই গানের টিউশানি ছেড়ে হোটেলে-বারে গাইছে। রোজগার বেশি, ঝুঁকিও। কাজটা ওর পছন্দের, আনন্দেরও। কিন্তু ওর বাবা-মার কাছে ঘোর অসম্মানের।

ফ্ল্যাটপাড়ার ছেলেবুড়ো অনেকেই ধর্মতলার বারগুলোয় যায়। পাড়ায় নিপাট ভালোমানুষ সেজে থাকলেও বারের রঙিন আলোছায়ায় 'ক্রুনার'-এর গান, ড্রামের উদ্দাম তাল আর গিটারের টংকার তাদের রক্তে নেশার দুলুনি বাড়িয়ে দেয়। পাড়ার খেঁদি-পেঁচিকেও কারিনা-দীপিকা বলে মনে হয়। সেরকমই এক বিভ্রমের মৌতাতে এক রসিক সমঝদার কাকা বখশিসের পাত্তি বাড়িয়ে গায়িকার হাত ধরতে গিয়ে আবিষ্কার করে মিস জোজো আসলে জি-থ্রির শান্টুবাবুর মেয়ে। চড়া মেকআপ, ঝলমলে শাড়ি আর হাইহিল জুতোতে আত্রেয়ীর রূপ আরও খুলে যায় বারের আলোর জাদুতে। বিপুল কাকা আর আত্রেয়ী দুজনেই অস্বস্তিতে পড়েছিল। 'তুমি খুব ভালো গাও মা'— বলে কেটে পড়েছিলেন কাকা। কিন্তু পরদিন ওর বাবাকে বাজারের পথে পেয়ে অন্য মূর্তি।

—এসব কী হচ্ছে শান্টুবাবু? আপনার মেয়ে শুনলাম ধর্মতলার বারে গান গাইছে? আমাকে ছেলেছোকরারা বলল। মেয়েকে পথে ফেরান। আফটার অল সোসাইটিতে আমাদের একটা স্ট্যাটাস আছে! সংসারে অনটন আছে বলে বাড়ির মেয়েদের তো লাইনে ঠেলে দিতে পারি না। ওসব কুলি-মজুরদের ঘরে চলতে পারে। আমাদের ঘরেও তো মেয়ে আছে মশাই। বেগড়বাই করে দেখুক তো। শেকলে বেঁধে ঘরে ফেলে রেখে দেব। দুদিনেই সিধে হয়ে যাবে।

বাড়ি ফিলে আত্রেয়ীকে বেধড়ক মার মেরেছিলেন ওর বাবা। বাবার হুংকার আর ওর পাল্টা চিৎকারে লোক জড়ো হয়েছিল।

—তোর ওই পাপের পয়সা আমি চাই না। এতবড় অপমানের পর তোর মুখ দেখাও পাপ। তুই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়। নইলে আমিই তোকে মেরে ফেলব।

—মেরে ফেলতে চাও তো মারো। কিন্তু আমি কোনো পাপ করিনি। গান গাই, পয়সা পাই। কিসের পাপ? যারা মাল খেয়ে মেয়ের বয়সি মেয়ের হাত ধরে টানছে, তারা সব সাধু পুরুষ? সব ব্যাটার মুখোশ খুলে দেব।

—মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব। অন্য লোকে কী করছে তা আমার দেখার দরকার নেই। আমার নিজের ঘর আমি সামলাব।

গল্প

এফ ডি আই

মিঠু মাইতি

সারা দেশ জুড়ে টান টান উত্তেজনা।

আর কিছুক্ষণ পরেই জেড রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রোশন দেশাই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করবেন।

দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা হাজির।

এই সাংবাদিক সম্মেলন টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

জেড একটি অফুরান প্রাকৃতিক ও অগুনতি মানব সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। একশো কোটি মানুষের এই দেশটা এখন সংবাদ শিরোনামে। এ দেশের অর্থনীতি বিশ্বের কাছে হাট করে খুলে দেওয়া হবে কি না তা জানার জন্য সারা বিশ্বের চোখ এখন ঐ রাষ্ট্রের দিকে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী রোশন দেশাই আজ তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কৌতূহল নিরসন করবেন। তিনি জানাবেন, কোন্ প্রেক্ষিতে তাঁকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনেয়োগ বা এফডিআই (Foreign Direct Investment)-এর মতো আপাত-কঠিন নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

জেড রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বয়স ৫০ বছর। একশো বছর তারা ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল। ইংরেজরা আসার আগে তারা মধ্যযুগে পড়েছিল। ইংরেজরাই এই দেশটাকে একটা রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছে। তাদের দেওয়া শিক্ষায় শিক্ষিত দেশবাসীর একটা অংশের প্রতিরোধের মুখে পড়ে ইংরেজরা দেশ ছাড়ে। চলে যাবার আগে ইংরেজরা শুধু বলে গিয়েছিল, স্বাধীনতা চাস্? দ্যাখ, কেমন লাগে!

জেড রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সতীশ গোয়েঙ্কা পাঁজি-পুঁথি দেখে, হোম-যজ্ঞ করে শপথ নিয়েছিলেন, যাতে সামনের দিনগুলোতে কোন বাধা-বিঘ্ন না আসে। নিজের পছন্দসই লোকদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের মন জুড়ে ছিল একরাশ তাজা স্বপ্ন। জেড-কে তাঁরা পৃথিবীর এক নম্বর দেশ বানাবেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষে দেখা গেল, গোটা জেড দু'নম্বরি লোকে ভরে গিয়েছে। কী সরকারের ভিতরে, কী বাইরে! মাথা থেকে পা পর্যন্ত দু'নম্বরি লোকেদের ভিড়।

আম-আদমি ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারেন না। তাঁদের দারিদ্র্য-সীমার নীচে রাখা হয়েছে, তাঁরা বিপিএল কার্ড হোলডার। এই কার্ডের বিনিময়ে তাঁরা 'ফেয়ার প্রাইস শপ' থেকে প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় দিনিসপত্র সংগ্রহ করেন আর উপরওয়ালাকে স্মরণ করে দিন কাটান।

তাঁদের জন্য দেশের সরকার দরাজ হস্ত। দালালি-ভাতা চালু করেছে। সরকারের যাবতীয় উদ্যোগ আর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করলেই নগদ পুরস্কার। কেউ বিরোধিতার পথে যায়নি। কে চায় না খেতে পেয়ে মরতে? ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হতে?

জেড রাষ্ট্রের প্রধানত দু'টো রাজনৈতিক দল— রিপাবলিক পার্টি আর পাবলিক পার্টি। নামে এবং স্লোগানে আলাদা হলেও দু'দলেরই লক্ষ্য এক— দেশের সম্পদ লুঠ করা।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রোশন দেশাই রিপাবলিক পার্টির মাথা। গোটা দলটাই তাঁর হাতের মুঠোয়। কাউকে ট্যাঁ-ফোঁ করার সুযোগ দেন না। কেউ বিরোধিতা করলে বা বেচাল হলে তাকে মহাকাশের নক্ষত্রলোকে রেখে আসেন।

পাবলিক পার্টি নাম-কা-ওয়াস্তে বিরোধিতার পথে যায়। তাদের জন্য অঢেল ব্যবস্থা। তাদের সব কিছু ফ্রি। স্বভাবতই তারা সরকারকে চটাবার রাস্তায় হাঁটে না। তারা আপাদমস্তক খুশি। প্রায়শ বলে, এই বেশ আছি!

জেড রাষ্ট্রে ভোট হয়। তবে সেটা প্রহসন— এই যা! ভোট মানে নোট। নোটকে কে না ভালোবাসে?

হ্যাঁ, তবে ঐ রাষ্ট্রে একটা আস্ত সংবিধান আছে। তাতে সকলের জন্য সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারের একটা হচ্ছে— ঝাড়ো, মানে সব কিছু গুছিয়ে ঝেড়ে ফাঁক করা। যে সরকারে আছে, সে সবকিছু ঝেড়ে সাফ করে। আর যে ক্ষমতার বাইরে আছে, সে-ও ঝাড়া শুরু করে। এর ফলে জেড রাষ্ট্র গত ৫০ বছর ধরে গায়ে-গতরে বাড়ার সুযোগ পায়নি। সবাই মিলে কামড়া-কামড়ি আর খামচা-খামচি করলে দুর্বল না হয়ে পারে?

বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর নজর এই জেড রাষ্ট্রের দিকে, সেই আদ্দিকাল থেকে। তারা জানে, দেশের মানুষগুলো ঠিক মানুষ নয়। সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি আর কাটাকাটি করে। প্রয়োজনে অন্যকে টাইট দেবার জন্য অন্য শক্তির দ্বারস্থ হয়। সব মিলিয়ে অনৈক্যের ছবি, জাতি হিসাবে কখনই এক হতে পারেনি। আর একটা জাত হিসাবেও তৈরি হয়নি।

হ্যাঁ, মাঝে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ইংরেজদের অধীনে এক হতে পেরেছিল। তার মূলে অবশ্য ছিল দেশের পরাধীনতা।

এখন ইংরেজরা নেই।

এখন জেড রাষ্ট্র স্বাধীন।

এই স্বাধীন রাষ্ট্রই মহাফ্যাসাদে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী রোশন দেশাইয়ের মাথায় হাত।

বিরোধীদের গালে হাত। অসহায় জনগণ ভীরু দৃষ্টিতে সব

কিছু দেখছে। কতিপয় অর্থবান বিদেশি রাষ্ট্র বলেছে, তারা জেড রাষ্ট্রে বড়ো-সড়ো বিনিয়োগ করতে চায়। বিশেষ করে পলিটিক্যাল সেক্টর বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ শেয়ার তারা নিজেদের হাতে রাখবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের নামে তারা এদেশের রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চাইছে। তাদের এই বিনিয়োগ আসলে রাজনৈতিক বিনিয়োগ।

বেশ কয়েকমাস আগে তারা সরকারকে এই মর্মে প্রস্তাব দিয়েছে। ভাববার সময় দিয়েছে। তারা একথাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের প্রস্তাব ও নির্দেশ অমান্য করলে প্রধানমন্ত্রী রোশন দেশাইকে গদি পর্যন্ত ছাড়তে হতে পারে।

সময় যত এগিয়ে আসছে, রোশন দেশাইয়ের সরকার ততই চাপে পড়ে যাচ্ছে। এই চাপ ঘরে-বাইরে প্রবল। তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয়-ও পেয়ে বসেছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিপদ তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

বিদেশি রাষ্ট্রগুলো বলেছে, সরকার গড়ার ভার থাকবে আমাদের হাতে। সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক হবে আমাদের। বাকিটা জেড রাষ্ট্রের। আমাদের লোকেরাই ঠিক করবে দেশের যাবতীয় নীতি-কর্মসূচি-পরিকল্পনা। রূপায়ণের দায়িত্ব-ও আমাদের।

তাদের প্রস্তাব না মানলে জেড রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ শুরু করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি-ও দিয়েছে।

রিপাবলিক দল প্রমাদ গুণল।

পাবলিক দলের পা কাঁপতে লাগল।

সান্ত্বনা এই, অঢেল মাল কামাবার সুযোগ আছে!

সমর্থনের ব্যাপারে রিপাবলিক দল পাবলিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করল। আলাপ-আলোচনা চালালো। বললো, মানলে উভয়ের লাভ। না মানলে ফক্কা। শেষে অক্কা।

পাবলিক দল রাজি হল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব সমর্থন করল। রিপাবলিক দল খুশি হলো। বিনিয়োগের মাল ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে!

এর মধ্যে জনগণের কোনও ভূমিকা নেই। তারা জানে, রাষ্ট্রের চোখে তারা ভোটের একটা সংখ্যা। বিদেশি রাষ্ট্রের চোখে তারা বাজারের পণ্য। তারা পড়ে গিয়েছে ঠিক মাঝখানে। একেবারে স্যান্ডউইচ্ অবস্থা!

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটায় হাজির প্রধানমন্ত্রী রোশন দেশাই। আসার আগে গুরুদেব গঞ্জিকা বাবার পা মাথায় ঠেকিয়ে এসেছেন। গুরুদেব পঞ্জিকা দেখে ঐ সময়টায় সাংবাদিক সম্মেলন করতে বলেছেন। শুভ সময়। গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি সব অনুকূলেই থাকবে।

মিডিয়া রুমে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের ভিড়।

সমস্ত টিভি ক্যামেরা তাঁর দিকে তাক করা।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুই বশংবদ চ্যালারাম শেঠ ও প্যালারাম পাঠককে নিজের দু'পাশে বসিয়ে মুখ খুললেন।

''বন্ধুগণ, আমাদের দেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। আপনারা জানেন, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই-এর জন্য আমাদের উপর পাহাড়-প্রমাণ চাপ আসছিল। এই চাপ ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছিল। আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি, দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এফডিআই-এর জন্য ৫১ শতাংশ ছাড়পত্র দেবো। এটা আমাদের দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। বিরোধী দলও আমাদের সমর্থন করেছে। এই বিনিয়োগের ফলে দেশের ও দশের মঙ্গল হবে। দেশের জিডিপি সাবালক হবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। শিল্পে জোয়ার আসবে। মানুষ আর অনাহারে থাকবে না। সর্বোপরি, দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে। দেশ স্ব-নির্ভর হবে।''

''কিন্তু স্যার, এতে করে কি দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?'' জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন।

''না, বন্ধু, এতে বরং দেশের সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব অটুট থাকবে। ওরা সরকারে থাকবে মানে দেশের নিরাপত্তার দিকটাও ওদের হাতে থাকবে। সেখানে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার প্রশ্ন আসছে কোথায়?''

''আপনাদের তো সংবিধান সংশোধন করতে হবে?''

''হ্যাঁ, এটা আমাদের মাথায় আছে। আগামী অধিবেশনে এটা করবো। বিরোধীরা সমর্থন করবে, কথা দিয়েছে।''

''কিন্তু স্যার, আপনাদের সরকারে থাকা না থাকা তো সমান হয়ে গেল?''

''আপনি ঐভাবে ভাবছেন কেন? এখন গোটা বিশ্বে মিলিজুলি কনসেপ্ট চলছে। এটা তো সৌভ্রাত্বের নিদর্শন। যৌথ পরিবারের মতো। এর মধ্যে সমষ্টির সার্বিক কল্যাণ ভাবনা লুকিয়ে আছে।''

''এই বিনিয়োগ কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে?''

''অবশ্যই। দেশের ভালোর জন্যই আমরা ভাবনা-চিন্তা করে এগিয়েছি।''

''কিন্তু স্যার, দেশের ভালো হবে কী করে? দেশটাকে তো আপনারা অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছেন, বলা ভালো বিকিয়ে দিচ্ছেন।''

''না, বন্ধু, আপনার ভাবনা আর আশংকা অমূলক। নিজের দেশকে কি কেউ অন্যের হাতে বেচে দেয়? না, দিতে পারে? বরং এই বিনিয়োগ দেশের কৃষি-শিল্প-পরিকাঠামো উন্নত করবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবে আর...''

ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা!

একপাটি বুট উড়ে এসে লাগলো প্রধানমন্ত্রীর মুখে।

নিরাপত্তাকর্মীরা ঘিরে ধরলো এক তরুণ সাংবাদিককে। তাঁকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই তিনি ঝাঁঝালো গলায় বলে যাচ্ছেন—

''ইউ, ব্লাডি—! দেশটা যেন ওর পৈত্রিক জমিদারি! দেশকে বেচার তাল করে বড়ো বড়ো লেকচার ঝাড়ছে!''